ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীমান সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন মানসিক আরাম উপভোগের জন্য। কিন্তু এটি অনেকাংশে তত্ত্বাশ্রয়ী হওয়ার ফলে জিজ্ঞাসু পাঠকও এর থেকে আশানুরূপ তত্ত্বরস দোহন করে নিতে পারবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য নানাদিক দিয়ে বাঙালীর এক প্রকার মৌলিক ধ্যান-ধারণা বলে গৃহীত হলেও লেখক প্রাচীন বৈদিক সংহিতা থেকে শুরু করে পৌরাণিক ও উত্তর-পৌরাণিক ঐতিহ্য ও ধর্ম সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আদি রসাশ্রিত ভক্তি সাধনার উৎস ও প্রবাহের ঐতিহাসিক বিবর্তন নির্দেশ করেছেন। বৈষ্ণব ধর্মকে বাদ দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা সম্ভব নয় এবং শুধুমাত্র শিল্পরসভোগের মানদণ্ডে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য বিচার-যোগ্য নয়। এর সঙ্গে দু-তিন হাজার বছরের যে বিশেষ ধরণের জীবন-চেতনা ও পারমার্থিক রসসাধনার সংযোগ রয়েছে, লেখক সংক্ষেপে সেই ধারাবাহিকতার মৌলিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। এই অংশে ফুটনোট কণ্টকিত "দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্তের" বাহ্বাস্ফোট দেখাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু লেখক গবেষক হবার অনিবার্য প্রলোভন দমন করে সহজভাবে বৈষ্ণব দার্শনিকতা, রসতত্ত্ব ও কাব্যকথার যে নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করি এবং একদা তিনি আমার ছাত্র ছিলেন, এজন্য গৌরব বোধ করি।

লেখক গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়'। বাংলার প্রাক্‌-চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলীর কায়া ও কান্তি বিশ্লেষণ তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে তিনি যাবতীয় বৈষ্ণব রসগ্রন্থ বিশ্লেষণ করেছেন, বৃন্দাবনের চৈতন্য পরিকরদের গ্রন্থাদি তাঁকে এ বিষয়ে দীপবর্তিকার মতো সাহায্য করেছে। বৈষ্ণবপদের শুধু কাব্য-সৌন্দর্য ব্যাখ্যা নয়, তার তাত্ত্বিক দিকটিও উপেক্ষিত হয় নি। আবেগের জল মিশিয়ে ও বিস্ময়ের শর্করা সংযোগ করে তিনি বৈষ্ণব কবিতাকে নিছক রোমান্টিক ও ভূতলচারী মর্ত্যমানসিকতার গজকাঠি দিয়ে মাপতে পারতেন এবং তাতে সাধারণ পাঠক সমাজ খুশীও হত। কিন্তু আনন্দের কথা, তিনি সে সহজিয়া পথ পরিত্যাগ করে অকারণে দুরূহকে

লঘু করতে চাননি। বস্তুতঃ বৈষ্ণব কাব্যের তত্ত্ব ও কাব্য—দুটির মধ্যে সমানুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে বলে গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে স্বীকৃতি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

যাঁরা নখদর্পণে আকাশের প্রতিফলন দেখতে চান এবং বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ পেতে চান, তাঁরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একটু নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন। হয়তো ছাত্র সমাজ এর লক্ষ্য, কিংবা নয়। কিন্তু এর দ্বারা অনেক জিজ্ঞাসু অ-ছাত্র ব্যক্তিও যে উপকৃত হবেন এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। লেখকের গ্রন্থখানি রসিকজনের প্রীতি আকর্ষণ করুক এই কামনা জানাই।

ইতি—

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহ্য অতি সুপ্রাচীন। ঋগ্বেদের যুগ থেকে বিষ্ণুকে অবলম্বন করে এই ধর্মের স্রোতধারা নানা খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। ষোড়শ শতকের বাংলার প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনের সংস্পর্শে বৈষ্ণবধর্মের মরাগাঙ্গে দেখা দিল প্লাবনের উত্তাল কলরোল। তারই ফলশ্রুতিতে একদিকে বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুগণের নিরলস সাধনায় গড়ে উঠল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের সুন্দর ইমারত, অন্যদিকে অজস্র ভক্তকবি চৈতন্যদেবের দিব্য-জীবনবিভায় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের উর্বর মাটিতে সোনার ফসল ফলানোর সাধনায় ব্রতী হলেন। অলৌকিক রাধাকৃষ্ণ লীলা সৌন্দর্যকে এই সকল কবি লৌকিক ভাষায় নানাভাবে আভাসিত করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বৈষ্ণবপদের রসাস্বাদনের জন্য বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠকের সম্যক্ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বক্ষ্যমান গ্রন্থে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সার্বিক পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মূলসূত্রটি অনুধাবনের প্রয়োজনে আমি এর ইতিহাস ও দার্শনিক পটভূমিকার পরিচয় দিতেও চেষ্টা করেছি। বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন রসপর্যায়ের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য এবং সেই-সঙ্গে শ্রেষ্ঠ চারজন কবির পদ সম্পর্কে আলোচনা, সর্বোপরি পদাবলীর নানা-দিকের পরিচয়টি উপস্থাপিত করে আমি বৈষ্ণব পদাবলীর সামগ্রিক রূপটি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তবে আমার অক্ষমতা সম্পর্কেও আমি সচেতন। বৈষ্ণবরসের তত্ত্ব ও প্রকাশের বিপুল ঐশ্বর্যের যথাযোগ্য পরিচয় দানের শক্তি আমার নেই। তবু পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করতে চায়, বামনও চাঁদ ধরতে উদ্বাহু হয়—এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস নিয়ে আমি সাধারণ জিজ্ঞাসুদের কথা মনে রেখেই এ বই লিখেছি। তাদের প্রয়োজনে এটি লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন অধ্যাপক এবং কলা ও সঙ্গীত বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ (ডীন) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., পি. এইচ. ডি., মহোদয় তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করেও এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। তিনি আমার শিক্ষক। তাঁকে প্রণাম জানাই। আমার শিক্ষক, বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডঃ শিবপ্রসাদ

ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. ফিল. মহোদয়কে আমার এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ নিবেদন করতে পেরে তৃপ্তি বোধ করছি।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আমার সহকর্মী অধ্যাপক দিলীপকুমার মিত্র আমাকে যে সাহায্য করেছেন, তাতে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে ছোট করতে চাইনা। গ্রন্থ রচনাকালে পূর্ববর্তী গবেষকদের প্রদত্ত তথ্যাদি আমি যথেচ্ছ গ্রহণ করেছি। তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তবে সিদ্ধান্তের দায় সম্পূর্ণভাবে আমার। বিখ্যাত শিল্পী অহিভূষণ মালিককে তাঁর মূল্যবান পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

পরিশেষে নিবেদন, গ্রন্থ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সহকর্মীবৃন্দ ও স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত জানতে পারলে কৃতজ্ঞ থাকব।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় সূচী — পৃষ্ঠাঙ্ক

বৈষ্ণব ধর্মের গোড়ার কথা — — ১—১১

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম প্রাক্‌চৈতন্য যুগে — ১২—১৫

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্য — ১৬–২৪

(বহিরঙ্গ কারণ ১৬—১৮, অন্তরঙ্গ কারণ ১৯, চৈতন্য স্বরূপ ১৯—২০, স্বরূপের শ্লোকে তিন কারণের উল্লেখ ২০, রাধাপ্রেমের তাৎপর্য ২০—২১, প্রথম অন্তরঙ্গ কারণ ২১, দ্বিতীয় কারণ ২২, তৃতীয় কারণ ২২, দিব্যোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেব ২৪।)

গৌড়ীয়বৈষ্ণব দর্শনের মূলসূত্র — — ২৫—৩৬

(কৃষ্ণতত্ত্ব ২৫, গোপীতত্ত্ব ২৫, রাধাতত্ত্ব ২৬, প্রেমতত্ত্ব ২৭, প্রেমবিলাস বিবর্ত ২৮, ভক্তিতত্ত্ব ২৮, শক্তিতত্ত্ব ৩০, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ৩২, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ৩৩, পুরুষার্থ ৩৪, জীবতত্ত্ব ৩৫, সম্বন্ধ ও অভিধেয় তত্ত্ব ৩৬)

প্রেমতত্ত্ব — — — ৩৭—৪৩

ভক্তির তাৎপর্য ৩৭, শুদ্ধভক্তি থেকে প্রেমের উৎপত্তি ৩৭, কৃষ্ণপ্রীতির স্তরভেদ—প্রেম ৩৯, স্নেহ ৩৯, মান ৪০, প্রণয় ৪০, রাগ ৪১, অনুরাগ ৪১, ভাব ৪১, মহাভাব ৪১, দিব্যোন্মাদ ৪২।

ভক্তিরস — — — ৪৪—৫১

রস কি ৪৪, ভক্তি রসের রসতাপত্তি ৪৪, রস ও ভাবের পার্থক্য ৪৪, দেবাদিবিষয়ারতির রসত্ব হয় কি ভাবে ৪৫, আনন্দই রস ৪৬, লৌকিক রতি কেন রস হয় না ৪৬, ভক্তিরসের সংজ্ঞা ৪৭, মুখ্য ও গৌণ ভক্তিরস ৪৯,

বিষয় সূচী পৃষ্ঠাঙ্ক

পঞ্চরস—শান্ত ৪৭, দাস্য ৪৮, সখ্য ৪৮, বাৎসল্য ৩৯, মধুর ৪৯, সাধারণী, সমঞ্জসা ও প্রৌঢ়া মধুরা রতি ৫০, স্বকীয়া ও পরকীয়া ৫০, কন্যকা ও পরোঢ়া ৫০, মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ৫০, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ৫১, এদের ভেদ ৫১।

ভক্তিরসের উপাদান — — — ৫২—৫৬

রসের স্বরূপ ৫২, রসনিষ্পত্তি ৫২, শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদ্য ও আস্বাদক ৫২, রতিই আনন্দ ৫২, ভক্তিরসের স্বরূপ ৫২, বিভাব-আলম্বন ও উদ্দীপন ৫৩, অনুভাব ৫৪, সাত্ত্বিক ভাব ৫৪, ব্যভিচারী ভাব ৫৫।

নায়কভেদ — — — ৫৭—৫৯

নায়ক স্বরূপ ৫৭, নায়ক চার প্রকার—ধীরোদাত্ত ৫৬, ধীরললিত ৪৮, ধীরোদ্ধত ৫৮, ধীরশান্ত ৫৮, পতি ও উপপতি ৫৮, অনুকূল, শঠ, দক্ষিণ, ও ধৃষ্ট ৫৯, নায়ক সংখ্যা ৫৯।

মায়ক-সহায় ভেদ — — — ৬০—৬১

সংজ্ঞা ও গুণ ৬০, পঞ্চ সহায়—চেট, বিটা, বিদূষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নর্মসখ্যা ৬০।

নায়িকা প্রকরণ — — — ৬১—৮১

স্বকীয়া ও পরকীয়া ৬২, শ্রেষ্ঠ আট জন ৬২, কন্যকা ও পরোঢ়া ৬২, সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া ৬৩, শ্রীরাধা ৬৪, রাধার পাঁচ প্রকার সখী ৬৫, নায়িকা কাকে বলে ৬৬, মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকা ৬৬, ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা নায়িকা ৬৬, মধ্যা নায়িকাই শ্রেষ্ঠা ৬৭, অষ্ট নায়িকা—অভিসারিকা ৬৯, বাসকসজ্জিকা ৭৪, উৎকণ্ঠিতা ৭৫, বিপ্রলব্ধা ৭৬, খণ্ডিতা ৭৭, কলহান্তরিতা ৭৮, প্রোষিতভর্তৃকা ৭৯, স্বাধীনভর্তৃকা ৮০, নায়িকা সংখ্যা ৮১।

বিষয় সূচী | পৃষ্ঠাঙ্ক

নায়িকার দূতীভেদ — — — ৮২—৮৪

স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী ৮২, স্বাভিযোগ—বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ ৮২, আপ্তদূতী—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা, পত্রহারী ৮২, সখী ৮৩, সখী ও মঞ্জরীর পার্থক্য ৮৪।

মধুর বা শৃঙ্গাররসভেদ — — — ৮৫—৯৮

মধুর রসের উপাদান ৮৫, বিপ্রলম্ভ—পূর্বরাগ ৮৬ মান ৯১, প্রেমবৈচিত্ত্য ৯৪, প্রবাস ৯৬, সম্ভোগ ৯৭।

পদাবলীর রসপর্যায় — — — ৯৯—১২১

তাৎপর্য ৯৯, গৌরচন্দ্রিকা ৯৯, বাল্যলীলা ১০৪, আক্ষেপানুরাগ ১০৮, নিবেদন ১১২, মাথুর ১১৪, ভাবসম্মিলন ১১৭, প্রার্থনা ১২০।

কবি পরিচিতি — — — ১২২—১৮৩

চণ্ডীদাস ১২২, বিদ্যাপতি ১৩৩, জ্ঞানদাস ১৩৯, গোবিন্দদাস ১৬১।

পদাবলীর নানাদিক — — — ১৮৪—২১৯

তত্ত্বের রসপ্রকাশ ১৮৪, প্রাক্, সমসাময়িক ও পরচৈতন্য বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনা ১৮৬, রোমান্টিকতা ও বৈষ্ণব কবিতা ১৮৯, লীলাশুক ও বৈষ্ণব কবি ১৯২, ছন্দ ১৯৬, অলঙ্কার ১৯৮, গীতিকবিতা ২০২, গীতিনাট্য ২০৭, সমুদ্রগামী নদীর ন্যায় ২০৮, ব্রজবুলি ২১০, কীর্তন ২১৪।

বৈষ্ণব ধর্মের গোড়ার কথা

১

ধর্ম মানবের অতি মৌল বিশ্বাস। আদিম প্রভাতে এই বিরাট সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত মানুষ এই অপার কর্মকাণ্ডের পিছনে কোন মহাশক্তির লীলা অনুভব করেছিল। প্রাচীন মানুষ সমুন্নত শক্তির বৈচিত্র্যের অন্তরালে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। কখনো মূর্তির মাধ্যমে দেবতার রূপ বিধৃত হয়েছে। কখনো বা অমূর্ত দেব-মহিমাকে নানা সূক্তের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা দেখা গেছে। মানব সেই দেববাচক মহান শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দিত আহুতি, উচ্চারণ করত নানা স্তুতিমূলক সূক্ত। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির ত্রিবিধ চেতনার পথে সেই পরম সত্তার অস্তিত্বকে জানার আগ্রহ-ই নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করে তার সন্তুষ্টির জন্য কর্মের পথে দিত আহুতি, আর ভক্তির পথে চলত পরমস্বরূপের মহিমার উপলব্ধি, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ। আর্যমানব বিভিন্ন দেবতার কাছে শরণ নিয়েছে। বেদে তিন স্তরের দেবতা কল্পিত হয়েছে—ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের। পৌরাণিক যুগে দেবতাসংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ কোটিতে। কিন্তু সে অন্য কথা।

বিষ্ণুকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব ধর্মের গোড়াপত্তন। বিষ্ণু দ্যুলোকের অন্যতম দেবতা। অবশ্য বৈষ্ণব অর্থে প্রথমে কোনো ধর্মসম্প্রদায়কে বোঝাতো না। বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে বৈষ্ণব অর্থে 'বিষ্ণুর আশ্রিত' (belonging to Visnu)। কোন ধর্মসম্প্রদায় অর্থে গীতাতেও শব্দটি প্রযুক্ত হয়নি, হয়েছে মহাভারতে। বিষ্ণু থেকে উদ্ভূত 'বৈষ্ণব' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের কয়েকটি লেখা ও মুদ্রায়। গুপ্তরাজগণ 'পরম ভাগবত' উপাধি গ্রহণ করেন।

'ভক্তি' কথাটির প্রথম উল্লেখ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষ শ্লোকে (৬৷২৩)। শ্লোকটি এই—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

দেবতাতে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে) যার পরম ভক্তি আছে: এবং পরমেশ্বরে

যেরূপ, গুরুতেও সেরূপ (ভক্তি আছে)। পূর্ব কথিত শাস্ত্র সমূহ সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশ পায় (অন্য কাহারো নিকটে নয়)।

বৈষ্ণব ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য—নামে বৈষ্ণব ধর্ম হলেও, আসলে তা কৃষ্ণকথা। এর কারণ, প্রথমস্তরে, বিষ্ণুকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ। দ্বিতীয় স্তরে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশাবতার বলে পরিগণিত হন। তৃতীয় স্তরে, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। অন্যরা তাঁর অংশ মাত্র। বাসুদেব, ভগবত প্রভৃতি তাঁরই নামভেদ মাত্র। অতএব, সমস্ত মাধুর্যের ভগবত্তাসার, রসিকশেখর, পরমকরুণ কৃষ্ণকথার ইতিবৃত্ত রচনার প্রচেষ্টায় আমাদের উজিয়ে যেতে হবে প্রথমে বিষ্ণুকাহিনীতে।

ভক্তির তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'সত্তাবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সমন্বিত তীব্র আকর্ষণমূলক মনোবৃত্তি।' বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ধর্মক্রিয়ার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল বলে ভক্তি সাধনা সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করেনি। কারো কারো মতে, ভক্তিবাদের মূল অনার্য সমাজ সম্ভূত। বৈদিক ধর্মাচরণের সঙ্গে এই ধারা মিলিত হয়ে বিস্তৃততর ও গভীরতর হয়। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত :

"ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মসম্প্রদায়গুলি সাধারণতঃ কোনও বৈদিক দেবতাবিশেষকে আশ্রয় করিযা আত্মপ্রকাশ করে নাই। শিব ও যক্ষনাগাদি লৌকিক দেবতা-গোষ্ঠী বা বাসুদেব কৃষ্ণ প্রভৃতি মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা নিচয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই সকল উপাসকমণ্ডলী ক্রমশঃ গঠিত হয়।"

২

ঋগ্বেদের পাঁচ ছয়টি সূক্তে বিষ্ণুর উল্লেখ। তিনি প্রধান দেবতা হলেও প্রধানতম দেবতা নন। তবে 'বিষ্ণু' এই নামের মধ্যেই তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় নিহিত। ম্যাকডোনেলের মতে, "The name is most probably derived from Vis, 'be active', thus meaning 'the active one". আদিত্য বিশেষ বিষ্ণু তাঁর ত্রিপদ দ্বারা সমগ্র জগত ব্যাপ্ত করে আছেন।

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্র বোচং
যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং
বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥

—'আমি এখন বিষ্ণুর মহাশক্তির কথা বলব, যিনি পৃথিবী—মণ্ডল ব্যাপ্ত করেছেন; যিনি ব্যাপ্ত করেছেন গগনমণ্ডল তাঁর তিনপদ দ্বারা'। বেদে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, উরুক্রম, উরুগায়—প্রভৃতি নামে পরিচিত। যিনি বিস্তৃত ভাবে বিচরণশীল—তিনিই উরুক্রম, উরুগায়।

বিষ্ণুর তৃতীয়পদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল সেই পদস্থলে দেবতার আবাস। আচমন মন্ত্রে:

ওঁ বিষ্ণু তদ্‌বিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্‌॥

—সেই বিষ্ণুর পরমপদ আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায়, সূরগণ যা সর্বদা দর্শন করেন।

ঋক্‌ সংহিতার অন্যত্র বলা হয়েছে:
ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ ১।২২।১৭

—বিষ্ণু জগতে তিনপদ বিক্ষেপ করেন। সমগ্র জগত তাঁর ধূলিময় পদদ্বারা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। যাস্ক তাঁর 'নিরুক্তে' ঔর্ণনাভ মুনির উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। ঔর্ণনাভের মতে, বিষ্ণু সূর্য; তাঁর ত্রিপাদ বিক্ষেপ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা বোঝায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে, ধনুছিলার আঘাতে বিষ্ণুর ছিন্ন-মস্তক সূর্যরূপে প্রতিভাত। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর এক নাম শিপিবিষ্ট (Surrounded with rays)। বিষ্ণুর নব্বইটি ঘোড়া; প্রত্যেকটির আবার চারটি করে নাম। এ থেকে বছরের ৩৬০ দিন ও চারটি ঋতুর সন্ধান পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিষ্ণু সূর্য অথবা সূর্যশক্তি সম্পন্ন।

বেদে বিষ্ণুর অন্য পরিচয়—তিনি ইন্দ্রের সখা; ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করে বলা হোত—ইন্দ্র-বিষ্ণু।

'শতপথ ব্রাহ্মণে' বামনরূপী বিষ্ণুর কাহিনী আছে। তিনি কৌশলে অসুরদের কাছ থেকে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল অধিকার করেন। পরবর্তীকালে পুরাণের বামনরূপী বিষ্ণু কর্তৃক বলিকে ছলনার কাহিনী এখান থেকে এসেছে। আবার ধনুকের ছিলা দ্বারা বিষ্ণুর মস্তক ছিন্ন হওয়ার কাহিনী পরবর্তী কালে কৃষ্ণের প্রয়াণ কাহিনীর মূল-স্বরূপ। এ ছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণু, আদিত্য ও যজ্ঞ অভিন্নরূপে কল্পিত হয়েছেন।

উপনিষদে ধর্ম চেতনার বিবর্তন ঘটল। বেদে যখন যে দেবতার বন্দনা করা হয়েছে, তখন সেখানে সেই দেবতাই প্রাধান্য পেয়েছেন। অবশ্য ঋগ্বেদে এক সত্তার অস্তিত্ব চেতনার অস্ফুট প্রকাশও লক্ষ্য করা হয়। উপনিষদে পরমপুরুষ এক এবং অদ্বিতীয়-ও বটেন। তিনি হলেন ব্রহ্ম। অন্যান্য দেবতা এই ব্রহ্মেরই শক্তি। তিনি অজর, অক্ষর;—মহাজাগতিক বস্তুনিচয়ে তাঁরই প্রকাশ। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, অল্পে সুখ নেই; ভূমাই সুখ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন, ব্রহ্ম হচ্ছেন বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের বক্তব্য: 'সত্যম্‌জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম।' উপনিষদের এই দর্শন সম্পর্কে একটু কৌতূহলী হওয়ার দরকার এজন্য যে, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণই ব্রহ্ম, তিনিই ভূমাস্বরূপ—এই তত্ত্বব্যক্ত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে এসে উপনিষদের ব্রহ্ম ও পুরাণের বিষ্ণু অভেদরূপে প্রতিপাদিত হলেন। উপনিষদের মূল বক্তব্য—ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণেও বলা হোল—বিষ্ণুর থেকে এ জগতের উৎপত্তি; জগত তাঁতেই সংস্থিত; তিনিই জগতের নিয়ন্তা; তিনিই জগত।

বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
স্থিতিসংযমকর্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ॥ ১।১।৩৫

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর মহিমাবিষয়ে প্রবক্তা পরাশর বলেন, হিরণ্যগর্ভ, হরি, শঙ্কর, বাসুদেব, অচ্যুত, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, ব্রহ্ম প্রভৃতি বিষ্ণুর বিভিন্ন নামভেদ মাত্র। বিষ্ণু এক, অনন্ত, শাশ্বত, অপরিবর্তমান, সর্বব্যাপী, পরমাত্মাস্বরূপ। ভাগবতপুরাণে বিষ্ণুর-মহিমা আরো ব্যাপকভাবে কীর্তিত হোল। তবে তার আগে বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব, ভগবত—ইত্যাদি নামগুলির পারস্পরিক সংযোগ নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

৩

কৃষ্ণের এক নাম বাসুদেব। এ নামটিও প্রাচীন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। পালিগ্রন্থ, 'নিদ্দেশে' বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাসুদেব উপাসনারও উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায় যে, এ গ্রন্থ রচিত হওয়ার আগেই এ উপাসনা জনসমাজে প্রচলিত ছিল। পানিনির সূত্রে বাসুদেবের ভগবত্তা বিশ্বাসের কথা আছে। তাঁর অনুগামী সম্প্রদায়কে তিনি বাসুদেবক বলে উল্লেখ করেন। পতঞ্জলি পাণিনী সূত্রের ভাষ্য রচনাকালে মন্তব্য করেছেন:

'অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা সংজ্ঞৈষা তত্র ভগবতঃ—অথবা এ ক্ষত্রিয়ের নাম নয়, ভগবানের নাম।' তাহলে পাণিনির আগে থেকেই বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল, এ সিদ্ধান্ত করা যায়। ভাণ্ডারকরের সিদ্ধান্ত—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে অন্ততঃ এ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। কয়েকটি শিলালিপি থেকেও এ সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়। রাজপুতানার ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ ঘোষাণ্ডী লিপিতে (২০৩—১৫০ খৃঃ পূঃ) বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক ১০০ খৃঃ পূঃ বেসনগর লিপিতে উল্লেখ আছে, দিয়ারপুত্র হেলিওডোরাস নিজেকে 'পরম ভাগবত' আখ্যা দেন। তিনি গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করেন। খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দে নানাঘাট শিলালিপিতে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে বাসুদেব নামে যে রাজা রাজত্ব করেন, তাঁর নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অক্ষয় কুমার দত্ত মনে করেন যে, পূর্বপ্রচলিত বাসুদেব নামানুসারে ঐ রাজার অনুরূপ নাম রাখা হয়। ঘটজাতকে বাসুদেবের গল্প আছে। গীতায় কৃষ্ণ নিজেকে বৃষ্ণিবংশজাত বাসুদেব বলেছেন—'বৃষ্ণিনাং বাসুদেবোঽস্মি।'

মহাভারতে দু'জন বাসুদেবের উল্লেখ আছে। একজন হলেন পৌণ্ড্র রাজা বাসুদেব, অন্যজন সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা বাসুদেব বা কৃষ্ণ। দ্রৌপদীর বিবাহসভায় দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বাসুদেবই ঈশ্বররূপে প্রতীত। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অনুমান করেন যে, আদিতে সূর্যের নাম ছিল বাসুদেব। বিষ্ণুর সঙ্গে বাসুদেব নাম যুক্ত হয়। মহাভারতে (১২।৩৪১।৪১) কৃষ্ণ-বাসুদেবের সঙ্গে সূর্যের সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। পতঞ্জলিও বৃষ্ণিজাতির নেতা বাসুদেব এবং ভগবান বাসুদেবের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। আবার ঘটজাতকেও বাসুদেব নাম পাওয়া যায়। অন্যদিকে, 'নিদ্দেশ' গ্রন্থ ও পতঞ্জলি প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাসুদেব নামটি ছিল ভগবানের। যাদব-জাতির উপাস্য দেবতা বাসুদেব। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, বাসুদেব আদিত্য-স্বরূপ বিষ্ণুর অবতার।

মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে উপাস্য দেবতা হেরাক্লিসের উল্লেখ করেছেন। এই হেরাক্লিস সম্ভবতঃ হরি। বাসুদেবের এক নাম আবার হরি। ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, বাসুদেব কহ্বায়ন গোত্রভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণের নামের সঙ্গে এই গোত্রের নাম এক হওয়াতে কৃষ্ণ ও বাসুদেব অভিন্ন প্রতিপাদিত

হন। ডঃ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, বৃষ্ণিরাজা বাসুদেবের সঙ্গে ভগবান বাসুদেবও অভিন্ন হয়ে যান।

৪

ঋগ্বেদের ৮।৭৪ সূক্তটির রচয়িতা কৃষ্ণ। তিনি বৈদিক ঋষি। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণকে দেবকীর পুত্র বলা হয়েছে। এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং ভাগবতধর্মের প্রবর্তক বাসুদেব সম্ভবতঃ অভিন্ন। কহ্বায়ন নামটিই তার প্রমাণ। ঘটজাতকে কৃষ্ণ যোদ্ধা; কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনি ঋষি, ঘোর অঙ্গিরসের শিষ্য। মহাভারতে কৃষ্ণ একদিকে যোদ্ধা, অন্যদিকে ঋষি। মহাভারতে কৃষ্ণ বাসুদেব, দেবকীপুত্র এবং সাত্বত-প্রধানরূপেও পরিচিত; তাঁর দেবত্ব-ও সর্বত্র স্বীকৃত। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, কৃষ্ণের দেবত্বজ্ঞান মহাভারত প্রথম রচনা কালে ছিল না। কৃষ্ণকে দ্রৌপদীর 'গোপীজনবল্লভ' উক্তিটি প্রক্ষিপ্ত। কৃষ্ণ ভাগবতে পূর্ণব্রহ্ম বলে কথিত হ'লেও আদিপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে তিনি বিষ্ণুর অংশমাত্র। অবশ্য অংশাবতার কৃষ্ণের বিস্তৃত পরিচয় বিধৃত আছে সেখানে। জৈনমতে, কৃষ্ণ পার্শ্বনাথের (৮১৭ খৃঃ পূঃ) পূর্ববর্তীকালের। নবম খৃষ্টাব্দে রচিত আনন্দগিরির 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে বাসুদেব ও কৃষ্ণের নাম এবং উপাসনার কথা আছে। এ গ্রন্থে কৃষ্ণ ভক্ত নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য। কালিদাসের মেঘদূতে (পূর্বমেঘ। ১৫ শ্লোক) উজ্জ্বলকান্তি ময়ূরপুচ্ছধারী গোপবিষ্ণুর (অর্থাৎ কৃষ্ণ) উল্লেখ আছে। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের এক গুর্জর রাজার দানপত্রে কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত লিপিতে কৃষ্ণনাম পাওয়া যায়। ঐ সময়ের আগেই তিনি প্রধানদেবতারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন সন্দেহ নাই। এমনকি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়শতকে অন্ততঃ কৃষ্ণ-বাসুদেবের আখ্যান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত ছিল, একথা পতঞ্জলির উক্তিতে জানা যায়। 'ললিতবিস্তর' নামে একখানি অতি প্রাচীন বুদ্ধচরিত আছে। এ গ্রন্থে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, কুবের, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে কৃষ্ণের নামও আছে। এই কৃষ্ণ অবশ্যই দেবতা। অক্ষয়কুমার দত্ত নানা প্রমাণ দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "রাধাঘটিত উপাখ্যান ও বর্তমান কৃষ্ণোপাসক সম্প্রদায় সমুদায় তাদৃশ প্রাচীন নয় বটে, কিন্তু কৃষ্ণের দেবত্ব-কথা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই।"

কৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণে শ্রীমদ্ভগবদগীতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গীতায় ভক্তিবাদ বিশদ বিবৃত। এ কারণে গীতাকে ভক্তিশাস্ত্রের বেদ বলা হয়।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে তাঁতেই তদ্গতচিত্ত হ'লে তাঁর করুণা পাওয়া সম্ভব :

'সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

'ভগবত' শব্দটি আনন্দ ও সুখের আকরস্বরূপ। ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে এ নামটি পাওয়া যায়। মহাভারতে বিষ্ণু বা বাসুদেব অর্থে 'ভগবত' শব্দ ব্যবহৃত। ভাগবত অর্থে বাসুদেব অনুগামী ধর্মসম্প্রদায় বোঝায়। রামানুজের গুরু যামুনাচার্যের মতে, ভগবতকে যারা সত্ত্বভাবে উপাসনা করে, তাদের বলা হয় ভাগবত। ভগবান্ বিষ্ণুই যে ভগবত, একথা বিষ্ণুপুরাণেই উল্লেখ আছে : আবার এই বিষ্ণুই হলেন নারায়ণ। বিভিন্ন নাম—বিশেষ করে বাসুদেব ও দুই কৃষ্ণ—কোন এক সময় অভিন্ন হয়ে গেছে। এবং কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পরিগণিত হয়ে যুগে যুগে ভক্তির অর্চনা পেয়ে আসছেন। এ বিষয়ে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "But it is not possible to assert definitely that Vasudeva, Krisna the warrior and Krisna the sage were not three different persons, who in the Mahabharata were unified and identified, though it is quite probable that all the different strand of legends refer to one identical person."

কিন্তু ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "বৈষ্ণবধর্ম-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম উপাস্যদেবতা বিষ্ণুর প্রকৃত রূপ প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন দেবসত্তার, যথা মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা বাসুদেব কৃষ্ণের, আদিত্য বিষ্ণুর এবং নারায়ণের একীকরণের ফলেই পূর্ণ পরিণতিলাভ করিয়াছিল। দেবতার পূর্ণরূপের বিকাশে গোপালকৃষ্ণরূপটিও ন্যূনাধিক অংশগ্রহণ করিয়াছিল। (পঞ্চোপাসনা)।

যাহোক, বিষ্ণু, নারায়ণ, ভগবত, বাসুদেব, কৃষ্ণ—বিভিন্ন নামরূপ অবলম্বন করে বৈষ্ণবধর্মের যে উদ্ভব ও বিকাশ সূচিত হয়েছিল, নানাবিবর্তনের মধ্যে তার প্রবাহ থেমে থাকেনি। তখন থেকে বৈষ্ণবধর্ম পুষ্পিত হ'য়ে উঠতে থাকল কৃষ্ণ মাধুর্যের রসসিঞ্চনে।

৫

'শ্রীমদ্‌ভাগবত' মহাগ্রন্থে কৃষ্ণের জীবনলীলাচিত্র উজ্জলরূপে অঙ্কিত হয়েছে। ভাগবতে নানা অবতারের উল্লেখ থাকলেও 'কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান'—তিনি স্বয়ং ভগবান। দশমস্কন্ধের নব্বুই অধ্যায়ব্যাপী পরিসরে কৃষ্ণের নরাকারে লীলা-কাহিনীর বিশদ পরিচয়। ভাগবতে কোন অসাধারণ মহামানবকে দেবত্বে উন্নীত করা হয়নি, মাধুর্যের ভগবত্ত্বাসার দেবতা কৃষ্ণের মানবীকরণ করা হয়েছে। গীতার দার্শনিক ভক্তিবাদ ভাগবতে লীলারসাত্মক কাব্যে পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য, কৈশোর, পৌগণ্ড, যৌবন—প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার চিত্র আছে এতে।

তাসামাবির ভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎমন্মথ-মন্মথঃ॥

পীতাম্বরধারী, মাল্যভূষিত, স্মিত বদন, সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথ শৌরী আবির্ভূত হলেন। ইনিই ভাগবতের কৃষ্ণ। ভাগবতে প্রেমভক্তির—গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার বিশদ পরিচয় আছে। এতে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু একজন প্রধানা গোপীর কথা আছে। সেই প্রধানা গোপী হলেন রাধা—পরবর্তীকালে এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'রাধা' নামের সূচনাও সেই শ্লোকে। শ্লোকটি এই :

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

ভগবান ঈশ্বর হরি এঁর দ্বারা আরাধিত হয়েছেন। সে কারণে গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ করে প্রীত হয়ে এঁকে এই নিভৃত স্থানে নিয়ে এসেছেন।

এই 'অনয়ারাধিতঃ' কথাটির ভিতরে রাধার আভাস। তবে হরিবংশে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

ভাগবত গ্রন্থখানি বৈষ্ণব ভক্তের কাছে বেদস্বরূপ। ডঃ সুশীল কুমার দে সিদ্ধান্ত করেছেন, "The Bhagabata is thus one of the most remarkable mediaeval documents of mystical and passionate religious devotion, its eroticism and poetry bringing back warmth and colour into religious life"।

'রাধা' নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় মহাকবি হালের 'গাথা সপ্তশতীতে'। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থে কৃষ্ণের ব্রজলীলা বিষয়ক পদ আছে। একটি পদে রাধাকে অন্য গোপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। পদটি এই :

মুহমারুএণ তং কণ্হ রাহীআএ গোরঅং অবণেন্তো।
এতানং বল্লবীণং অন্নাণ বি গোরঅং হরসি॥ (১।৮৯)

—কৃষ্ণ, তুমি মুখের ফুঁ দিয়ে রাধিকার চোখ থেকে যে গোরজ দূর করছ, এতে অন্য গোপীদের গৌরব হৃত হচ্ছে।

এ গ্রন্থের আরো কয়েকটি সূক্তিতে কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে গাথাসপ্তশতী অতি উল্লেখযোগ্য উপাদান জুগিয়েছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মৎসপুরাণ প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থ সমূহে রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহদ্গোতমীয় তন্ত্রে উল্লিখিত একটি পদে শ্রীরাধাতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ এর সূক্ত একটি অবলম্বনেই পরবর্তীকালে শ্রীরাধিকাতত্ত্ব বিস্তারিত করেছেন। পদটি এই :

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনী পরা॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তৃত পরিচয়। কিন্তু নানাকারণে এ গ্রন্থ বৈষ্ণবের কাছে তত আদৃত নয়। নারদের ভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্রে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের নিগূঢ় রসটি অনুভূত হয়। শাণ্ডিল্য সূত্রে বলা হয়েছে—ঈশ্বরে প্রগাঢ় প্রেমই ভক্তি (সা পরাণুরক্তিরীশ্বরে)। বল্লবীযুবতীগণ জ্ঞানের অভাব-বশতঃই ঈশ্বরকে লাভ করেছিল। নারদের ভক্তিসূত্রে আছে, পরমপুরুষ প্রেমস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ (সা তস্মিন্ প্রেমরূপা, অমৃত স্বরূপা চ)। তাঁকে লাভ করলে মানুষ তৃপ্তি পায়, আত্মারাম হয়। ব্রজগোপীদের ভাবেই পরানুরক্তির সম্যকস্ফুরণ হয়। নারদের ভক্তিসূত্রে ঈশ্বর আসক্তি একাদশ পর্যায়ে বিভক্ত—গুণমাহাত্ম্য, রূপ, পূজা, স্মরণ, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্তা, আত্মনিবেদন, তন্ময়, বিরহ। পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নববিধা ও পঞ্চরসাত্মক ভক্তিসাধনার আভাস এতে।

আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' (৯ম শতক) নামক রসশাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক দুটি পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি পদ :

তেষাং গোপবধূবিলাস সুহৃদাং রাধারহঃ সাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দ রাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্প কল্পন বিধিচ্ছেদোপযোগেহধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীল ত্বিষঃ পল্লবাঃ॥

বৃন্দাবন থেকে দূত এসেছেন। কৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞেস করছেন, "ভদ্র, গোপবধূগণের বিলাস সুহৃদ, রাধার গোপন কেলিবিলাসের সাক্ষী কালিন্দী তীরবর্তী সেই লতাকুঞ্জগুলির কুশল ত? স্মরশয্যারচনার প্রয়োজন আর নেই, ছেদনের ও প্রয়োজন আর নেই। তাই হয়ত পল্লব শুকিয়ে ঝরে পড়ছে।" আলোচ্য পদটিতে শ্রীরাধাতত্ত্ব সুন্দররূপে প্রকাশিত।

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-এ রাধাকৃষ্ণ-লীলার পরিপূর্ণ ও উজ্জ্বল চিত্রায়ণ। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্মসংহিতার' সন্ধান পেয়ে সেগুলি বাংলা দেশে নিয়ে আসেন। প্রথমোক্তগ্রন্থের পরতে পরতে লীলারস মাধুর্য ঘনীভূত। পরবর্তী বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের উপর এর প্রভাব অসীম।

এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের আলোয়ার সম্প্রদায়ের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। বৈষ্ণবের কান্তাভাবসাধনার পুষ্টিতে এদের দান যথেষ্ট। আলোয়ার ভক্ত নিজেকে নায়িকা ও ভগবানকে নায়করূপে কল্পনা করে মধুর রসের পদ রচনা করেছেন। বিরহের বেদনা ও মিলনের ব্যাকুলতা এই সব পদে ঘনীভূত রসরূপ পেয়েছে। এদের ভজন তত্ত্বের পথে নয়, প্রেমের পথে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ-ভক্ত অণ্ডাল রঙ্গনাথকে জীবনস্বামী জ্ঞান করতেন। খৃঃ প্রথম শতক থেকেই আলোয়ারগণের এই ভজনরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আলোয়ার সম্প্রদায়ের ভাবসাধনার দ্বারা প্রথমতঃ প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। কারণ দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে তিনি গোপীভাবের ভজন প্রবর্তন করেন। আলোয়ার সম্প্রদায়ের যে দ্বাদশজন আচার্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হলেন সারযোগী।

৬

অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব। বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি জানালেন: ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; ব্রহ্মই সত্য, জগত মিথ্যা; ব্রহ্মের কোন ভেদ নেই; তিনি নির্গুণ; মায়া অনির্বাচ্য। শঙ্করাচার্যের এই অদ্বৈতমতের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভের ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে।

রামানুজের ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য ও তাঁর মতবাদের নাম—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। তিনিই সর্বপ্রথম ভক্তিকে দার্শনিক প্রতিষ্ঠা দান করেন। রামানুজের মতে:

ব্রহ্ম এক। কিন্তু তিনি নির্গুণ ও নির্বিশেষ নন। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন নয়; আবার ভিন্নও নয়। তিনি করুণাময় ও ভক্ত বৎসল। মানবের কর্তব্য: ব্রহ্মকে ভক্তি ও উপাসনা করা। রামানুজ বলেন যে, ব্রহ্মে শরণাগতিতেই মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে। এদিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য। তাছাড়া রামানুজের মতে, জীব ও মায়াশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির অতিরিক্ত বস্তু; কিন্তু গৌড়ীয়মতে এ দুইশক্তি স্বরূপাতিরিক্ত নয়।

মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বেদান্তভাষ্যের নাম—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন। মধ্বের মতে, ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ বর্তমান; ব্রহ্ম ও জীব—উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ, উপাদান কারণ নন। ব্রহ্মের স্বরূপানন্দের উপলব্ধিতেই মুক্তি। মুক্ত অবস্থাতেও ব্রহ্মে-জীবে নিত্য ভেদ বর্তমান থাকে।

নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাঁর বেদান্তভাষ্যের নাম—'বেদান্ত পরিজাত সৌরভ।' নিম্বার্কের মতে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধ বিদ্যমান। কারণরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে কার্যরূপ জগতের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ নিত্য বর্তমান। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সকল কল্যাণগুণের আকর। পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে অংশী ও অংশের সম্পর্ক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের সঙ্গে নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদ-বাদের সাদৃশ্য আছে।

বল্লভ তাঁর অনুভাষ্যে শুদ্ধাদ্বৈতাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, জীব ও জগৎ দুইই সত্য, দুইই ব্রহ্মময়। অগ্নি ও তাঁর দাহিকাশক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সে সম্পর্ক। ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ—দুইই। বল্লভের মতে, ভক্তিমার্গ দুটি—মর্যাদা ও পুষ্টি। শাস্ত্রশাসনের পথ মর্যাদার; কৃষ্ণের মাধুর্য ও লীলাসম্ভোগের অভিলাষ পুষ্টিমার্গের। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চনা ও স্তুতি—ভগবানের অনুগ্রহ লাভের উপায় এই ছয়টি। বল্লভের মতে, গোপীজনবল্লভ ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম—প্রাক্ চৈতন্য যুগে"

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভারতের বৈষ্ণব ধর্মের সাধারণ ধারার সঙ্গে এর পার্থক্য যথেষ্ট। শিলালিপি, মন্দির-চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের গোড়াকার ইতিহাসটি আমরা জানতে পারি। বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণলীলা কাহিনী বেশ প্রাচীন বলে পণ্ডিত মহলের ধারণা।

বাংলার বিষ্ণু-উপাসনার প্রাচীনতম নিদর্শন সম্ভবতঃ বাঁকুড়ার নিকটবর্তী শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহালিপি ও গুহার গায়ে অঙ্কিত বিষ্ণুচক্র। আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মহারাজ চন্দ্রবর্মার এই লিপিতে চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসনার পরিচয় আছে। পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে বগুড়া জেলার বালিগ্রামে গোবিন্দস্বামীর মন্দির, এই শতকের দ্বিতীয়পাদে উত্তরবঙ্গে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামীর মন্দির, ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদে ত্রিপুরাজেলায় প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম শতকে ত্রিপুরায় অনন্ত নারায়ণের উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শতকে পরম বৈষ্ণব ও পুরুষোত্তম উপাসক শ্রীধারণরাতের বিবরণ জানা যায়। এছাড়া প্রাপ্ত অসংখ্য মূর্তির সাক্ষ্যে জানা যায় যে, বিষ্ণুর উপাসনা এ যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। পাহাড়পুরের কৃষ্ণলীলা চিত্র এর প্রমাণ। এই লীলা প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরানো বলে অনেকে মনে করেন। দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মদেবের বেলাবো অনুশাসনে ব্রজলীলার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রসার হয়। গুপ্ত রাজগণ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'পরম ভাগবত' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পাল নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুদার ছিলেন না। খালিমপুর লিপিতে ধর্মপালদেবের নন্দদুলাল মন্দিরের উল্লেখ দেখা যায়। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে দিনাজপুরের গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এ যুগে যত দেবমূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের অধিকাংশই বিষ্ণুমূর্তি। সেনবংশের রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্ম দু'ভাবে সমৃদ্ধ হয়—বিষ্ণুর দশাবতার রূপ ও কৃষ্ণলীলার বিচিত্র বিকাশে। সেন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মণসেন-ও ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

শুধু মন্দির ও মূর্তিই নয়, সাহিত্যের মাধ্যমেও কৃষ্ণলীলার জনপ্রিয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। দশম শতকে 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' নামক সংস্কৃত পদ-সঙ্কলন গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চারটি পদ আছে। পরবর্তী বৈষ্ণব ভাবের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এ পদগুলিতে। এছাড়া এ গ্রন্থের একটি পদ পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের অভিসার বিষয়ক পদ রচনার উৎস স্বরূপ। পদটি এই:

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দ সঞ্চারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহস্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানূদ্ধৃত নূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধ পদস্থিতিঃ স্বভবনেপন্থানমভ্যস্যতি॥

সেনরাজত্বকালে দ্বাদশ শতকে সংকলিত শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা চিত্রিত হয়েছে। এ সব পদে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যঞ্জিত হয়েছে। বৈষ্ণব পঞ্চরসাত্মক পদই আছে এতে। লক্ষ্মণসেন, তাঁর পুত্র কেশবসেন ও সভাকবিদের পদ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে সঙ্কলন গ্রন্থখানা। বিভিন্ন প্রকার নায়িকা ও অভিসারের উদাহরণ মূলক পদ পাওয়া যায় এতে। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব ছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। তাঁর 'গীতগোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণলীলার চূড়ান্ত পরিচয়। হরির স্মরণে মন সরস করা এবং বিলাসকলায় কৌতূহল—এ দুয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে জয়দেবের মধুরকোমল কান্তপদাবলী 'গীতগোবিন্দ' রচিত। দশাবতার স্তোত্রের মধ্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের কিছু পরিচয় থাকলেও কবি লীলা মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। রাধাপ্রেমের বৈচিত্র্য —বিরহের বেদনা, আবার বসন্তকালীন রাসের উচ্ছল আনন্দ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে গীতগোবিন্দে। গীতগোবিন্দের কোমলকান্ত পদাবলী পরবর্তীকালের বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের আকরস্বরূপ। স্বয়ং চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে জয়দেবের পদও সর্বদা আস্বাদন করতেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও গঠন পারিপাট্যের উপরও গীতগোবিন্দের একচ্ছত্র প্রভাব। 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা কূলে রহঃ কেলয়ঃ'—গীতগোবিন্দের এই সুর পরবর্তী পদাবলীতে প্রসারিত।

চতুর্দশ শতকে সঙ্কলিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গলের' অনেক পদ রাধাকৃষ্ণলীলা রসের

পুষ্টিসাধন করেছে। একটি পদে বিরহার্ত হৃদয়ের সুর ধ্বনিত। আর একটি পদে রাধাকৃষ্ণের নৌকাবিলাস কাহিনী আভাসিত :

আরে রে বাহহি কাহ্নু নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগতি ন দেহি।
তই ইথি নইহি সংতার দেই
জো চাহসি সো লেহি ॥

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে' রাধাকৃষ্ণলীলা বৈচিত্র্য বাঙ্ময় রসরূপ পেয়েছে। গীতগোবিন্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবিত হলেও আদিমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন এই কাব্যখানিকে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবগণ বিশেষ আমল দিতে চান না।—তাঁদের মতে, বৈষ্ণব মতবিরোধী তত্ত্ব এতে প্রকাশিত; বৃন্দাবনের নওল কিশোর নয়, গ্রাম্য গোঁয়ার কৃষ্ণের কামকেলির স্থূল প্রকাশ এতে। কিন্তু গ্রন্থখানিকে একেবারের নস্যাৎ করা চলে বলে আমাদের মনে হয় না। কৃষ্ণের সম্ভোগলীলা ও ঐশ্বর্যের চিত্র গীতগোবিন্দে আছে। আর প্রাক্-চৈতন্য যুগে সম্ভোগাখ্যশৃঙ্গার রসের প্রাধান্য ছিল। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের প্রাধান্য পরচৈতন্য যুগে। তাছাড়া চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখলে কৃষ্ণকীর্তনে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব এখানেই যে, রাধার যে বিস্তৃত জীবনচিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন, তাতে রাধা অজ্ঞাত যৌবনাঅবস্থা থেকেপরিশেষেমহাভাবস্বরূপিনী কমলিনীতে রূপান্তরিতা বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রাধার চিত্রই আমরা পাই দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে!

'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থখানা বাংলার বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে যথেষ্ট প্রাণ সঞ্চার করে। মালাধর বসু ভাগবতের দশম-একাদশ-দ্বাদশ স্কন্দ অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। গ্রন্থটি—'তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন॥' এই গ্রন্থে মালাধর কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ অপেক্ষা মাধুর্যরূপের প্রতি অধিকতর প্রবণতা দেখিয়েছেন। 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'—এই ছত্রটি পরবর্তী কান্তাপ্রেম সাধনার প্রেরণা স্বরূপ। স্বয়ং চৈতন্যদেব মালাধরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে রাধাকৃষ্ণলীলারসাত্মক পদরচনায় বিদ্যাপতির অবদান অনস্বীকার্য। (এঁর সম্পর্কে পৃথক সমালোচনা দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে কিছু লৌকিক প্রেম কবিতার কথাও উল্লেখ করতে হয়।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, অমরুশতক, ধ্বন্যালোকে ধৃত বিভিন্ন লৌকিক প্রণয় মূলক পদ বৈষ্ণব প্রেম চেতনার পুষ্টিসাধনে সহায়তা করেছে। মূলে এসব পদ যে উদ্দেশ্যেই রচিত হোক না কেন, স্বয়ং চৈতন্যদেব ও রসজ্ঞভক্তগণ এইসব পদে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করেছেন। তার ফলে এ পদগুলি নতুন মহিমায় উন্নীত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শীলা ভট্টারিকার একটি পদের উল্লেখ করা যায়:

যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—
স্তে চোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বনিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

রাধাভাবে আবিষ্ট চৈতন্যদেব জগন্নাথ ক্ষেত্রে শ্রান্ত হ'য়ে বৃন্দাবনের জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বারবার এ শ্লোক আবৃত্তি করেন—'নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর। হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর॥' উদ্ধৃত শ্লোকটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন রূপগোস্বামী: কুরুক্ষেত্রে সকলে সমাগত, কিন্তু সেই কোলাহলে রাধা অতৃপ্ত, কালিন্দীপুলিনবিপিনের জন্য তাঁর মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

চৈতন্যপূর্ব বাংলাদেশে ভাগবত ধর্মের বহুল প্রচার হয়েছিল। এই ভাগবত-ধর্ম প্রচারে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর অবদান যথেষ্ট বলে অনেকে মনে করেন। 'মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘদরশনে যাঁর হয় অচেতন॥'—চৈতন্য চরিতামৃতকারের উক্তি। চৈতন্য ভাগবতে আছে 'ভক্তিরসের আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।' মাধবেন্দ্র পুরীর তেরজন শিষ্যের মধ্যে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, অদ্বৈতাচার্য ও ঈশ্বর পুরীর দ্বারা ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের গতি তীব্রতর হয়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের সিদ্ধান্তঃ মাধবেন্দ্র ও তাঁর শিষ্যদল শ্রীচৈতন্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। ভক্তগণের বিশ্বাস, অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কারে স্বয়ংভগবান চৈতন্যচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু। এছাড়া চন্দ্রশেখর, শ্রীবাস, মুকুন্দ, নিত্যানন্দ, গোপীনাথ, নরহরি সরকার, নৃসিংহ এবং আরো অনেকে ভাগবতকথাশ্রবণ ও কীর্তন করতেন। অবশ্য নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েই তাঁদের ভক্তিধর্মের অনুশীলন করতে হোত। এরপর চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণব প্রেমধর্মের ইতিহাসে যুগান্তর এল। ভক্তির শীর্ণ-খাতে শোনা গেল প্লাবনের উত্তাল কলরোল।

॥ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্য ॥

ষোড়শ শতকে জাতীয় জীবনের প্রবল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গতটে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। নবদ্বীপ, তথা সারা বাংলাদেশ, তখন ধর্মের গ্লানিতে পরিপূর্ণ। শুষ্ক জ্ঞান মার্গে বিচরণে, আচার-বিচারের বাড়াবাড়িতে মানুষ তখন রত। তখন ভক্তি বিবর্জিত সকল সংসার—'না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।' ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যানে বা শ্রবণে তখন কারো অনুরক্তি ছিল না। শুধু—

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্যগীত-বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥

(চৈ ভা,—আদি, ২য় অধ্যায়)

জাতীয় জীবনের এ হেন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছিল অবশ্য রাজনৈতিক কারণে। বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে পর্যুদস্ত বাঙালীর নৈরাশ্য তাকে অন্ধ তামসিকতার মধ্যে নিক্ষেপ করল। সেই বিশৃঙ্খল পটভূমিকায় দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করে ধর্মসংস্থাপনের জন্য 'সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুংকার' নিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে:

কলিযুগে যুগধর্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥
তপ্তহেম সমকান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নব মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গভীর ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে করুণাবতার শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে লিখেছেন:

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

—যা চির অনর্পিত, অর্থাৎ কোনকালে দেওয়া হয়নি, সেই উন্নতোজ্জ্বল ও রস-যুক্ত শ্রী অর্থাৎ প্রেমসম্পদ দানের জন্য করুণাবশতঃ শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছেন। স্বর্ণপুঞ্জের মত উজ্জ্বল দেহকান্তি বিশিষ্ট শচীনন্দনরূপী হরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে স্ফুরিত হউন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব নামপ্রেম বিতরণে জগতকে ধন্য করেছিলেন। তিনি জাতির মগ্ন চৈতন্যকে আপন জীবন সাধনার দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায় চৈতন্যদেব :

বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

বৈষ্ণব সাধক-কবি মহাপ্রভুর এই করুণাঘন মূর্তির কথা স্মরণ করেছেন :

পরশ মণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হৈল কত জনা। (পরমানন্দ)

ভক্তের ইচ্ছায় ধরাতলে অবতীর্ণ চৈতন্যচন্দ্ররূপী কৃষ্ণ—'আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার। নাম বিনা কলিকালে ধর্ম নাহি আর॥' কবিরাজ গোস্বামী এ সম্পর্কে আরো বলেছেন :

আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সঙ্কীর্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥
এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

কোন উপদেশের মাধ্যমে নয়, আপন জীবন সাধনার কষ্টিপাথরে মহাপ্রভু নাম-প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকট করে তুললেন। মহাপ্রভু কমলা, শিব ও বিধির দুর্লভ প্রেমধন জগতকে দান করলেন। সাধারণ ভক্তদের প্রভু নামকীর্তন করতে বলতেন, ধর্মোপদেশের গুরুভারে তাদের সাধনার পথ কণ্টকিত করেন নি। কিন্তু অন্তরঙ্গ জীবনে তিনি রসাস্বাদনে মগ্ন থাকতেন।

বহিরঙ্গ সনে করে নাম সংকীর্তন।
অন্তরঙ্গ সনে করে রস আস্বাদন॥

এইভাবে মহাপ্রভু আচণ্ডালে নাম-প্রেম বিতরণের দ্বারা জাতির প্রাণকেন্দ্রকে আবার স্বস্থ করে তুললেন। সমগ্র বাংলাদেশে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনসম্ভূত ভাবপ্লাবনে বাঙালী-হৃদয়ের মরাগাঙ দুকূল ছাপিয়ে গেল—'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়।' নিঃসন্দেহে ষোড়শ শতকের বাঙালীর জাতীয় জীবনের প্রাণচৈতন্য হলেন করুণাসাগর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব।

২

কিন্তু এহো বাহ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের কাছে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তাৎপর্য অন্য। ভূ-ভার হরণের নিমিত্ত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, এটি বহিরঙ্গ কথা।

প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার।
সত্য এই হেতু কিন্তু এহ বহিরঙ্গ॥

কেননা—'স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ'; কিংবা, 'যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তাঁর কাম।' 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—সেই কৃষ্ণই চৈতন্যচন্দ্ররূপে—নবদ্বীপে উদিত। তাঁর ক্ষেত্রে—'আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ।' পূর্ণ ভগবান্ যখন আবির্ভূত হন, তখন অন্য সব অবতারও তাঁতে এসে মিলিত হন। তখন গূঢ় কারণের সঙ্গে আনুসঙ্গিক ভূ-ভার হরণ ইত্যাদি কর্তব্যও এসে উপস্থিত হয়। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়:

কোন কারণে হৈল সবে অবতারে মন।
যুগধর্ম কাল হৈল সেকালে মিলন॥

অতএব, চৈতন্যদেবের নামপ্রেম বিতরণের কারণে আবির্ভাব, এটি সামান্য বা বহিরঙ্গ কারণ। অন্তরঙ্গ কারণ স্বতন্ত্র:

অবতরি প্রভু প্রচারিলা সংকীর্তন।
এহো বাহ্য হেতু—পূর্বে করিয়াছি সূচনা॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্যনিজ॥
সেই রস আস্বাদিতে হৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥

৩

ভক্তগণের মতে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ—রাধাকৃষ্ণ লীলা রসাস্বাদন। স্বরূপের কড়চায় আছে :

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ-
একাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

—'রাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি স্বরূপ, তাঁরই হ্লাদিনীশক্তি, অতএব একাত্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্বে লীলানিমিত্ত তাঁরা দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অধুনা আবার তাঁরা একাত্মতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত প্রকট কৃষ্ণস্বরূপ সেই চৈতন্যকে প্রণাম করি।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের মতে, রাধাকৃষ্ণের অদ্বয়স্ব রূপে বিলাসরস আস্বাদনের নিমিত্ত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। শ্রী রূপ গোস্বামীর উক্তির আলোকে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি ॥

বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি গরীব খাঁর একটি পদে এই তত্ত্বটি সার্থক কাব্যরূপ লাভ করেছে :

শরমে শরম পালায়ে গেল।
রাইকানু দুটি তনু ষ্যামন দুধে জলে ম্যাশায়ে গেল ॥...
জানি কার রূপ পাথারে চাঁদ গৌর হয়েছে ॥

রাধাকৃষ্ণ মূলে এক; লীলার জন্য তাঁদের এই দ্বিধা সত্তা। রাধাকৃষ্ণের এই অভিন্নত্বের তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পরিস্ফুট হয়েছে নিম্ন ভাষায় :

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ ॥

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

এই দ্বিধাসত্তাই চৈতন্যদেবে আবার ঐক্য প্রাপ্ত হয়েছে। লীলারস আস্বাদনের গূঢ় কারণটি ব্যক্ত হয়েছে স্বরূপ দামোদরের একটি শ্লোকে :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যোযেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধা কর্তৃক আস্বাদ্য আমার অদ্ভুত মধুরিমাই বা কিরূপ, আমাকে অনুভব করে শ্রীরাধার সুখই বা কিরূপ—এরই লোভে শচীগর্ভরূপ সিন্ধুতে রাধাভাবযুক্ত গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। চৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায়—

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে তাহা নহে আস্বাদন॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।

সেই কারণেই,

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরী।
রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপে কৈল অবতার।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর আবির্ভাবের এই অন্তরঙ্গ কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। চৈতন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার আগে তিনি রাধার প্রেমমহিমা বিশ্লেষণ করেছেন :

রাধিকা হবেন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
(চৈ. চ. আদি ৪র্থ)

কবিরাজ গোস্বামী আরো বলেছেন :

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥

মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥ (ঐ)

কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধিকার নামের তাৎপর্য সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতকারের উক্তি :

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
(চৈ. চ. আদি, ৪র্থ)

কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতেই নিবিষ্ট ; রাধিকাও কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণের জন্য সতত চেষ্টিতা। তা সত্বেও পূর্বে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন-তৃষ্ণা পূর্তিলাভ করেনি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সে কারণেই।

এই মত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্বণ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
যাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥

এই তিন আস্বাদন তৃষ্ণার প্রথম তৃষ্ণাতেই কৃষ্ণ মনে করেন :

রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।

স্বয়ং সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহ বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণের আশ্রয়-জাতীয় সুখের জন্য তৃষ্ণা জাগে। চৈতন্যদেবে একাধারে এই বিষয় ও আশ্রয়ের সমাবেশ।

সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ে আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে নারি আস্বাদিতে কি করি উপায়॥

কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন:

স্ব-মাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্তপূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেম দ্বারা নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি॥...
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

কৃষ্ণের অদ্ভুত ও অনন্ত মধুরিমা আস্বাদ করে রাধার সুখের সীমা নেই। কৃষ্ণেরও লোভ লাগে; মৃগনাভী কস্তুরির ন্যায়—'আপনি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।' 'রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হয় চমৎকার আস্বাদিতে মনে ওঠে কাম।' কিন্তু নিজেই নিজের মধুরিমা আস্বাদন করতে পারেন না। একমাত্র রাধাই পারেন—কৃষ্ণের মাধুর্যের নিত্য নবায়মান সুরভি উপলব্ধি করতে। তাই নিজের মাধুর্য উপলব্ধির তৃষ্ণাতেই শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে চৈতন্য-চন্দ্ররূপে কৃষ্ণের আবির্ভাব।

গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের তৃতীয় কারণটি আরো নিগূঢ়। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন:

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্যজনে সে তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির অত্যন্ত মর্ম যাতে॥

এই নিগূঢ় কারণটি হোল: কৃষ্ণের মধুরিমা আস্বাদ করে রাধার সুখই বা কিরূপ, তা জানার অভীপ্সা। লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম-কর্ম সব উপেক্ষা করে কৃষ্ণসুখ হেতু গোপীদের কৃষ্ণভজন, প্রেমসেবন—শুদ্ধ অনুরাগ বশেই। এই

গোপীদের মধ্যে আবার 'রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥' মনে রাখতে হবে—এই অনুরাগ কাম নয়, প্রেম। চৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায় কাম ও প্রেমের পার্থক্য নিম্নরূপ :

কামপ্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেম মহাবল॥

'প্রেম সেবনে' গোপীগণের মধ্যে সর্বোত্তমা রাধিকার প্রেমের গূঢ়ত্ব ও গাঢ়ত্ব অনেক বেশি। রাধিকার প্রেমের দ্বারাই কৃষ্ণমাধুর্য সর্বাপেক্ষা বেশি পুষ্ট। আবার কৃষ্ণ-মাধুর্য অনুভব করে রাধারও সুখের সীমা থাকে না। কৃষ্ণের লোভ জাগে রাধার সেই সুখ আস্বাদনের জন্য :

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেম রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥

এই হচ্ছে গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের তৃতীয় কারণ। এই তিনটি কারণেই রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব :

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময়মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥

প্রকট কালের শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাল কাটত। রাধাভাবে বিভাবিত চৈতন্যদেবের সেই আর্তির চিত্র বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে

বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্যজীবনী সমূহে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় এই আর্তির চিত্র অঙ্কিত করেছেন :

রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেইভাবে সুখ-দুঃখ ওঠে নিরন্তর ॥
শেষ লীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্ট সদা প্রলাপময় বাদ ॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘারি ॥

মহাপ্রভুর দিব্যজীবন সাধনায় রাধা-ভাবের আনন্দ-বেদনা প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করেছিল। ফলে বৈষ্ণবভক্ত চৈতন্যদেবের মধ্যেই রাধার বেদনামাধুর্য অনুভব করেছেন ; বৈষ্ণব মহাজনগণ রাধার মিলন বিরহের চিত্র আঁকতে চৈতন্যদেবের মিলন-বিরহের চিত্র এঁকেছেন। চৈতন্যদেব সম্পর্কে ভক্তকবি তাই অঞ্জলি দিয়েছেন নিম্ন ভাষায় :

যদি গৌরাঙ্গ না হইত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা
জগতে জানাত কে ॥
মধুরবৃন্দা-বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরি সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলসূত্র

॥ কৃষ্ণতত্ত্ব ॥

'অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম-আত্মা ভগবান তিন তার রূপ।' কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহ, মাধুর্যের ঘনীভূত সার। তিনি সর্বৈশ্বর্য, সর্বশক্তি ও সর্বরসপূর্ণ। রসরূপে তিনি আস্বাদ্য, রসিকরূপে আস্বাদক। তিনি নিজে আনন্দ অনুভব করেন, অন্যকেও করান। তিনি স্বপ্রকাশ। তার অনন্তশক্তির বৈচিত্র্য আছে। তার মধ্যে চিৎ, জীব ও মায়া—এই তিন শক্তি প্রধান। চিৎ শক্তির অন্য নাম স্বরূপ শক্তি। স্বরূপ শক্তির আবার তিন রূপ—সৎ, চিৎ, আনন্দ। সদংশে সন্ধিনী, আনন্দাংশে হ্লাদিনী এবং চিদংশে সম্বিৎ শক্তির শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশ। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ অনাদি, আবার সকলের আদি, সকল কারণের কারণ। তিনি লীলা করেন আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে। লীলা শব্দের অর্থ খেলা। এই লীলার মধ্যে আবার নরলীলা সর্বোত্তম—'কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ।' কৃষ্ণের মাধুর্যেরও পারিসীমা নেই। 'যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।' স্বয়ং কৃষ্ণের 'আপন মাধুর্য হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।' কৃষ্ণ অখিল রসামৃত সিন্ধু, শৃঙ্গাররসরাজ, অপ্রাকৃত নবীনমদন, আত্মপর্যন্ত-সর্ব-চিত্তহর, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ।

॥ গোপীতত্ত্ব ॥

গুপ্-ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। যাঁরা কৃষ্ণকেও বশীকরণ যোগ্য প্রেম রক্ষা করেন, তাদের গোপী বলা হয়। গোপীগণ আত্মবুদ্ধি সম্পন্না নহেন। কৃষ্ণ সুখের জন্যই তাঁদের সদাসর্বদা চেষ্টা। 'কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য—গোপীভাববর্য। গোপীদের এই প্রেমকে প্রাকৃত কাম বলা যায় না। কাম ক্রীড়া সাম্যে এ নাম। কৃষ্ণের বংশী নিনাদে সমাজ-সংসারের সব আকর্ষণ গোপীর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। ব্রজগোপী-সকলেই কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অংশ।

সেবার প্রকার ভেদে গোপী আবার দু'প্রকার—সখী ও মঞ্জরী। সখী রাধার সমজাতীয়া। তিনি স্বীয় দেহ দ্বারাও কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। কিন্তু মঞ্জরী নিজাঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করেন না। রাধাকৃষ্ণের মিলনের

আনুকূল্যবিধান তাঁর প্রধান কর্তব্য। রাধাকৃষ্ণের লীলারস পুষ্টির জন্য অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার মঞ্জরীর। অন্তরঙ্গ সেবায় এদিক থেকে সখীদের চেয়ে মঞ্জরীদের অধিকার বেশী। তবে সাধারণ ভাবে সখী ও মঞ্জরী—উভয়েই সখী নামে অভিহিতা। লীলা বিস্তার ও পুষ্টি সাধন করেন সখী—

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥……

॥ রাধাতত্ত্ব ॥

রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অংশ। কৃষ্ণ অংশী, রাধা অংশ। মৃগমদ ও তার গন্ধ, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মধ্যে যেমন ভেদ নেই, রাধাকৃষ্ণও তেমনি অবিচ্ছেদ্য। রাধা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরমভাব নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি ॥

রাধা মূল কান্তা শক্তি—লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজাঙ্গনারূপের বিস্তার রাধা থেকে। এই বিস্তারের কারণ 'বহু কান্তা নহে বিনা রসের উল্লাস।' কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতেই বর্তমান, রাধা-ও কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ণ করেন। রাধা সর্বদা কৃষ্ণগতপ্রাণা।

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥

রাধা কৃষ্ণের শক্তির অংশ হলেও লীলা রস পুষ্টির জন্য রাধার প্রেমের উৎকর্ষ অধিক প্রকাশিত। সব ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের খনি কৃষ্ণ রাধার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন—'রাধিকার প্রেম গুরু, আমি-শিষ্য-নট।' রাধার গূঢ় গহন প্রেমের আকর্ষণ শক্তিই কৃষ্ণকে বশীভূত করে।

রাধা নায়িকা, চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা। দুজনের মধ্যে পার্থক্য হোল— রাধার প্রেম স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্য, কৃষ্ণপ্রীতিবিধানই একমাত্র তার লক্ষ্য। কিন্তু চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণপ্রীতিতে আত্মসুখ লাভের কিছু ইচ্ছা বর্তমান।

মধুরা, কিশোরী, মহাভাব স্বরূপা, অপাঙ্গ দৃষ্টিচঞ্চল, উজ্জ্বলস্মিতা, সৌভাগ্যরেখাযুক্তা, সঙ্গীতনিপুণা, বিদগ্ধা, বিনীতা, লজ্জাশীলা, ধৈর্যশীলা, গম্ভীরা, কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রেষ্ঠা, রম্যবাক্—ইত্যাদি পঁচিশটি গুণে রাধা ভূষিতা।

॥ প্রেমতত্ত্ব ॥

বৈষ্ণব মতে, প্রেম অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। প্রাকৃত জীবের পক্ষে এই প্রেম লাভ করা সম্ভব নয়। প্রাকৃত চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হলে শুদ্ধ সত্বের বৃত্তি বিশেষ প্রেমের প্রকাশ সম্ভব। সাধন ভক্তির ফলে এর উদ্বোধন হয়। প্রেমের উদয়ে লৌকিক কামনাবাসনা, দূরীভূত হয়ে যায়। কাম ও প্রেমের তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: লৌহ আর হেমের মধ্যে যে ব্যবধান, কাম ও প্রেমের মধ্যেই তাই—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

প্রেম যখন অধিকতর পরিপক হ'তে থাকে, তখন কয়েকটি স্তর লক্ষ করা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে:

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে পরে প্রেমের উদয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

মহাভাব দু'প্রকার—রূঢ় ও অধিরূঢ়। রূঢ় মহাভাব মহাভাবের প্রথম অবস্থা। এ অবস্থায় সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। মহাভাব রূঢ় অপেক্ষা অনির্বচনীয় রূপধারণ করলে হয় অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাব আবার দু'প্রকার —মোদন ও মাদন। মোদন অর্থে মিলন জনিত আনন্দ, আর মাদন অর্থে মিলন জনিত মত্ততা বোঝায়। মোদন বিরহে মোহন নামে অভিহিত হয়।

॥ প্রেমবিলাসবিবর্ত ॥

'বিবর্ত' শব্দের তিনটি অর্থ—পরিপাক, ভ্রম, বিপরীত। প্রেমবিলাস বিবর্তে এই তিনটি অর্থই সুপ্রযুক্ত। রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য সাধন তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে রায় কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার, রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি—একথা বলার পর চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসমহত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন রায় স্বরচিত একটি সঙ্গীত প্রভুকে শোনান। গানটি—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল ॥
ন সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জানি ॥
না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন।
দুহু কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥
অবসোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেম কি ঐছন রীতি ॥

"ন সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥"—এই উক্তির মধ্যে প্রেমবিলাসবিবর্তের মূল রহস্য সংগুপ্ত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস যখন চরম অবস্থায় উন্নীত হয়, অর্থাৎ পরিপক্কতা লাভ করে, তখন দুটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—ভ্রম, বিপরীত অবস্থা। ভ্রান্তির ফলে তখন কে রমণ, কে রমণী—এ বোধ লোপ পেয়ে যায়। তখন তন্ময়তাবশে বিপরীত আচরণ করে। তখন রাধা নিজেকে রমণজ্ঞানে ও কৃষ্ণ নিজেকে রমণীজ্ঞানে তদ্রূপ আচরণ করেন। বিলাসের অতিমাত্র পরিপক্ক অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের এরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটে। ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে উভয়ে একমনা হয়ে যান।

॥ ভক্তিতত্ত্ব ॥

পরতত্ত্ব কৃষ্ণ রসস্বরূপ—তিনি আনন্দচিন্ময়, লীলাময়, মাধুর্যের রসঘন বিগ্রহ। সেই আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণের সেবা বাসনার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ার উপায়

ভক্তি। ভক্তিই ভজন। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রাপণীয়—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে :

কর্মতপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি জপ-ধ্যান,
ইহা হইতে মাধুর্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ ॥

ভক্তির সূত্রেই উপলব্ধ হয় যে, রসস্বরূপ সেই পরমতত্ত্ব সমস্ত জিজ্ঞাসা, উপলব্ধি, আনন্দের উৎস,—পরমাগতি ও পরমাসম্পৎ। রসঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। অহৈতুকী ভক্তির উৎকর্ষ বশেই তা সম্ভব। চৈতন্যদেব শিক্ষাষ্টকে বলেছেন :

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভগবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী সদা ত্বয়ী ॥

নরোত্তমঠাকুর বলেছেন : সেই সে পরম ধর্ম পুরুষের হয়।
কৃষ্ণপদে অহৈতুকী ভক্তি সু-নিশ্চয় ॥

ভক্তি দু ধরণের—সাধ্যভক্তি ও সাধন ভক্তি। সাধ্য ভক্তিকে বলা হয় রাগাত্মিকা ভক্তি। এই প্রেমভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত—কোন সাধন ভজনের, লোক ধর্ম, বেদধর্মের অপেক্ষা রাখে না। ব্রজগোপীদের প্রেম এ-জাতীয়। নিত্য বৃন্দাবনের নিত্য পরিকরবৃন্দের স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকা ভজন তাঁদের নিত্য-আত্মধর্ম, স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু নিত্য অনু-স্বভাব জীবের পক্ষে কৃষ্ণভক্তি সাধন সাপেক্ষ। এই সাধন ভক্তি আবার দু'প্রকার—বৈধিভক্তি, রাগানুগা ভক্তি।

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

বিধিমার্গের পথিক শাস্ত্রের অনুশাসনে ভজনে প্রবৃত্ত হন। এ স্তরে ভগবানের ঐশ্বর্য ও মহিমার স্মৃতি ভক্তের মনে জাগরূক থাকে। কিন্তু ঐশ্বর্য জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করে ব্রজভাব পাওয়া যায় না—চতুর্বিধা মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠ লাভ করে মাত্র। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, পূজন, আত্ম-নিবেদন, সখ্যতা—এই নববিধা অঙ্গের কোন একটি অবলম্বনে সাধক ভজন করেন।

কিন্তু রাগানুগা ভক্ত শাস্ত্রযুক্তি না মেনে ব্রজপরিকরগণের আনুগত্য স্বীকার

করে অসমোর্দ্ধ-মাধুর্যময় কৃষ্ণের ভজন করেন। ভক্তের নিকট রাগাত্মিকা ভক্তি পরম সাধ্যবস্তু। এই সাধ্যের জন্য সাধন হবে রাগানুগ ভাবে অর্থাৎ অনুরূপ রাগে রুচি উদ্বোধিত করে লীলারস আস্বাদন করা। রাগাত্মিকা ও রাগানুগা প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন :

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্‌ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্মৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি না মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

রাগানুগা ভক্তিমার্গের সাধক ভগবান্‌কে নিতান্ত আপনার জন বলে মনে করেন। মাধুর্যের সার, শুদ্ধ সত্ত্ব ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা-ই বৈষ্ণব সাধকের প্রধান কাম্য। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ প্রেম জীবের সাধ্য নয় বলে জীব গোপীর অনুগত হয়ে সেই পরম বিগ্রহের আনন্দময় লীলাবৈচিত্র্য উপলব্ধি করে। তাই-ই রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তির উদাহরণ :

দুহুঁ মুখ নিরখিব দুহুঁ অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
জোগাইব অধর যুগলে॥

॥ **শক্তিতত্ত্ব** ॥

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি বৈচিত্র্য বর্তমান। তার মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান—চিৎ শক্তি, জীব শক্তি ও মায়া শক্তি। চিৎ শক্তির অন্য নাম স্বরূপ শক্তি—কারণ চিৎ শক্তি সর্বদা কৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থান করে। একে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। কারণ এই শক্তির বলেই লীলাময় ভগবান অন্তরঙ্গ লীলা-বিলাস করেন। কৃষ্ণ স্বরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। স্বরূপ শক্তিরও তাই তিনটি রূপ—

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানী॥

সন্ধিনী শক্তির বলে ভগবান নিজের ও অপরের অস্তিত্ব রক্ষা করেন; সম্বিৎ শক্তির দ্বারা তিনি জানতে পারেন, জানাতেও পারেন; হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা ভগবান কৃষ্ণ আনন্দ অনুভব করেন ও করান। এই হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার মহাভাব। রাধিকা এই মহাভাব স্বরূপিণী। চিৎশক্তির অনন্ত বৈভব বর্তমান। শুদ্ধ সত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও তার নিত্য পরিকরগণ ভগবানের হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনীময় স্বরূপ শক্তির প্রকাশ। কৃষ্ণের লীলার সহায় কারণে চিৎশক্তির অন্য প্রকাশ যোগমায়া রূপে।

জীব শক্তিকে বলা হয়েছে তটস্থা শক্তি—'জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি তার অন্ত।' কারণ জীবশক্তি অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—কোনটিরই অন্তর্গত নয়, অথচ যে কোন দিকেই যেতে পারে। মায়ার আবরণ ছিন্ন করে জীব কৃষ্ণমুখীন হ'তে পারে; আবার মায়াপাশে আবদ্ধ হ'য়ে কৃষ্ণবিমুখী হ'য়ে জগৎ সংসারকেই একান্ত আপন বলে মগ্ন থাকতে পারে।

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা শক্তি, জগৎ সৃষ্টির কারণ স্বরূপ। এই শক্তির অবস্থান প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে—'তাঁহার বৈভবানন্ত প্রাকৃতেরগণ।' অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির কাছে মায়াশক্তি যেতে পারে না—যেমন পারে না, আলো ও অন্ধকার একসঙ্গে থাকতে। মায়ার দুটি বৃত্তি—গুণমায়া, জীবমায়া। গুণমায়া জগতের গৌণ উপাদান কারণ। সত্ত্ব, রজ ও তম—তার তিন বৈশিষ্ট্য। জীবমায়া জগতের গৌণ নিমিত্ত কারণ—জীবকে মায়াপাশে আবদ্ধ করে কৃষ্ণ বিমুখী করে তোলে। 'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥' এ প্রচেষ্টা কৃষ্ণের মাধুর্যকে আরো ঘনীভূত ও আকর্ষণ যোগ্য করে তুলবার জন্য। তা ছাড়া ভগবানের অনন্ত শক্তি এক রূপেরই বহুধা বিচিত্র প্রকাশ মাত্র—'অনন্তরূপে একরূপ কিছু নাহি ভেদ।'

॥ সাধ্যসাধন তত্ত্ব ॥

দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে চৈতন্যদেব তাঁকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্পর্কে দিক নির্ণয় করতে বলেন। সাধ্যবস্তু অর্থে—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই যে আমাদের চরম ও পরম সাধ্যবস্তু—রায় রামানন্দের আলোচনায় তা প্রকাশ পায়।

রামানন্দ কিন্তু প্রথমেই শেষ কথাটি না বলে একেবারে মূল থেকে আরম্ভ করেছেন। প্রথমেই বললেন—'স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।' চৈতন্যদেব তাকে 'এহো বাহ্য' বললেন। কারণ এ হোল বিধিমার্গে ধর্মাচরণের কথা, বহিরঙ্গ ব্যাপার, দেহাবেশও বর্তমান। এরপর রামানন্দ বললেন, 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার।' মহাপ্রভু তাকেও বাহ্যবস্তু বলে অভিহিত করলেন! কারণ এ কর্মাপণ, বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সচেতন প্রয়াসে, অতএব আত্মবোধের কথা। রায়ের পরের কথা—'স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্যসার।' গীতার এইটি শেষ কথা। কিন্তু প্রভু তাকেও 'এহো বাহ্য' বললেন। কারণ এই ধর্মত্যাগ হৃদয়ের ঐকান্তিকতার বশে নয়, কৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন তাই। এরপর রামানন্দ বললেন—'জ্ঞান-মিশ্রাভক্তি সাধ্যসার।' এখানে ভক্তির কথা থাকলেও প্রভু তাকে 'এহো বাহ্য' বললেন। কারণ যে ভক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে, সেখানে প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব নয়, জ্ঞানই সেখানে সব পথ জুড়ে বসে থাকে। রায় পরে বললেন, 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।' এর অর্থ হোল, ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভের চেষ্টা না করে ভগবৎ কথা শ্রবণে প্রেমের আবির্ভাব হতে পারে। এবার প্রভু বললেন, 'এহো হয়।' কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। তাই প্রভু বললেন, 'আগে কহ আর।' এরপর রায় বললেন—'প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার।' সেই পরম রসসমুদ্রকে আস্বাদনের একমাত্র উপায়—অহৈতুকী প্রেম—'প্রেম মহাধন। কৃষ্ণকে মাধুর্য রস করায় আস্বাদন॥' এমন কি যারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেছেন, তারাও এই মাধুর্যের লোভে কৃষ্ণ ভজনায় প্রবৃত্ত হন। এই প্রেমভক্তিকে প্রভু বললেন, 'এহো হয়।' কিন্তু আরো কিছু শুনতে চাইলেন—'আগে কহ আর।' তখন রায় রামানন্দ প্রেমভক্তির বিভিন্ন স্তর—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—প্রেম সম্পর্কে বললেন। দাস্য প্রেম সম্পর্কে প্রভু 'এহো হয়' বললেন। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রেমকে তিনি উত্তম বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু আছে কিনা জানতে চাইলেন। রায়ের মতে, 'কান্তা প্রেমই সর্বসাধ্যসার।' এরপর

রায় গোপীতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, প্রেমবিলাসবিবর্ত পর্যন্ত আলোচনা করলেন। রায়ের শেষ কথা—'রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি'। তখন প্রভু বললেন—'সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।'

এরপর মহাপ্রভু সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়। কৃপা করি কহ দেখি পাবার উপায়॥' এ সাধন জীবের প্রয়োজনে। জীবের পক্ষে গোপীদের অনুগত সাধনে কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ সম্ভব —'সখি ভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥ রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥'

॥ অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ॥

ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ নির্ণয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। শঙ্করাচার্যের মতে, জীব—ব্রহ্মের অভেদ সম্পর্ক; ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, জগৎ মিথ্যা প্রতিভাসমাত্র। আচার্য মধ্বর মতে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের সম্পর্ক। আচার্য রামানুজ অদ্বৈতবাদী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে, জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক যুগপৎ ভেদ ও অভেদের। এ ভেদাভেদ-বাদ অচিন্ত্যনীয়। বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্ত বিচার এবং সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দান কালে মহাপ্রভুর এই অভিমত প্রকাশ পায়।

গৌড়ীয় মতে, জীব অংশ, কৃষ্ণ অংশী। কৃষ্ণের অনন্তশক্তি। তার মধ্যে—স্বরূপ, মায়া ও জীব—এই তিনটি শক্তি প্রধান। জীব-জগৎ কৃষ্ণের এই জীব-শক্তির অংশ।

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈজে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥

জীব কৃষ্ণের তটস্থ শক্তির অংশ। অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি —এ দুয়ের মধ্যে এর অবস্থান। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তা হোল—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।

জীব স্বরূপে ব্রহ্মের নিত্যদাস। ভগবানের অহৈতুকী সেবা তার একান্ত কর্তব্য। কিন্তু বহিরঙ্গা মায়ার কবলে পতিত হ'লে জীব অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বিমুখী হয়। অথচ জীব ও ব্রহ্ম চিদ্রূপে এক। জীব অনুচৈতন্য, ব্রহ্ম

বিভুচৈতন্য। চিৎ-বস্তু রূপে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; আবার অণু ও বিভুর মানদণ্ডে জীব ব্রহ্মের ভেদ বর্তমান। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ বুঝানোর জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন:

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥

জীব-ব্রহ্মের সম্পর্কও তদ্রূপ। মৃগনাভি কস্তুরী ও তার সুগন্ধ—এ দুটিকে স্বতন্ত্র মনে করা যায় না। আবার দূরবর্তী স্থানে রক্ষিত কস্তুরীর সুগন্ধ যখন পাওয়া যায়, তখন সেই সুগন্ধ যে কস্তুরীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য—একথাও মনে করা যায় না। কিন্তু দেখা গেছে, কস্তুরী ও তার গন্ধকে পৃথক করা যায় না। তেমনি অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি সম্পর্কেও একই কথা। উষ্ণত্বের দিক থেকে স্ফুলিঙ্গ অগ্নির সঙ্গে অভেদমূলক, কিন্তু তাকে অগ্নিও বলা যায় না। জীব ও ব্রহ্মেরও তেমনি যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধ। এই ভেদাভেদ আবার অচিন্ত্যনীয়। এ কারণে এ তত্ত্বের নাম অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সার সূত্র এই তত্ত্ব।

॥ পুরুষার্থ ॥

পুরুষার্থ অর্থে অভীষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বুঝায়। আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ভার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। পার্থিব মানুষ আমরা সুখের জন্য লালায়িত। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে মানুষ সুখের সন্ধানে রত। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গকে সুখ প্রাপ্তির চরম উপায় বলে বর্ণনা করেছেন। কেউ ইন্দ্রিয়জ সুখ, কেউ অর্থজ সুখ, কেউ স্বধর্মাচরণের মাধ্যমে সুখের অন্বেষণ করেন। আবার কেউ কেউ এই জগৎ-সংসারকে অনিত্য মনে করে ইহলোকের সুখ অপেক্ষা মোক্ষের পদে পারলৌকিক সুখ লাভের সাধনা করেন। কিন্তু মহাপ্রভু এসে জগৎ-সংসারকে নতুন কথা শোনালেন। তিনি জানালেন—অন্য তিন বর্গের তো যথার্থ পুরুষার্থতা নেইই, এমন কি মোক্ষেরও নেই। তিনি বললেন:

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

মহাপ্রভুর মতে পঞ্চম ও চরম পুরুষার্থ হোল প্রেম—যা মানবকে চিরন্তন সুখের সন্ধান দিতে পারে।

কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥

॥ জীবতত্ত্ব ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।১১)

—বিষ্ণুর তিনটি শক্তি—পরা, অপরা ও অবিদ্যা। অপরাই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি এবং অবিদ্যাকে কর্মসংখ্যা এক তৃতীয় শক্তি বলা হয়। এই পরাপ্রকৃতিই জীবশক্তি—ঈশ্বরের তটস্থা শক্তি। চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান ॥

পরাপ্রকৃতি সম্পর্কে 'গীতার' বাণী—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

—হে মহাবাহু! এটি অপরা প্রকৃতি। আমার অন্য একটি প্রকৃতি বর্তমান—সেটি পরাপ্রকৃতি। সেই পরাপ্রকৃতিই জীবশক্তি ধারণ করে আছে। এই জীবশক্তি ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি বা মায়াশক্তি—কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা ঈশ্বরের জীবশক্তির অংশ। শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদের দ্বারা জীবকে ঈশ্বরের বিকার বলে অভিমত প্রকাশ করেন; তাঁর মতে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কিন্তু চৈতন্যদেবের মতে, 'বস্তুত পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ।' বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম। সেই মতে, ব্রহ্ম অংশী, জীব অংশ মাত্র।—

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥

শ্রীচৈতন্যদেব আরো বলেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্যাংশে কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।

॥ সম্বন্ধ ও অভিধেয় তত্ত্ব ॥

"সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বলে সম্বন্ধ-তত্ত্ব। যাঁহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, যাঁহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত, তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ॥" (চৈ. চ.—ভূমিকা। ডঃ রাধাগোবিন্দনাথ)

ব্রহ্ম সব শক্তির মূলাধার—তিনি শক্তিমান। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সব কিছুই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি বৈচিত্র্য রয়েছে। তার মধ্যে স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। মায়াবদ্ধ জীব সংসার-সাগরে হাবুডুবু খায় কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

—ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গিয়ে সে ঈশ্বরকে ও নিজের স্বরূপকে ভুলে যায়। কিন্তু 'সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়।' সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধজ্ঞান অনুধাবন তার একমাত্র কাম্য।—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥
শাস্ত্রগুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবেরে জানান ॥
বেদ শাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন ॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥

জীব ও কৃষ্ণের স্বরূপ অনুধাবন করাকে বলে সম্বন্ধ, আর অভিধেয় হোল কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥

॥ প্রেমতত্ত্ব ॥

গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন :

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

—আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়। তোমাকে সত্য বলি—তুমি আমাকে পাবে। মাধুর্যের ভগবত্তাসার পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করাই জীব জগতের চরম ও পরম কাম্য। এটাই চরম ও পরম পঞ্চম পুরুষার্থ। ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি বা অনুরাগ সঞ্চারিত হলে আত্মবুদ্ধি ও সংসার বাসনা লোপ পায়। স্ব-সুখ বাসনা অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রীতির ইচ্ছাই তখন বলবতী হয়ে ওঠে। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার অপর নাম প্রেম। আর এই কৃষ্ণভক্তি—প্রেমরূপ সর্ব্বসাধ্যসার।—'তত্ত্ব-বস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি, প্রেমরূপ।' "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি"—ভক্তিই সাধকের নিকট ভগবানকে প্রকাশ করায়। আর ভক্তি বা প্রীতি হ্লাদিনীর সারভূত অংশ—সেজন্যই কৃষ্ণরতি আনন্দরূপা—'রতিরানন্দরূপৈব'। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত-চিত্তে এই কৃষ্ণরতি চিরন্তন ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু সাধারণ জীবের পক্ষে এই রতি স্ফূর্তির জন্য সাধনের একান্ত প্রয়োজন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন :

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥

অতএব, কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ সাধনের প্রভাবে চিত্তে কৃষ্ণরতির উদ্‌গম হয়—তাতে কৃষ্ণকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই রতি বা ভাব কাকে বলে? উত্তরে রূপ গোস্বামী বলেন—

শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥

—"ভগবানের যে হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি তার সার হলো

ভাব। ইহা যেন প্রেমরূপ সূর্যের কিরণ, অথচ ইহা তীব্র নয়। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এতে রয়েছে বলে ইহা মনকে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল ক'রে তোলে।"

'নারদপঞ্চরাত্রে' বলা হয়ে—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥

—বিষ্ণুতে প্রেমসঙ্গতা মমতাকে ভক্তি বলে।

এই ভক্তি সাধনবশে কিভাবে লাভ করা যায়—সে সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ যে করয় ॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর ॥
আসক্তি-হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥

এই নব প্রীত্যাঙ্কুর যার চিত্তপটে ভেসে ওঠে, তার মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলি এই :—ক্ষান্তি (ক্ষোভশূণ্যতা), বিরাগ, মানশূণ্যতা, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্ত উৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণকে পাওয়ার আশা (আশাবন্ধ), কৃষ্ণ গুণগানে অনুরাগ, তীর্থস্থানে প্রীতি প্রভৃতি।

কৃষ্ণ-প্রীতি বা রতি ক্রমশঃ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'তে হ'তে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে—

প্রেম ক্রমে বাড়ে হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।
বীজ ইক্ষুরস গুড় তবে খণ্ডসার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর ॥

ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল, ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিতে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ।

প্রেম ঃ—

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ (ভ. র. সি)

—ভাব (রতি) গাঢ়তা প্রাপ্ত হলে সাধকের চিত্ত যখন সম্যক্‌রূপে মসৃণ এবং অতিশয় মমতাতিশয়াঙ্কিত হয়, তখন সেই রতিকে প্রেম বলা হয়।

আরো বলা হয়েছে ঃ

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ॥

—ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, যুবক-যুবতীর মধ্যে এরূপ ভাববন্ধনকে প্রেম বলে।

গাঢ়ত্ব, গুরুত্ব ও অতিশায়িতার কারণে প্রেম তিনপ্রকার—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ।

বিলম্ব বা কিঞ্চিৎ অনুপস্থিতির কারণে নায়িকার চিত্তবৃত্তি না জানার জন্য অন্যজনের মনে ক্লেশদায়ক প্রেমকে প্রৌঢ় প্রেম বলে। মধ্যপ্রেমে নায়ক এক নায়িকার সঙ্গে মিলিত হয়েও অন্য নায়িকার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে অর্থাৎ দু'জনের মধ্যে সমভাব পোষণ করে, তাকে মধ্য প্রেম বলে। আর সর্বদা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সান্নিধ্যের দরুণ যাতে ত্যাগ বা আদর কিছুই থাকে না, তাকে বলে মন্দ প্রেম। প্রৌঢ় প্রেমে অনুপস্থিত নায়িকার জন্য নায়ক প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু মধ্য প্রেমে নায়ক অন্য কান্তার অনুভব সহ্য করে। আর মন্দ প্রেমে আদর বা উপেক্ষা কোনটারই প্রাবল্য থাকে না। প্রৌঢ় প্রেমে থাকে বিচ্ছেদের অসহিষ্ণুতা, মধ্য প্রেমে—'কৃচ্ছাৎ সহিষ্ণুতা' অর্থাৎ কোনমতে কষ্টে সৃষ্টে সহ্য করা যায়, মন্দ প্রেমে কখনো বা বিস্মৃতি-ও জন্মে।

স্নেহ ঃ—

আরুহ্য পরমং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে।
অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু॥

—প্রেম চরম সীমায় উন্নীত হয়ে গাঢ়তাবশতঃ চিত্তকে উদ্দীপ্ত এবং হৃদয়কে দ্রবীভূত করলে তাকে স্নেহ বলে। স্নেহের আবির্ভাব ঘটলে শুধু দর্শনাদিতে তৃপ্তি ঘটে না। স্নেহের লক্ষণ—দর্শনে অতৃপ্তি ও চিত্তদ্রবতা। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ ভেদে স্নেহ তিন প্রকার। অঙ্গস্পর্শে স্নেহ উপজিত হলে কনিষ্ঠ, দর্শনে মধ্যম এবং শ্রবণ হেতু ঘটলে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। অন্যভাবে, স্নেহ দু'প্রকার—ঘৃত স্নেহ ও মধু স্নেহ। অত্যন্ত আদরময় স্নেহকে ঘৃত এবং 'ইনি আমারই' এমন স্নেহকে মধু স্নেহ বলা হয়।

মান :—

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাব্যাপ্তা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

—যে স্নেহ নিজে উৎকর্ষ পেলে নব মাধুর্য অনুভব করায় এবং নিজে অদাক্ষিণ্যধারণ করে, তাকে মান বলে।

স্নেহ গাঢ় হয়ে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হলে মাধুর্যকে নব আস্বাদে অনুভব করায়। সেই অবস্থায় বাহ্যিক বক্রতা বা কৌটিল্য প্রকাশ পায়। এ স্তরে ভাবের স্নেহ অপেক্ষা গাঢ়ত্ব ও চিত্তদ্রবতার আধিক্য প্রকাশ পায়। "অহেরিব গতি প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ"—প্রেমের গতি স্বভাব-বক্র। অবশ্য তাতে প্রেমের স্বাদ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়।

মান দু'প্রকার—উদাত্তমান ও ললিতমান। ঘৃত স্নেহ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হলে হয় উদাত্তমান, আর মধু-স্নেহ পক্কতায় ললিতমান। উদাত্ত মান আবার দু'প্রকার দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান ও বাম্যগন্ধোদাত্তমান। অন্তরে দাক্ষিণ্য, কিন্তু প্রকাশে অদাক্ষিণ্য দাক্ষিণোদাত্তের লক্ষণ; আর যেখানে অন্তরে বাম্যতা নেই, কিন্তু বাইরে বাম্যভাব প্রকাশ—সেখানে বাম্যগন্ধোদাত্ত মান।

প্রণয় :—মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥

—মান গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে বিশ্রম্ভলাভ করলে তাকে বলে প্রণয়। বিশ্রম্ভ শব্দের অর্থ—অভেদ মনন। বিশ্রম্ভ দু'প্রকার—মৈত্র্য ও সখ্য। সম্ভ্রমহীনতা ও সাধ্বস (স্বাধীনতা) হচ্ছে সখ্যতার লক্ষণ। গৌরবময় বিশ্রম্ভকে মৈত্র্য বলে। এক্ষেত্রে নায়িকা স্বাধীনভর্তৃকার ন্যায় আচরণ করে। মৈত্র্যের সঙ্গে উদাত্তমান যুক্ত হলে সুমৈত্র্য এবং সখ্যের সহিত ললিতমান যুক্ত হলে সুসখ্য মান হয়।

রাগ :—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বে নৈব রজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

—প্রণয় যখন উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়ে অধিক দুঃখকেও সুখ বলে মনে করায়, তাকে রাগ বলে। রাগ দু'প্রকার—নীলিমা ও রক্তিমা। নীলিমা রাগ আবার নীলী ও শ্যামা দুপ্রকার। যে রাগ ব্যয় হয় না, বাইরেও যার প্রকাশ নেই অর্থাৎ ঈর্ষা-মানাদিকেও প্রকাশ করে না, তাকে বলে নীলী রাগ। আর যে রাগ কিছুটা প্রকাশ পায়, চিরকালের সাধ্য, এবং ভীরুতার ভাণ করে—তাকে শ্যামা রাগ বলে।

রক্তিমারাগ কুসুম্ভ ও মাঞ্জিঠাজাত। যে রাগ অন্য রাগের কান্তি প্রকাশ করে, তা কুসুম্ভরাগ। আর যে রাগ অন্যরাগের অপেক্ষা রাখে না, সর্বদা বেড়ে যায়, নষ্ট হয়না—তাকে মঞ্জিষ্ঠা রাগ বলে।

অনুরাগ—সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনব প্রিয়ম্।
রাগোভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্যতে॥

যে রাগ নিত্য নতুন বৈচিত্র্যধারণ ক'রে প্রিয়তমকে নতুন নতুন ভাবে অনুভব করায়, তাকে অনুরাগ বলে। অনুরাগের ক্রিয়া হচ্ছে—পরস্পর বশীভাব, প্রেম বৈচিত্ত্য ; বিপ্রলম্ভে-ও বি-স্ফূর্তি ইত্যাদি।

ভাব—অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ যখন স্বসংবেদ্যদশা এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তি প্রাপ্ত হয়, তাকে ভাব বলে। স্ব-সম্বেদ্য=নিজের দ্বারা নিজের অনুভবের যোগ্য। যাবদাশ্রয় বৃত্তি=যে যে আশ্রয় আছে, তাদের সকলের উপরে ক্রিয়া (বৃত্তি) যার। এক কথায় বলতে গেলে, অনুরাগ নিজেকে অনুভবের অবস্থায় পৌছে সিদ্ধ ও সাধক ভক্তগণেও ব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ যার অনুভবে তাঁরাও অনুরাগে বিবশ হয়ে থাকেন, তাকে বলে—'ভাব'।

মহাভাব :

বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বঃ স্বরূপং মনো নয়েৎ॥

পরম আলৌকিক অমৃতময় সৌন্দর্য যার স্বরূপ এবং যার প্রীতি নিজের মনকে

আকৃষ্ট করায়, এমন ভাবকে বলে মহাভাব। মহাভাব কৃষ্ণের মহিষীগণেও অতি দুর্লভ; কেবল রাধা প্রভৃতি গোপীগণের অনুভববেদ্য। ভাবের পরাকাষ্ঠা হ'ল মহাভাব।

মহাভাব দু' প্রকার—রূঢ় ও অধিরূঢ়। সেখানে স্তম্ভ প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব প্রকটিত হয়, সেখানে রূঢ় মহাভাব। রূঢ়াখ্যমহাভাবে নিমেষের জন্যও অদর্শনে অ-সহতা, আসন্ন-জনতা হৃদ্ বিলোড়ন, সর্বদা বিস্মরণ, কল্পের ক্ষণতা-বোধ, কৃষ্ণসুখেও আর্তির আশঙ্কা—প্রমৃতি অনুভাবের লক্ষণ দেখা যায়।

মহাভাব রূঢ় অপেক্ষাও এক অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা লাভ করলে তাকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে। সুখ-দুঃখের অনির্বচনীয়তাই এখানে প্রধান।

অধিরূঢ় মহাভাব দু' প্রকার—মোদন ও মাদন। মোদনে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের উদ্দীপ্ত অতিশায়িতা প্রকাশিত। "মুদ্-ধাতু হইতে মোদন শব্দ নিষ্পন্ন। মুদ্-ধাতুর অর্থ—হর্ষ; সুতরাং মোদনে হর্ষ—মিলন জনিত বা সম্ভোগ জনিত আনন্দ সূচিত করিতেছে। আর মদ্—ধাতু হইতে মাদন শব্দ নিষ্পন্ন। মদ্-ধাতুর অর্থ—মত্ততা। সুতরাং মাদন শব্দে দিব্যমধু-বিশেষবৎ মত্ততা জনকত্ব—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন জনিত আনন্দোন্মত্ততা—বুঝায়।" (ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ)। মোদন বিচ্ছেদে মোহন নামে কথিত। মোহনে সাত্ত্বিকভাবগুলি—কৃষ্ণের সঙ্গে বিরহ দশায় সু-উদ্দীপ্ত হয়। মোহনের অনুভাব —অসহ্য দুঃখেও কৃষ্ণসঙ্গ লিপ্সা, ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভকারিতা, মৃত্যুর পরেও স্ব-ভূত অর্থাৎ দেহস্থ ভূতসমূহের দ্বারা কৃষ্ণ-সঙ্গের তৃষ্ণা, দিব্যোন্মাদ—প্রভৃতি।

দিব্যোন্মাদ :

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥

দিব্যোন্মাদ এক অনির্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ। এতে চিত্তের ভ্রান্তি ঘটে। "প্রেম-বৈবশ্যের ফলেই দিব্যোন্মাদ জন্মে। প্রেমবৈবশ্য বশতঃ কোন এক বিষয়ে সমস্ত চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা বা কেন্দ্রীভূততা এবং অন্যবিষয়ে অনুসন্ধানহীনতা জন্মে। অন্যবিষয়ে অনুসন্ধানহীনতা হইতেই সেই বিষয়ে ভ্রমাভা বৈচিত্রীর উদ্ভব হইয়া থাকে।" (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)। দিব্যোন্মাদের উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প প্রভৃতি ভেদ বর্তমান। উদ্‌ঘূর্ণা অর্থে ভ্রমময় চেষ্টা এবং জল্প অর্থে প্রলাপ বুঝায়। চিত্রজল্পের

আবার প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প—প্রভৃতি দশ প্রকার ভেদ দেখা যায়। শ্রীরাধার মত মহাপ্রভুর জীবনেও এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছিল।—

শেষলীলায় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময়বাদ॥
রাত্রে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপনভাব কহেন উঘারি॥

পরিকর ভেবে প্রেমসীমারও ভেদ হয়ে থাকে। কারণ সকলের পক্ষে সব ভাব আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই শান্ত, দাস প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পরিকরের প্রেমস্তরের সীমাও নিম্নরূপ—

শান্ত ভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেম পর্যন্ত।
দাস ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীমা।

ভক্তি রস

রস এক প্রকার মানসিক আস্বাদময় সম্বিত বিশেষ। সার্থক কাব্যপাঠ বা অভিনয় দর্শনের ফলশ্রুতি আনন্দ। এই আনন্দ অর্থাৎ 'ভালোলাগা'—এই-ই রস। রসের স্বরূপ এই যে, রস স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, বেদ্যান্তর-স্পর্শশূণ্য, ব্রহ্মস্বাদসহোদর এবং লোকোত্তর রসনিষ্পত্তি হ'য়ে থাকে। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে এই রসের সংখ্যা নয়টি—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত।

কিন্তু বৈষ্ণবরসবাদে রসের নতুনতর বিভাগ সৃজিত হোল। বৈষ্ণব মতে, মূলরসটি হচ্ছে—ভক্তি রস। অথচ পূর্ববর্তী রস-প্রবক্তাগণ ভক্তির রসতা-শক্তির কথা স্পষ্ট অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে—ভক্তি দেবাদি—বিষয়া রতি, অতএব তা রস নয়, ভাব।—মম্মটভট্ট তাঁর কাব্য-প্রকাশে স্পষ্টই বলেছেন: 'রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারি তথাঞ্জিতঃ। ভাবঃ প্রোক্তঃ॥' —দেবাদিবিষয়ক রতি ও ব্যঞ্জিত ব্যভিচারিকে ভাব বলা হয়। 'রস গঙ্গাধরে' আচার্য জগন্নাথও ভক্তির রসত্বের কথা অস্বীকার করে তাকে ভাব-রূপে অভিহিত করেছেন—'ভক্তের্দেবাদিবিষয়ারতিত্বেন, ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুষ-পত্তেরিতি।'—ভক্তি হচ্ছে দেবাদিবিষয়ারতি। দেবাদিবিষয়া রতি ভাবের অন্তর্গত। এজন্য ভক্তির রসতার উৎপত্তি হতে পারে না।'

এখানে সহজেই আমাদের মনে একটি প্রশ্ন আসে যে, ভাব ও রসের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য তাহলে কি? রূপ গোস্বামী রস ও ভাবের পার্থক্য সম্পর্কে বলেছেন—'ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে যাহা চমৎ-কারাতিশয়রূপে অত্যধিকরূপো আস্বাদিত হয়, তাহাকে বলে রস। আর, অনন্যবুদ্ধি পণ্ডিতগণ ভাবনার পদে রাখিয়া গাঢ় সংস্কারের দ্বারা চিত্তে যাহার ভাবনা করেন, তাহাকে বলে ভাব॥" (শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ কর্তৃক অনূদিত) ভাব রসের প্রথম অবস্থা। বিভাব-অনুভাব প্রভৃতি সংযোগে ভাবের রসরূপে আস্বাদ্য হওয়ার তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে—ভাব সাক্ষাৎকার, ভাব স্বরূপ, রস সাক্ষাৎকার। ভাব বিভাবাদির ভাবনা দ্বারা রসরূপে পরিণতির যোগ্য (ভাবস্বরূপ) হয়, পরে বিভাবাদির সংযোগে রসরূপে

পরিণত হয় (রস-সাক্ষাৎকার)। জীব গোস্বামীও বলেছেন—"সমাধিধ্যানয়োরেবানয়োর্ভেদ ইতি ভাবঃ।"—সমাধি ও ধ্যানের মধ্যে যে ভেদ, রস ও ভাবের মধ্যেও সেরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়। নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় ধ্যানের বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু উপলব্ধ হয় না, তেমনি রসাস্বাদনের সময়ে অখণ্ডতার উপলব্ধি জন্মে; বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি প্রভৃতি ভাবের পৃথক কোন বোধ জন্মে না। আবার ধ্যানের সময় অন্য ভাবনাও যেমন এসে পড়তে পারে, ভাবসাক্ষাৎকারে তেমনি বিভাব অনুভাবের চিন্তা জাগরূক থাকে।

লৌকিক রসপ্রমাতারা বলেন যে, বিভাব অনুভাব ও ব্যাভিচারিভাবের দ্বারা অপরিপুষ্ট স্থায়িভাবকে (রতি) যেমন রস বলা যাবে না, ভাবই বলতে হবে, তেমনি দেবাদিবিষয়ারতিকে রস বলা যাবে না, ভাবই বলতে হবে। আর এই দেবাদিবিষয়ারতি রসে পরিণত হ'তে পারে না—এ উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, দেবাদিবিষয়ক রতি বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।

এর উত্তরে বৈষ্ণব আলঙ্কারিক বলেন যে, প্রাকৃতরসকোবিদ্‌গণ দেবতার অর্থ নির্ণয় করতে ভুল করেছেন বলেই দেবাদিবিষয়ারতি সম্পর্কে তাঁদের এই ভ্রান্ত মতবাদ। দেবতা দু'প্রকার—ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব। বাসুদেব, নারায়ণ প্রভৃতি ঈশ্বরতত্ত্ব—আনন্দরসঘন বিগ্রহ। কিন্তু ইন্দ্রদেব হচ্ছেন—জীবতত্ত্ব। সহৃদয় সামাজিক চিত্ত মায়িকগুণসম্পন্ন (সত্ত্বগুণও মায়িক); সুতরাং সত্ত্বগুণময় চিত্তে অপ্রাকৃত আনন্দনন্দনৈবরতত্ত্ব বিষয়ক রতি অঙ্কুরিত হ'তে পারে না, ইন্দ্র প্রভৃতি জীবতত্ত্ব-দেবতা বিষয়ক রতিই অঙ্কুরিত হ'তে পারে মাত্র। ইন্দ্র দেবতা হলেও জীবতত্ত্ব, কিন্তু তাঁর আচার আচরণ মনুষ্যজনোচিত নয়। সুতরাং তার বিভাব প্রভৃতিও সহৃদয় সামাজিকের লৌকিক রতির অনুকূল কিম্বা পোষক হতে পারে না, ফলে রসপুষ্ট হয় না। এ কারণে জীব গোস্বামীর উক্তি—'যত্তু প্রাকৃতরসিকৈঃ রসসামগ্রীবিরহাদ্‌ভক্তৌ রসত্বং নেষ্টং তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদিবিষয়মেব সম্ভবেৎ॥' অর্থাৎ প্রাকৃত রসকোবিদগণ ভক্তিতে রস-সামগ্রীর অভাববশতঃ ভক্তিতে রসত্ব নেই বলেন, তা প্রাকৃত দেবাদিবিষয়েই সম্ভব।'

রস বর্জিত কোন ভাব হ'তে পারে না—এ কথা একাধিক রসতত্ত্ববিদ

বলেছেন। ভরতের উক্তি—"ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিত।" ভাব ছাড়া রস হ'তে পারে না, রস ছাড়া ভাব হ'তে পারে না। তাহলে দেব-বিষয়ক রতিকে ভাব বলে অভিহিত করলে তার রসত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। এই যুক্তিতে বলা যায় যে, প্রাকৃত দেবরতিরও রসরূপ সম্ভব, তবে তা গৌণভাবে এবং তাও অতি সামান্য। কিন্তু ভগবান রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। রসরূপে তিনি আস্বাদ্য, রসিকরূপে তিনি আস্বাদক। একমাত্র ভক্তির বশেই সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহ পরমপুরুষের মাধুর্য ও লীলারস অনুভবের দ্বারাই জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনা চরম তৃপ্তি পায়। স্বয়ং ভগবানের উক্তি—'ভক্ত্যাঽহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।'

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আনন্দই হচ্ছে রস। অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকার-আনন্দই রস। ভগবান রসস্বরূপ—আনন্দই স্বরূপে আস্বাদ্য ও আস্বাদক—দুভাবেই কৃষ্ণ-মাধুর্য অসমোর্দ্ধ। এই অপূর্ব মাধুর্যের বশেই কৃষ্ণের "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥" কৃষ্ণের এই আস্বাদন চমৎকারিত্বময় মাধুর্য—(রস ও আনন্দ) শক্তির কোন স্পষ্ট পরিচয় লীলাশুক বিল্বমঙ্গল দিতে পারেন নি, শুধু আকুলি বিকুলি করেছেন ; বলেছেন 'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥' আস্বাদকরূপে কৃষ্ণ স্বরূপের আনন্দ ও শক্তির আনন্দ আস্বাদ করেন। স্বরূপের আনন্দ আস্বাদন অর্থাৎ নিজের আস্বাদ্য রসস্বরূপের আস্বাদন, শক্তির আনন্দ আস্বাদন অর্থে তাঁর স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বিশেষ যে প্রেমরস তার আস্বাদন। সে প্রেমরসই ভক্তিরস। এখানে কৃষ্ণ পরম রসিক শেখর।

বৈষ্ণব মতে, লৌকিক রতি কখনও রসে পরিণত হ'তে পারে না। কেননা রসাস্বাদনের চরম লক্ষ্য সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তি। লৌকিক রতি প্রাকৃতচিত্ত-বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। মায়িকগুণসম্পন্ন প্রাকৃত চিত্তে বহিরন্তকরণের ব্যাপারন্তর রোধক চমৎকার সুখ যে রস, তা স্ফূর্ত হ'তে পারে না। লৌকিক রতি দেশকালের সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু সুখ হইতেছে অসীম—'ভূমৈব সুখম্।' প্রাকৃত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি প্রভৃতিও সসীম। সুতরাং এ সকলের সংযোগে অলৌকিক রস নিষ্পত্তি হ'তে পারে না। তাই বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের উক্তি : 'তস্মাল্লৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্।' (জীব

গোস্বামী)। ভক্তি (কৃষ্ণরতি) স্থায়িভাব ভক্তিরসে পরিণত হয়। 'আস্বাদাঙ্কুর কন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে'—আস্বাদাঙ্কুর কন্দরূপ স্থায়িভাব রসে পরিণত হয় (কবিকর্ণপুর)।

রূপগোস্বামী ভক্তিরসের নিম্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন: "শ্রবণ—কীর্তন—স্মরণ ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়িভাব 'কৃষ্ণরতি' বিভাব-অনুভাব সাত্ত্বিকভাব-ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে আস্বাদ্য অবস্থায় আনীত হইলে তাহা ভক্তিরস হইয়া যায়।" (অনুবাদ—শ্যামাপদ চক্রবর্তী) বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি; আলম্বন বিভাবের বিষয় কৃষ্ণ, আধার কৃষ্ণভক্ত; কৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, হাস্য, বংশী প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব; নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাস্য, হিক্কা, জৃম্ভণ প্রভৃতি অনুভাব; স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিকভাব এবং নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, চিন্তা, হর্ষ, নিদ্রা, চাপল্য প্রভৃতি তেত্রিশটি ব্যভিচারি ভাব।

ভক্তিরস দু'প্রকার—মুখ্য ভক্তিরস, গৌণভক্তিরস। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—মুখ্যরসের এই পাঁচ প্রকার ভেদ। গৌণভক্তি রস সাত প্রকার হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস। রস যে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী, একথা বৈষ্ণব রস শাস্ত্রেও অস্বীকৃত হয় নি; তবে সহৃদয় হচ্ছেন এখানে ভক্ত। যিনি ভক্তিরসের অনুভব করেন, তাঁকে ভক্ত বলা হয়—'ভক্তিরসানুভবাচ্চ ভক্তঃ।' ভক্ত বা পরিকরভেদেই রতি তথা রসের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হয়েছে:

রতিভেদে ভক্তিবেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সাম্যরতি আর।।
বাৎসল্যরতি মধুর রতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রসপঞ্চভেদ।।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুররস নাম।

॥ শান্তরস ॥

শান্তরসকে বলা হয়েছে জ্ঞানভক্তিময় রস; স্থায়িভাব—শান্তরতি, বিষয়ালম্বন—চতুর্ভুজ নারায়ণ; আশ্রয়ালম্বন—শান্তভক্ত; উদ্দীপন বিভাব—উপনিষদ পাঠ ও শ্রবণ, নির্জন স্থানে সাধনা, জ্ঞানদর্শী, ব্রহ্মসত্র প্রভৃতি। শান্ত ভক্ত

দু'ধরনের—আত্মারাম ও তাপস। আত্মারামের রতিলাভ ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপাবশে; তাপস সাধনার দ্বারা ভগবানের কৃপায় শান্তরতি লাভ করেন। সনক, সনন্দ—আত্মারাম শান্তভক্ত। ভগবানকে পরমাত্মাবোধে শান্তভক্ত তাঁর উপাসনা করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে শান্তের লক্ষণ সম্পর্কে উক্তি:

কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণ ॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরব্রহ্ম—পরমাত্মা—জ্ঞান প্রবীণ ॥

শান্তভক্ত কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। 'শান্তভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেম শান্তি'—অর্থাৎ প্রেমবোধ শান্তভক্তে নেই। কোনরূপ প্রীতি পূর্ণ নৈকট্যবোধ শান্তভক্তে নেই। তবে আত্মারাম ভক্তে মাধুর্যঘন বিগ্রহ ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি জাগরূক হয়।

॥ দাস্যরস ॥

দাস্য ভক্তিরসকে বলা হয়েছে প্রীত ভক্তি রস। এটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত সম্ভ্রমপ্রীত ও গৌরবপ্রীত। সম্ভ্রমপ্রীত বর্তমান থাকে দাসমনোভাবসম্পন্ন ভক্তের ক্ষেত্রে; গৌরবপ্রীত বর্তমান থাকে কনিষ্ঠজন, পুত্র প্রভৃতি লাল্যের ক্ষেত্রে। 'ভগবান প্রভু, আমি তাঁর আজ্ঞাধীন'—এ ধরনের মনোভাব দাস্যভক্তে বর্তমান। দাস্যরতিতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, তদুপরি আছে সেবা। দাস্যে মমত্ববুদ্ধিও বর্তমান। সেবা দ্বারা ভগবানের প্রীতি বিধানের আকাঙ্ক্ষা প্রীতভক্তের হৃদয়ে বর্তমান। 'দাস্যভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত' —অর্থাৎ দাস্যরতিতে রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়—এই কয়টি স্তর বর্তমান।

॥ সখ্যরস ॥

রূপগোস্বামী সখ্যরসকে বলেছেন প্রেয়ো রস। জীব গোস্বামী বলেছেন মৈত্রীরস। এর স্থায়িভাব বিশ্রম্ভ বা সখ্যরতি। বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন —শ্রীদাম, সুদাম, অর্জুন প্রভৃতি। কৃষ্ণ ব্রজে দ্বিভুজ; অন্যত্র কখনো দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ। সখ্যে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে সঙ্কোচের লেশমাত্র থাকে না। সখাগণ কৃষ্ণগতপ্রাণ; কৃষ্ণবিনা ত্রিভুবন তাদের কাছে অন্ধকার। সখ্যে আছে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, অধিকন্তু আছে সঙ্কোচহীনতা। গাঢ় প্রীতি ও মমত্ববুদ্ধির বশেই সখাগণ কৃষ্ণকে তাঁদেরই মত একজন বলে মনে করেন।

ফলে কৃষ্ণকে যেমন তাঁরা সখাভাবে সেবা করেন, তেমনি তিনি তাঁদের সেবা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেনও। পারস্পরিক সমত্ববোধের ফলেই এটা সম্ভব। সখ্যের এই গলাগলি ভাবে কৃষ্ণও বিশেষ প্রীত।

সখ্যরসে উদ্দীপন বিভাব: কৃষ্ণের বয়স, রূপ, বেণু, পরাক্রম, শঙ্খ প্রভৃতি। অনুভাব—বাহুযুদ্ধ; কন্দুক ক্রীড়া; কৃষ্ণের সঙ্গে উপবেশন ও শয়ন, নৃত্য-গীত প্রভৃতি।

॥ বাৎসল্যরস ॥

এতে থাকে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে মাতা-পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক। কৃষ্ণ সন্তান, ভক্ত মাতা বা পিতা। এর স্থায়িভাব—বাৎসল্য রতি। আলম্বন—কৃষ্ণ। উদ্দীপন বিভাব—কুমার বয়স, রূপ, স্মিতহাসি, চাপল্য প্রভৃতি। মাতা যেমন সন্তানকে লালন-পালন করেন, আবার তাড়ন-ভর্ৎসন করেন—বাৎসল্য রসেও অনুরূপ ভাব বজায় থাকে। বাৎসল্য রসে থাকে শান্তের কৃষ্ণাসক্তি, দাস্যের সেবা, সখ্যের সমপ্রাণতা, অধিকন্তু থাকে লাল্যত্ব-পাল্যত্ব ও অনুগ্রাহ্যত্বের ভাব। ভগবানে কোনরূপ ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই; বরং আছে মমত্ববুদ্ধির আধিক্য-বশতঃ হেয়জ্ঞান (দয়া, অনুকম্পা)। বাৎসল্যরতিতে অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়—'পিতৃ-মাতৃ স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত।'

॥ মধুররস ॥

মধুর ভক্তিরসে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক কান্ত-কান্তা সম্পর্কের তুল্য। ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা। এতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা, বাৎসল্যের লালন-পালন—সবই আছে; অধিকন্তু আছে স্বীয় অঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণসেবা। মধুররসের স্থায়িভাব 'মধুরা রতি'। বিষয়-আলম্বন—নায়ক-চূড়ামণি কৃষ্ণ, আশ্রয়-আলম্বন বিভাব—কৃষ্ণ প্রেয়সীগণ। বংশীধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। উজ্জ্বলরস, কান্তারস, শৃঙ্গাররস, শুচিরস—মধুর রসের বিভিন্ন নাম। মধুররস সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—'ভক্তিরসরাজ'। বলা হোল—'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'। কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কৃষ্ণের উক্তি:

'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥'

মধুরা রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা, প্রৌঢ়া। কৃষ্ণের রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁর দ্বারা ভোগবাসনা পূরণের কামনা সাধারণী রতির অন্তর্গত। যেমন—কুব্জা রতি। কৃষ্ণের রূপলাবণ্য দর্শনে কিংবা তাঁর গুণাদি শ্রবণের ফলে শাস্ত্রসম্মত পরিণয় বন্ধনের দ্বারা তাঁর সঙ্গসুখলাভের ইচ্ছা সমঞ্জসা রতির অন্তর্গত। রুক্মিণী, সত্যভামার রতি এই স্তরের। সমর্থ রচিত নায়িকার কাছে নিজের ভোগবাসনা তুচ্ছ, গৃহধর্ম, কুলধর্মের অপেক্ষা তাঁদের নেই। তাঁদের কৃষ্ণবিষয়ক রতি স্বতঃসিদ্ধ। ব্রজ গোপীর রতি এই স্তরের।

কৃষ্ণপ্রেয়সী দু'প্রকারের—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া কান্তা কৃষ্ণের পরিণীতা কান্তা। এদের বৈশিষ্ট্য :—পাতিব্রতধর্মপালনের জন্য তাঁরা সর্বদাই তৎপর থাকেন। যাঁদের কাছে ইহলোক ও পরলোকের কোন অপেক্ষা থাকেনা, একান্ত অনুরাগ বশে যাঁরা নায়কের কাছে আত্মসমর্পণ করেন—বিবাহ বন্ধনের অপেক্ষা রাখেন না, তারাই পরকীয়া কান্তা। পরকীয়া কান্তা আবার দু'প্রকার—কন্যকা ও পরোঢ়া।

ব্রজ গোপীগণ পরকীয়া নায়িকা, তাদের কৃষ্ণরতি সমর্থা। এদের মধ্যে আবার 'রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি'। রাধার থেকেই ত্রিবিধ কান্তার বিস্তার। রাধার প্রেমের উৎকর্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥ (চৈ, চ.)

স্বীয়া ও পরকীয়ার তিন প্রকার ভেদ—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা। মুগ্ধা নায়িকা নবীনা, রতিবিষয়ে পারদর্শী নয় ; মধ্যা নায়িকা যৌবনবতী, সমান লজ্জা মদনা, প্রত্যুৎপন্নমতি, কিঞ্চিৎ কোমলা, প্রগল্‌ভা নায়িকা, পূর্ণ যৌবনবতী, রতিবিষয়ে অতি উৎসুক, একসঙ্গে বহুভাব জানেন, মানে কর্কশ ভাষিণী ইত্যাদি। মধুর রসে নায়িকার আটপ্রকার অবস্থা---অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীন ভর্তৃকা।

শৃঙ্গার রস দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। নায়ক নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায় অভীষ্ট আলিঙ্গনের অপ্রাপ্তিতে হলো বিপ্রলম্ভের উদ্গম। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। বিপ্রলম্ভ চার প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। নায়ক-নায়িকার দর্শন-আলিঙ্গনাদির দ্বারা উল্লাস প্রাপ্ত ভাবকে বলে সম্ভোগ। সম্ভোগ দু'প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। এদের প্রতিটির চার প্রকার ভেদ :—(সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান)।

ভক্তি রসের উপাদান

"...যে আস্বাদ্য বস্তুর আস্বাদনে চমৎকারিত্ব জন্মে, তাহাকেই রসশাস্ত্রে 'রস' বলা হয়। অননুভূতপূর্ব্ব বস্তুর অনুভবে, অনাস্বাদিতপূর্ব বস্তুর আস্বাদনে, চিত্তের যে স্ফারতা জন্মে, তাহাকেই বলা হয় চমৎকৃতি। এই চমৎকৃতিই হইতেছে রসের সার বা প্রাণবস্তু; এই চমৎকৃতি না থাকিলে কোন আস্বাদ্য বস্তুকেই রস বলা হয় না।" (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)।

রসের উৎপত্তি ঘটে কেমন করে—এ সম্পর্কে প্রাচীন রস-শাস্ত্রকারগণ নানাভাবে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হলেন ভরতমুনি। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে (স্থায়ীভাব) রসে পরিণত হয় (রসনিষ্পত্তি)—আচার্য ভরতের এই সিদ্ধান্ত সর্বজনস্বীকৃত ও আলোচিত। প্রাচীন রসশাস্ত্রকার ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন নি। কিন্তু বৈষ্ণব আলংকারিকদের মতে ব্রহ্মের রসস্বরূপত্ব আস্বাদন-ই সর্বোত্তম। অসমোর্দ্ধমাধুর্য, সর্বগুণের আকর, অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ রসরূপ ও রসের আস্বাদক—দুই-ই। আপন হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেম বা ভক্তিরসের নির্যাস তিনি আস্বাদন করে থাকেন। কৃষ্ণ আনন্দ ও রসস্বরূপ 'রসো বৈ সঃ।' ভক্তিরসের আস্বাদনে তিনি বিষয়ালম্বন এবং তাঁর পরিকরগণ আশ্রয়ালম্বন।

"হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া ভক্তি (বা কৃষ্ণরতি, বা ভাগবতী প্রীতি) হইতেছে স্বরূপতঃই আনন্দরূপা—"রতিরানন্দরূপৈব॥ ভ. র. সি. ২।১।৪॥" এই আনন্দ হইতেছে চিন্ময় আনন্দ, লৌকিক জড় আনন্দ নহে। রতির এই আনন্দ এতই প্রাচুর্য্যময় যে, ব্রহ্মানন্দও তাহার নিকট তুচ্ছীকৃত হয়। তথাপি কিন্তু এই আনন্দারূপা রতি বা ভক্তি আপনা-আপনি তাহার আস্বাদ্যত্বের অনুরূপ চমৎকারিত্বময়ী নহে; অপর কতকগুলি সামগ্রীর সহিত যুক্ত হইলেই তাহা এক অপূর্ব আস্বাদন—চমৎকারিত্ব ধারণ করে এবং তখনই তাহাকে বলা হয়—ভক্তিরস।" (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)। রসের সামগ্রী বা উপাদান বলতে যে সকল বস্তুর সম্মিলনে একটি আস্বাদ্যবস্তু রসে পরিণত হয়, সেই সকল বস্তুকে এই রসের উপাদান বলা হয়। যেমন গুড়-মরিচাদি সহযোগে পানক রস তৈরি করা হয়।

এখানে ওই গুড়-মরিচাদি হচ্ছে রসের উপাদান। কৃষ্ণরতি স্থায়ীভাব বিভাবাদি সহযোগে ভক্তি রসে পরিণত হয়—

সামগ্রী পরিপোষেণ পরমা রসরূপতা ॥
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তি রসো ভবেৎ ॥

—এই স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি—বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচার, সাত্ত্বিক প্রভৃতি সামগ্রীরূপ ভাবকদম্ব দ্বারা শ্রবণাদি কর্তৃক ভক্তজনের হৃদয়ে আস্বাদনীয় হলে তার নাম হয় ভক্তিরস।

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রস-স্বরূপ পায় পরিণামে ॥"
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব "রস" হয় এই চারি মিলি ॥

বিভাব

রতির উৎপত্তির হেতুকে বিভাব বলে। রূপ গোস্বামী বলেন—

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদন হেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে ॥

—রতির আস্বাদনের হেতুকে বিভাব বলে। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব।

আলম্বন বিভাব আবার দুই প্রকার—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণ রতির বিষয় এবং কৃষ্ণভক্তগণ আশ্রয়।

ভক্ত ভেদে রতি তথা রসের প্রকার ভেদ ঘটে। ভাব ভেদে ভক্ত পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস, সখা, মাতা-পিতা ও কান্তা।

ভক্তাস্তু কীর্তিতাঃ শান্তাস্তথাদাসসুতাদয়ঃ।
সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥

উদ্দীপন বিভাব :

উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।

—যে বস্তু চিত্তের ভাব উদ্দীপ্ত করে, তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, অঙ্গসৌরভ, বংশী ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব :

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়া-প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥

—চিত্ত-স্থ ভাবের অববোধক (পরিচায়ক), বাইরে বিক্রিয়া (অর্থাৎ প্রতীয়মান ক্রিয়াবিশেষকে) অনুভাব বলে। নৃত্য, গীত, হুংকার, অট্টহাস্য, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি অনুভাব।

সাত্ত্বিকভাব :

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

—কৃষ্ণ সম্বন্ধি রতি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে আক্রান্ত চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। আর সত্ত্ব থেকে উৎপন্ন ভাবকে সাত্ত্বিকভাব বলা হয়।—

—"সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।"

সাত্ত্বিকভাব তিনপ্রকার—স্নিগ্ধা, দিগ্ধা ও রুক্ষা॥ স্নিগ্ধা সাত্ত্বিক ভাব আবার মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পঞ্চরতি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হলে মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব হয়। আর হাস্য প্রভৃতি গৌণ সপ্ত রতি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হলে হয় গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব। মুখ্য ও গৌণ রতি ভিন্ন অন্য ভাবের দ্বারা উৎপন্ন রতি চিত্তকে আক্রান্ত করলে তা হয় দিগ্ধ! ভক্ততুল্য অথচ রতিশূন্য জনের চিত্তে কখনো ঈশ্বর-কথা-শ্রবণে ভাবোদয় হলে তাকে রুক্ষ সাত্ত্বিক বলে।

সাত্ত্বিক ভাব আটটি—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

স্তম্ভ—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ, অমর্ষ (রোষ) থেকে উৎপন্ন হয়। এতে বাগাদিরাহিত্য, নিশ্চলতা ও শূন্যতার ভাব প্রকাশ পায়।

স্বেদ—হর্ষ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি থেকে জাত দেহের ক্লেদ (ঘাম)।

রোমাঞ্চ—হর্ষ, উৎসাহ, ভয়, বিস্ময় (আশ্চর্য) থেকে জাত হয়।

স্বরভেদ—বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ, আনন্দ, ভয় প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন হয়!

কম্প—বি-ত্রাস, অমর্ষ, হর্ষ প্রভৃতি দ্বারা গাত্রের যে 'লৌল্যকৃৎ' অর্থাৎ চাঞ্চল্য!

বৈবর্ণ্য=বিষাদ, ক্রোধ, ভয়াদি থেকে বর্ণবিক্রিয়া। বৈবর্ণ্যে দেহ মলিন ও কৃশ হয়।

অশ্রু—হর্ষ, ভয়, বিষাদাদির ফলে চোখে আপনা থেকেই যে জল আসে। এতে নয়নক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্জনাদি ঘটে।

প্রলয়—চেষ্টা ও জ্ঞানের অভাব হয়, এমন সাত্বিকভাব।

সত্বভাব আবার চার প্রকার—**ধূমায়িত**. **জ্বলিত**, **দীপ্ত** ও **উদ্দীপ্ত**। অল্প ব্যক্ত হলেও গোপন করা যায়, এমন সাত্বিক ভাবকে বলে 'ধূমায়িত।' দুই তিনটি সাত্বিকভাব একসঙ্গে উদিত হয় এবং কষ্টে গোপন করা যায়, তাদের বলে জ্বলিত।' তিন, চার বা পাঁচটী সাত্বিকভাব যখন একসঙ্গে উদিত হয়, তাদের সম্বরণ করা যায় না—তাহলে 'দীপ্ত' সাত্বিকভাব হয়। যখন একই সঙ্গে পাঁচ, ছয় বা সবগুলি সাত্বিকভাব উদীপ্ত হয়ে পরমোৎকর্ষ হয় তখন হয় 'উদ্দীপ্ত।'

সাত্বিক ভাবের মত অথচ তা নয়, এমন কতকগুলি ভাব আছে। তাদের বলা হয় সাত্বিকাভাস। এটি চার প্রকার—রত্যাভাসভব, সত্বাভাসভব, নিঃসত্ব ও প্রতীপ। রত্যাভাসের জন্য মুমুক্ষু প্রভৃতিতে রত্যাভাসভব সাত্বিকাভাস উৎপন্ন হয়। শিথিলচিত্তে হর্ষ বিস্ময়ের আভাস দেখা দিলে হয় সত্বাভাস। এর থেকে জাত ভাব সত্বাভাসভব। পিচ্ছিল চিত্তে সত্বাভাব ছাড়াও অশ্রু পুলক দেখা দিলে নিঃসত্ব হয়। আর কৃষ্ণের শত্রু প্রভৃতিতে ক্রোধ ভয় প্রভৃতি দ্বারা যে সাত্বিকভাস হয়, তাকে বলে প্রতীপ।

ব্যভিচারি ভাব

বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি ॥
বাগঙ্গ-সত্বসূচ্যা জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিঃ সঞ্চারিণোঽপি তে ॥

—ব্যভিচারিভাব বিশেষভাবে আভিমুখ্যের সহিত স্থায়িভাবের প্রতি গমনশীল (চরণ)। বাক্য, অঙ্গ ও সত্বদ্বারা সূচিত হয় এই ভাব। ভাবের গতি সঞ্চার করে বলে একে **সঞ্চারী** বলা হয়। ব্যভিচারিভাব তরঙ্গের ন্যায় উঠে নেমে স্থায়িভাবসমুদ্রকে বৃদ্ধি করে তাতেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ স্থায়ি-

ভাব থেকে উঠে তাতেই মিশে যায়। ব্যভিচারিভাব তেত্রিশটি :—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ক্রীড়া, অবহিথা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ।

এছাড়া সঞ্চারিভাবের আরো বহুবিধ ভেদের কথা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে কথিত হয়েছে।

নায়ক ভেদ

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারি ও সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা মধুরা রতি আস্বাদনীয় হয়ে উঠলে তাকে মধুর ভক্তিরস বলে। বিভাব দু' প্রকার— আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দু' প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, কৃষ্ণপ্রিয়াগণ আশ্রয়ালম্বন। স্বকীয় ও পরকীয় প্রেমের ভেদে শ্রীকৃষ্ণ কখনো পতি, কখনো উপপতি। বস্তুতঃ মধুরসের স্ফূর্তি সাধনে তিনিই একমাত্র নায়ক। নায়কের সর্বগুণ তাঁর মধ্যে বিরাজিত—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
যত্র নিত্যতয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণা।
সোহন্য রূপস্বরূপাভ্যামস্মিন্নালম্বনো মতঃ॥

—নায়ক চূড়ামণি ভগবান কৃষ্ণে সকল মহাগুণ নিত্যকাল বিরাজিত। অন্যরূপ ও স্বরূপে তিনি মধুর রতি আলম্বন হন।

প্রাকৃত রসবেত্তাগণ বহুপ্রকার নায়কের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে নায়িকা বহু হ'লেও নায়ক এক—অনন্তগুণের আকর রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তাঁর সবগুণের প্রকাশ একসঙ্গে হয় না। আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন লীলায় বহিঃপ্রকাশ। এক কৃষ্ণই বহুভাবে প্রকাশিত। যেমন, তিনি কখনো পতি, কখনো উপপতি। সুতরাং গুণ ও ক্রিয়ার পার্থক্যের জন্য নায়কেরও ভেদ দেখানো হয়েছে। নিখিল-নায়ক-চূড়ামণি, নিত্যগুণশালী কৃষ্ণের ভক্ত-ভক্তি অনুযায়ী অধিকারিক প্রকাশ তিন প্রকার— পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ—'হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ ইতি ত্রিধা।' গোকুলে তিনি পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণরূপে ব্যক্ত। নায়ক গুণকর্মভেদে চার প্রকার—

স পুনশ্চতুর্বিধঃ স্যাদ্ধীরোদাত্তশ্চ ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্তনামা, তথৈব ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ॥

—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীর প্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত।

ধীরোদাত্ত—

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণ সুদৃঢ় ব্রতঃ।
অকথনো গূঢ়গর্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥

—যে নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, সুদৃঢ়ব্রত, অকত্থন (আত্মশ্লাঘাশূণ্য), গূঢ়গর্ব্ব ও সুসত্ত্বভৃৎ (মহাবলবান্), তাকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলে।

ধীরললিত—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥

—যে নায়ক বিদগ্ধ, নবতরুণ, পরিহাস নিপুণ, নিশ্চিন্ত, প্রেয়সীবশীভূত—তাঁকে ধীরললিত নায়ক বলে।

ধীরোদ্ধত—

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ॥

—যে নায়ক মাৎসর্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, রোষপরায়ণ, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, চঞ্চল, তাকে ধীরোদ্ধত নায়ক বলে।

ধীরশান্ত—

শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥

—যে নায়ক শান্ত প্রকৃতির, ক্লেশ-সহিষ্ণু, বিবেচক, বিনয়াদি-গুণবান্, তাকে ধীরশান্ত নায়ক বলে।

এই চার প্রকার নায়ক প্রত্যেকে আবার পতি ও উপপতি ভেদে দু' প্রকার। যিনি বিধিমত কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তিনি পতি—'উক্তঃ পতিঃ স কন্যায়া যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ'। কৃষ্ণ রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি নায়িকার পতি। আর উপপতি—

রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয় প্রেমসর্বস্বং বুধেরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥

—যিনি পরকীয়া রমণীর রাগে আসক্তিবশতঃ ধর্ম উল্লঙ্ঘন করেন এবং সেই পরকীয়া রমনীর প্রেমকে সর্বস্ব মনে করেন, তাকে উপপতি বলে। উপপতি ভাবেই মধুর রসের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত—'অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ। এই রতি বশতঃ নায়ক-নায়িকা বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়; এতে থাকে প্রচ্ছন্ন-কামুকত্ব; অধিকন্তু এই রতি পরস্পরের পক্ষে দুর্লভও

বটে। সেজন্যই একে পরম রতি বলা হয়। প্রাকৃত রসে উপপতি নিষিদ্ধ। কিন্তু রসিকশেখর কৃষ্ণের পক্ষে নয়। কারণ রস-আস্বাদনের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। পরকীয়া ব্রজ-গোপীগণ তাঁর প্রতি অনুরাগের আধিক্য বশতঃই তাকে পতিভাবে ভজনা করেন। তিনি নরাকারে আবির্ভূত হলেও নর নহেন স্বয়ং ভগবান।—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণে রস নির্যাস—স্বাদার্থমবতারিণি॥

প্রতি ও উপপতি প্রত্যেকে আবার চার প্রকার--অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট।

অনুকূল নায়ক একমাত্র নায়িকার প্রতিই কেবল আসক্ত—অন্য নারীর কথা তার মনেও আসে না। যেমন—সীতার প্রতি রাম অনুরক্ত ছিলেন। রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুকূলতা সুপ্রসিদ্ধ। রাধার সঙ্গে থাকাকালীন কৃষ্ণের অন্য নারীর প্রসঙ্গও মনে আসত না। ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত নায়কের প্রত্যেকেই অনুকূল নায়ক হতে পারেন।

দক্ষিণ নায়ক তিনিই, যিনি অন্য নায়িকাতে আসক্ত হয়েও আগেকার নায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেম ও দাক্ষিণ্য ত্যাগ করেন না, অথবা—যিনি সকল নায়িকার প্রতি সমভাব পোষণ করেন। যিনি নায়িকার সামনে প্রিয় বাক্য বললেও অসাক্ষাতে অপ্রিয় কাজ করেন, তাঁকে শঠ নায়ক বলে। যেমন, রাধার সাক্ষাতে কৃষ্ণ বলেন—'রাই, তুমি সে আমার গতি'; কিন্তু চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশাযাপন করেও তা রাধার কাছে অস্বীকার করেন। আর অন্য নারীর ভোগ চিহ্ন অঙ্গে ব্যক্ত থাকা সত্ত্বেও যিনি নির্ভয় ও মিথ্যা বচনে দক্ষ, তাঁকে ধৃষ্ট নায়ক বলে।

নায়ক সংখ্যা : তিন প্রকার—পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ। প্রত্যেকটি আবার চার প্রকার—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত। প্রত্যেকে আবার দু' প্রকার—প্রতি ও উপপতি।

তাদের প্রত্যেকে আবার চার প্রকার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্ট। তাহলে সর্বমোট = ৯৬ প্রকার।

(১ × ৩ × ৪ × ২ × ৪ = ৯৬)

নায়ক-সহায় ভেদ

নায়ক ও নায়িকার মিলন ঘটানোর জন্য সহায়ের দরকার। নায়কের সহায়কে বিবিধগুণে ভূষিত হতে হবে। সহায়ের গুণ—

নর্ম্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা।
দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্টগোপী প্রসাদনম্।
নিগূঢ়মন্ত্রতেত্যাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণাঃ স্মৃতাঃ॥

—নর্মবাক্য প্রয়োগে নৈপুণ্য, সদা গাঢ় অনুরাগ (কৃষ্ণের প্রতি), দেশকালের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট গোপীর প্রসন্নতা বিধান, নিগূঢ় মন্ত্রণা দান ইত্যাদি নায়ক-সহায়ের গুণ।

নায়ক সহায় পাঁচ প্রকার—চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নর্মসখা।

চেট—"সন্ধানচতুরশ্চেটো গূঢ়কর্মা প্রগল্ভধীঃ।"

—সন্ধানে চতুর, গূঢ়কর্মদক্ষ অথচ প্রগল্ভ বুদ্ধিমান সহায়কে চেট বলে। ব্রজে ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার প্রভৃতি নায়ক সহায় ছিলেন।

বিট—বেশোপচার কুশলো ধূর্তো গোষ্ঠী বিশারদঃ।
কামতন্ত্রকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে॥

—বেশ রচনায় ও উপচার প্রয়োগে কুশল, ধূর্ত, গোষ্ঠী বিশারদ (অর্থাৎ সকলের মনের খবর রাখেন), কামতন্ত্রকলাদেবী (কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ) সহায়কে বিট বলে। কড়ার. ভারতীবন্ধ—প্রভৃতি ব্রজে বিট ছিলেন।

বিদূষক—বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গ-বচোবেশৈর্হাস্যকারী-বিদূষকঃ॥

—ভোজনে লোলুপ, কলহপ্রিয়, অঙ্গ (দেহ), বাক্য ও বেশের বিকার সাধনের দ্বারা যিনি হাসির উদ্রেক করেন তাকে বিদূষক বলে। এদের নাম সাধারণত হয়—বসন্ত, কোকিল ইত্যাদি। 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকে মধুমঙ্গল বিখ্যাত বিদূষক।

পীঠমর্দ—গুণৈর্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্ণা তত্রানুবৃত্তিমান্।
পীঠমর্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামাস্যাদ্ যথা হরেঃ॥

—নায়কতুল্য গুণের অধিকারী হয়েও যিনি প্রেমবশতঃ নায়কের অনুবৃত্তি (আনুগত্য) করেন, তাঁকে পীঠমর্দ বলে। শ্রীদাম এ জাতীয় সহায়।

প্রিয়নর্মসখা—আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাব সমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোহসৌ প্রিয়নর্মসখোবরঃ ॥

—আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ (যিনি অতি গূঢ় রহস্য জানেন), সখীভাব-সমাশ্রিত (নায়ক ও নায়িকার মিলন ঘটানোর ইচ্ছার ভাবে নিবিষ্ট) এবং সব প্রণয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এমন সহায়কে প্রিয়নর্মসখা বলা হয়। গোকুলে সুবল, অর্জুন প্রভৃতি প্রিয়নর্মসখা।

এই পাঁচ প্রকার সহায়ের মধ্যে চেট হচ্ছেন কৃষ্ণের কিঙ্কর এবং অন্য চারজন কৃষ্ণ সখা—'চতুর্বিধাঃ সখায়োহত্র চেটঃ কিঙ্কর ঈর্যতে'।

কৃষ্ণের সহায় স্বরূপ দূতীগণও আছেন। এরূপ দূতী দুই প্রকার—স্বয়ং দূতী ও আপ্ত দূতী। কটাক্ষ ও বংশীভেদে স্বয়ং দূতী দুই প্রকার।

অতি ঔৎসুক্যের জন্য স্খলিত লজ্জা, অনুরাগে মোহিতা এবং স্বয়ং অভিযোক্তাকে স্বয়ং দূতী বলে। কৃষ্ণের স্বয়ং দূতী তাঁর কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি। আর যিনি প্রাণ গেলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না, স্নিগ্ধা (স্নেহশীলা) ও বাক্য নিপুণা তাঁকে আপ্তদূতী বলে। বীরা, বৃন্দা প্রভৃতি আপ্ত দূতী।

নায়িকা প্রকরণ

॥ ১ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া বা নায়িকা দু'প্রকার—স্বকীয়া ও পরকীয়া। মধুর রসে তাঁরাই আলম্বন বিভাব। স্বকীয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে—

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশ তৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥ (উ. নী.)

—যাঁরা পাণিগ্রহণবিধি অনুসারে প্রাপ্তা, পতির আদেশ পালনে তৎপরা এবং পাতিব্রত্যধর্মপালনে অবিচলা, তাঁদের স্বকীয়া নায়িকা বলে।

দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশত আটজন মহিষী আছেন। এঁরা সবলে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা। এঁদের প্রত্যেকের আবার অসংখ্য সখী ও দাসী বর্তমান। সখীদের রূপগুণ মহিষীদের তুল্য, দাসীদের অপেক্ষাকৃত ন্যূন। এই মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী—এই আটজন শ্রেষ্ঠা। এঁদের মধ্যে আবার দু'জন শ্রেষ্ঠা—রুক্মিণী (ঐশ্বর্যে) ও সত্যভামা (সৌভাগ্যে)। এছাড়া কৃষ্ণ কোন কোন গোপকন্যার পতি—কারণ এই সব গোপকন্যা কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করে কৃষ্ণকে পতিভাবে দেখেছিলেন; কৃষ্ণও গান্ধর্বরীতিতে তাঁদের পতিত্ব স্বীকার করেছেন। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের নিত্যকান্তা—অনাদিকাল থেকেই। কৃষ্ণ যখন প্রকট হন, তখন তাঁদেরও প্রকট করান এবং লৌকিক রীতিতে তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

পরকীয়া—রাগেনৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্মেনাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥ (উ. নী.)

—ইহকাল ও পরকালের অপেক্ষা রাখে না, এমন রাগ বশতঃ যাঁরা কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, এবং কৃষ্ণ-ও বহিরঙ্গ ধর্মের বন্ধনের অপেক্ষা না রেখেই যাদের স্বীকার করেন, তাঁদের পরকীয়া নায়িকা বলে।

পরকীয়া নায়িকা কোনরূপ লোকবন্ধন, কুল-শীল-লজ্জার অপেক্ষা না করে পরমপুরুষের চরণে জীবনযৌবন—সব সমর্পণ করেন। বিবাহ বন্ধন নয়, আত্যন্তিক আসক্তিই সেখানে মূল কথা। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিবশেই পরকীয়া নায়িকা বেদধর্ম-দেহধর্ম-লোকধর্ম সব বিসর্জন দেন।

কন্যকা ও পরোঢ়া ভেদে পরকীয়া নায়িকা দুই প্রকার—'কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ।' অনূঢ়া নারীকে কন্যকা বলে। তারা সলজ্জা, পিতৃপালিতা, সখীকেলিতে বিস্রব্ধা। সুতরাং পরপুরুষ কৃষ্ণের জন্য তাঁদের অনেক বাধাবিঘ্নের দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হয়। অনুরাগজনিত তন্ময়তার বশেই তাঁরা কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। এদের মধ্যে গোপকন্যার ঐকান্তিকতার আধিক্য বশতঃ কৃষ্ণ তাঁদের প্রতি অধিকতর আসক্ত ছিলেন।

পরোঢ়া—গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোহ প্রসন্থতিকাঃ॥ (উ. নী.)

বিবাহিতা, অথচ অপুত্রবতী (অপ্রসন্থতিকা) যে সকল ব্রজনারী কৃষ্ণের সঙ্গে সম্ভোগের জন্য লালায়িতা, তাদের পরোঢ়া নায়িকা বলে। এই সকল কৃষ্ণ প্রিয়া সর্বাতিশায়িনী এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি অপেক্ষা প্রেমসৌন্দর্য-ভূষিতা।

পরোঢ়া কৃষ্ণপ্রিয়া আবার তিন প্রকার—সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া —'তাস্ত্রিধা সাধনপরা দেব্যো নিত্যপ্রিয়াস্তথা।' সাধনপরা পরোঢ়া একক বা যৌথভাবে সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবাংশে জন্ম নিলে তাঁর তুষ্টি বিধানের জন্য নিত্যকান্তাগণও দেবীরূপে প্রকট হন। এঁরা ব্রজে গোপকন্যারূপে অংশিনী নিত্যপ্রিয়াগণের প্রিয় সখী হয়েছেন। কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া হলেন—রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা ও পালিকা। এছাড়া লোকপ্রসিদ্ধা নিত্য প্রিয়াদের মধ্যে আছেন—খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা ইত্যাদি অনেকে। এই সকল নিত্যপ্রিয়াদের শত শত যূথ আছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রাকৃত ক্ষেত্রে পরোঢ়া নায়িকা নিষিদ্ধ। কিন্তু অপ্রাকৃত নায়িকা সম্বন্ধে এই নিষেধ প্রযোজ্য নয়—

নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে।
তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকাদ্যনুসারতঃ॥ (উ. নী.)

॥ ২ ॥

শ্রীরাধা

রাধা ও চন্দ্রাবলী অষ্ট প্রধান কৃষ্ণপ্রিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দু'জনের মধ্যে আবার রাধা সর্বশ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাবস্বরূপা ও গুণে বরীয়সী।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

—শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে :

'কৃষ্ণময়'—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥

শ্রীরাধা সর্বসৌন্দর্যকান্তি। 'কান্তি' শব্দের অর্থ কৃষ্ণের ইচ্ছা। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতে বর্তমান। রাধিকা কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূরণ করেন। কৃষ্ণ জগতমোহন—রাধা তাঁর মোহিনী। অতএব রাধা সমস্তের 'পরা' ঠাকুরাণী। মাধুর্যের ভগবত্তাসার শ্রীকৃষ্ণ আপনার হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা রাধাকে সৃজন করেন। আবার গোপীগণের মধ্যে তিনিই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বল্লভা —'সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা'। রাধা ও কৃষ্ণের মূলতঃ কোন ভেদ নেই। মৃগমদ ও তাঁর গন্ধ, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন অবিচ্ছেদ্য, রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে তেমন অবিচ্ছেদ্যতা বর্তমান—লীলারস আস্বাদনের প্রয়োজনে তাঁরা দুই রূপ ধারণ করেন মাত্র। কবিরাজ গোস্বামী বলেন :

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

কৃষ্ণের তিনটি প্রধান শক্তি—চিৎশক্তি বা স্বরূপ শক্তি, জীব শক্তি ও মায়া

শক্তি। স্বরূপশক্তিতে কৃষ্ণ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। স্বরূপশক্তির তিনটি অংশ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। 'আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ তারে জ্ঞান বলি মানি।' শ্রীরাধা এই হ্লাদিনীশক্তির সারভূত অংশ। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন:

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা, নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥

অথবা, হ্লাদিনীর সার অংশ আর প্রেমনাম।
আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

শ্রীরাধিকার অসংখ্য গুণাবলী বর্তমান। তিনি মধুরা, নববয়া, অপাঙ্গদৃষ্টি চঞ্চলা, উজ্জলস্মিতা. চারু সৌভাগ্যরেখাঢ্যা, গন্ধোন্মাদিত মাধবা, সংগীত প্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্, নর্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণার্দ্রা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্যাদা, ধৈর্য ও গাম্ভীর্যশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাব স্বরূপিণী, গোকুলের সকলের প্রিয়, যশস্বিনী, গুরুজনের স্নেহ ধন্যা, কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সন্তবাশ্রবকেশবা (কেশব যাঁর বাক্যের বশ)।—তিনি সর্বগুণের আকর কৃষ্ণের কান্তাশিরোমণি।

॥ ৩ ॥

সর্বশ্রেষ্ঠ যুথেশ্বরী শ্রীরাধার সর্বোত্তম যুথ মধ্যে যে সকল ব্রজসুন্দরী আছেন, তাঁরা সর্বসদ্‌গুণমণ্ডিতা এবং বিভ্রম বিশেষ দ্বারা সর্বদা মাধবকে আকর্ষণকারিণী। রাধার সহায়রূপা এই সখীগণ পাঁচ প্রকার—

সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠ-সখ্যশ্চ বিশ্রুতা॥

—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠ সখী।

সখী—কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি।

নিত্যসখী—কস্তুরিকা, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি।

প্রাণসখী—শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা ইত্যাদি। এরা প্রায়ই রাধার স্বরূপ লাভ করেন।

প্রিয়সখী—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা ইত্যাদি।

পরম প্রেষ্ঠসখী—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই আটজন প্রধানা সখী। এদের মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণ—দুজনেরই প্রতি প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত। সেজন্য কখনো কৃষ্ণ, কখনো রাধার প্রতি তাদের প্রেমের আধিক্য প্রকাশ পায়।—

আসাং সুষ্ঠু দ্বয়োরেব প্রেম্ণঃ পরমকাষ্ঠয়া।
কচিজ্জাতু কচিজ্জাতু তদাধিক্যমিবেক্ষতে॥

॥ ৪ ॥

কৃষ্ণবল্লভাদেরই নায়িকা বলা হয়। নায়িকা দু'প্রকার—স্বকীয়া ও পরকীয়া। এদের আবার প্রত্যেকের তিন প্রকার ভেদ বর্তমান—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগলভা।

স্বকীয়াশ্চ পরোঢ়াশ্চ যা দ্বিধা পরিকীর্তিতাঃ।
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভেতি প্রত্যেকং তাস্ত্রিধা মতাঃ॥

মুগ্ধা নায়িকা নববয়া, নবকামা, রতিবিষয়ে বাম্য (অনিচ্ছুক), চারু ও গূঢ় প্রযত্নবাক্, প্রিয়তমের অপরাধে সাশ্রুলোচন, প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্যে অনভ্যাস এবং মানে বিমুখী।

মধ্যা— সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।
কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভ বচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।
মধ্যাস্যাৎ কোমলা কাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা॥

—লজ্জা ও মদন সমান, প্রকাশমান তারুণ্যে শ্লাঘ্যা, বাক্য ঈষৎ প্রগল্‌ভ, রতিবিষয়ে মোহ (মূর্ছা) পর্যন্ত সমর্থ, মানে কখনো কোমল, কখনো কর্কশ। —'বিচিত্র সুরতা আর মত্ত যৌবনা। ঈষৎ প্রগলভা আর লজ্জায়ে মধ্যমা।' (রসকল্পবল্লী)।

মধ্যা নায়িকা আবার তিন প্রকার—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়তমের প্রতি উপহাসমূলক বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাকে ধীরা নায়িকা বলে।—'ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্।'—

ধীরমধ্যা নায়িকা যদি মান করে।
অন্তরে করয়ে কোপ না হয় বাহিরে॥

স্বচ্ছন্দে নায়ক সঙ্গে করে ব্যবহার।
তথাপি অন্তরে বক্র আছয়ে তাহার ॥…(বল্লী)

যে নায়িকা ক্রোধের সঙ্গে কঠোর বাক্যে প্রিয়তমকে নিরসন করেন, তাকে অধীর মধ্যা নায়িকা বলে।—'অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈ নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা।'

অধীরা মধ্যা নায়িকা ক্রোধে রক্তলোচন।
হার ছিণ্ডে ভূমিতে পড়ে করয়ে রোদন॥
পাদাক্রান্ত হৈলে কান্ত তবু তুষ্ট নয়।
স্বামী সম্মুখ হৈলে সে বিমুখ যে হয়॥ (বল্লী)

আর যে নায়িকা সাশ্রু নয়নে প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁকে ধীরাধীরা নায়িকা বলে।—'ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম।' (উ. নী.)।

ধীরাধীরা মধ্যা তবে নানাবিধ হয়।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা সৌল্লুঠ বাণী কয়॥
কভু কান্তের রূপ রুষি বীভৎস দেখিঞা।
সহচরি সঙ্গে হাসে কৌতুক করিঞা॥
কভু নিষ্ঠুর হইঞা করএ স্তবন।
কভু অন্তরের মান করে সম্বরণ॥

মধ্যা নায়িকায় মুগ্ধা ও প্রগলভার সংমিশ্রণ থাকায় মধ্যাতেই সকল রসোৎকর্ষ বিদ্যমান—

সর্ব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে।
যদস্যাং বর্ত্ততে ব্যক্ত মৌগ্ধপ্রাগলভ্যয়োর্যুতিঃ॥

এরপর প্রগলভা নায়িকা প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেছেন:

প্রগলভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্ত কর্কশা॥

—যে নায়িকার পূর্ণযৌবন, যিনি মদান্ধা, সুরত ব্যাপারে অতি উৎসুকা, প্রচুর ভাবপ্রকাশে পটু, প্রেম রসে প্রিয়কে আক্রমণে সমর্থা, যার বাক্য ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢ় (উদ্ভট) এবং মানে অত্যন্ত কর্কশ, তাকে প্রগলভা নায়িকা বলে।

প্রগল্‌ভা নায়িকাও তিন প্রকার—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। মান বিষয়ে এই প্রভেদ।—

মানবৃত্তেঃ প্রগল্‌ভাপি ত্রিধা ধীরাদিভেদতঃ।

ধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা আবার দু'প্রকার—'উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিথ্‌থা চ সাদরা॥'—একপ্রকার নায়িকা মানে সুরত বিষয়ে উদাসীনা হন, অন্য প্রকার মানে অবহিথ্‌থা পূর্বক (মনোভাব গোপন করে) বল্লভের প্রতি প্রেম প্রকাশ করেন। যে নায়িকা ক্রোধে অধীর হয়ে প্রিয়কে তাড়না করেন, তাঁকে অধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে—সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্‌।"

অধীর প্রগল্‌ভা তবে করয়ে ভৎর্সন।
কটূত্তর কহে আর ঘৃণার বচন॥
গর্বিত ভৎর্সন করে নানা বাক্য দ্বারে।
বিদগ্ধ নায়কের সুখ উপজে অন্তরে॥

যে প্রগল্‌ভা নায়িকা কখনো ধীরা, কখনো অধীরা, তাকে ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে।—'ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে।'

ধীরাধীর প্রগল্‌ভার কথা বুঝা নাহি যায়।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু ব্যথা পায়॥
কভু বা কান্তের দুখে হয়েত সম্মতি।
কভু এক আধো কথা কহেত ছলোক্তি॥

মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকা আবার দু'প্রকার—জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা। নায়িকার প্রতি নায়কের প্রণয়ের আধিক্য ও ন্যূনতাভেদবশতঃই এই শ্রেণী বিভাগ হয় থাকে।—

মধ্যা তথ্যা প্রগল্‌ভা চ দ্বিধা সা পরিভিদ্যতে!
জ্যেষ্ঠা চাপি কনিষ্ঠা চ নায়কপ্রণয়ং প্রতি॥

যে নায়িকার প্রতি নায়কের প্রণয়ের আধিক্য দেখা যায়, তাঁকে জ্যেষ্ঠা এবং যাঁর প্রতি নায়কের প্রণয়ের ন্যূনতা দেখা যায়, তাঁকে কনিষ্ঠা নায়িকা বলা হয়। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা—এটা নায়িকার আপেক্ষিক ভেদ মাত্র। কারণ সময় বিশেষে জ্যেষ্ঠা নায়িকাও কনিষ্ঠায় পরিণত হতে পারেন। এজন্য নায়িকাভেদ প্রকরণে এদের গণনা করা হয়নি। কিন্তু স্বীয়া ও পরোঢ়া নায়িকা ধীরাদি ভেদে সাত প্রকার। স্বীয়া ও পরোঢ়া অবস্থাভেদে—মুগ্ধা, ধীরমধ্যা, অধীর-

মধ্যা, ধীরাধীরামধ্যা, ধীর প্রগল্‌ভা, অধীর প্রগল্‌ভা, ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা—এই সাত প্রকার বলে গণ্য হন। তাহলে এ পর্যন্ত নায়িকা সংখ্যা দাঁড়ালো : কন্যা + ৭ প্রকার স্বীয়া + ৭ প্রকার পরোঢ়া = ১৫ প্রকার।

॥ ৫ ॥

অষ্টনায়িকা

উপরে কথিত পনেরো প্রকার নায়িকার প্রত্যেকের আবার আট প্রকার ভেদ হতে পারে। তা হোল—

অথাবস্থাষ্টকং সর্বনায়িকানাঃ নিগদ্যতে।
তত্রাভিসারিকা বাসসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা ॥
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাপি চ।
প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্তৃকা ॥ (উ. নী.)

—অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা।

পীতাম্বর দাসের "রসমঞ্জরী" গ্রন্থেও এই আট প্রকার নায়িকার কথা বলা হয়েছে।—

অভিসারিকা বাসকসজ্জা উৎকণ্ঠিতা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা আর কলহান্তরিতা ॥
স্বাধীনভর্তৃকা আর প্রোষিতভর্তৃকা।
এই অষ্টনায়িকা রসতন্ত্রেতে উক্তিকা ॥

এঁদের মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা, বাসকসজ্জিকা ও অভিসারিকা নায়িকা উৎফুল্লমনা ও অলঙ্কার মণ্ডিতা ; অন্যান্য নায়িকাগণ বিষণ্ণ, খেদান্বিতা ও অলঙ্কারবর্জিতা হন।

(ক) অভিসারিকা

যা পর্য্যুৎসুকচিত্তাতিমদনেন মদেন চ।
আত্মনাভিসরেৎ কান্তং সা মতা হ্যভিসারিকা ॥

নায়কের সঙ্গে মিলনের জন্য নায়িকা কিংবা নায়িকার সঙ্গে মিলনের জন্য নায়কের সংকেত স্থানে গমনকে অভিসার বলে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে অভিসারিকার সংজ্ঞা :

যাভিসরয়তে কান্তং স্বয়ং ব্যভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা ॥

লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনের নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক-সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥

—যিনি কান্তকে অভিসার করান, বা স্বয়ং অভিসার করেন—তাঁকে অভিসারিকা বলে। অভিসারিকার অভিসারে গমনযোগ্য বেশ দু'প্রকার—জ্যোৎস্নী ও তামসী। সেই নায়িকা নিজের লজ্জায় নিজেই লীন হয়ে, সমস্ত অলঙ্কারাদি শব্দহীন করে এবং অবগুণ্ঠনবতী হয়ে একজন মাত্র স্নেহশীলা সখী সমেত প্রিয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। 'রসকল্পবল্লী'তে আছে :

অভিসারিকা হয় অনেক ধরণ।
নায়কের সঙ্গে হয় নায়িকার মিলন ॥
কৃষ্ণ অভিসার করে নায়িকার ঠাঁঞি।
কৃষ্ণ লাগি অভিসার করে কভু রাই ॥…
যে সময় যেমন বেশ যোগ্য করিয়া।
সঙ্কেত স্থানে যায় সখী সঙ্গে লঞা ॥

সুতরাং 'নায়কের গমন কিবা নায়িকার গমন'—অভিসারের লক্ষণ। তবে নায়িকার অভিসারই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে; কারণ গৃহ-পরিজন, কুলশীল, লজ্জা সব অতিক্রম করে যে নারী প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে দূর-দুর্গম পথে সঙ্কেত স্থানে যাত্রা করেন, তাঁর আত্যন্তিক অনুরাগের গাঢ়ত্ব ও গূঢ়ত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। তাই অমরকোষের সংজ্ঞা: 'কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা ॥'

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাকৃত নায়িকার অভিসারের উল্লেখ আছে। কিন্তু তা লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করেনি। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসারের ব্যঞ্জনা আরো গভীর। এই অভিসার লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করে অলৌকিক ভগবৎ প্রেমের অপরূপ মাধুর্যকে প্রকাশ করে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের গাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় এর দ্বারা। সে বস্তু দুঃখ লব্ধ, তা প্রাপ্তির আনন্দও অপরিসীম। অভিসারের পথও তাই দূর-দুর্গম। অন্ধকার রজনীতে দূর-দুর্গম পথে আনন্দের কাঁটা মাড়িয়ে বিরহিনী এগিয়ে চলে সেই পরম বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে—যে আছে প্রতীক্ষার বাঁশী নিয়ে—

সে যে বাজায় বাঁশী। প্রতীক্ষার বাঁশী,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।

বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা—
পদে পদে মিলেছে একতান।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

—পরম বাঞ্ছিতের অশ্রুত আহ্বান যখন কর্ণে প্রবেশ করে, তখন সমাজ সংসার সব মিছে হয়ে যায়; সব লজ্জা-ভয় জলাঞ্জলি দিয়ে, পথের পর্বতপ্রমাণ বাঁধাকে উপেক্ষা করে ভক্ত ছুটে চলে সেই পরম পুরুষের দিকে। এই-ই তো অভিসার। "পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধার অভিসারই সমগ্র লীলাতত্ত্বের মেরুদণ্ড।…ইহাই প্রেমাবেগের চূড়ান্ত।" প্রেমের প্রলয়ঙ্করী উন্মাদনায় শ্রীরাধা আর কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে করেন না। তাঁর দেহাত্মবোধ বিলুপ্ত হয়েছে. একথা ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বোধ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে, তা—কৃষ্ণপ্রেম। দুর্গম পথে অভিসারে প্রস্তুত শ্রীমতীকে তাঁর সখীরা স্মরণ করিয়ে দেন—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নীচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥

—কিন্তু সখীদের এ আশঙ্কা অহেতুক। কুলমর্যাদারূপ কপাট যিনি উদ্ঘাটন করেছেন, সামান্য কাঠের কপাট তাঁকে কতটুকু বাধা দিতে পারবে? নিজ মর্যাদারূপ সিন্ধু যিনি পার হয়েছেন, নদীর বাধাতো তাঁর কাছে সামান্য। নিজের তুচ্ছ দেহের ভাবনাও রাধার নেই। কারণ জীবন তো তাঁর কৃষ্ণপদে সমর্পিত—

'যছু পদতলে জীবন সোপলু'।

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে দু' প্রকার অভিসারিকার কথা বলা হয়—জ্যোৎস্নী ও তামসী। কিন্তু পীতাম্বর দাসের 'রস মঞ্জরী'তে আট প্রকার অভিসারের বর্ণনা করা হয়েছে:

সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট পরকার।
জ্যোৎস্না তামসী বর্ষা দিবা অভিসার॥

কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্তা সঞ্চরা।
গীত পদ্য রসশাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞনোৎকরা ॥

জ্যোৎস্নী : মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ ॥

—মল্লিকা, আভরণ ও চন্দন-চর্চিত শ্রীরাধা 'ধবলিম' বস্ত্র পরিধান করে জ্যোৎস্না অভিসার করেন।

তামসী : কালাগুরু বিচিত্রাঙ্গী নীলরাগাম্বুদাম্বরা।
চন্দ্রোদয়ে পরিত্রস্তা কৃষ্ণপক্ষাভিসারিকা ॥

—কালো অগুরু মাখা বিচিত্র অঙ্গে নীল নিচোল পরিহিতা রাধা চন্দ্রালোক পরিহার করে কৃষ্ণ পক্ষে অভিসার করেন।

দিবা অভিসার : মধ্যাহ্ন সময় যখন প্রচণ্ড দিনমণি।
ঝাঁ ঝাঁ বাত বহে উতপ্ত আগুনি ॥
পুরজন সবঁহু রহে কপাট লাগাই।
দিবসে অভিসার করল অবসর পাই ॥

বর্ষা : মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার ॥
ঝলকত যামিনী দশদিশ আপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি ॥

কুজ্ঝটিকা : আজু ভেল ভাল কুজ্ঝটি আন্ধিয়ার।
অযতনে ধনিক ভেলি অভিসার ॥

তীর্থযাত্রা : আজু তিনি যোগ পাওল পুণ্যবান।
সবহু চলল তিথি কালিন্দি সিনান ॥
বিদগ্ধ নাগর রসিক মুরারি।
নিরভয়ে তোয়ে মিলল বরনারী ॥

উন্মত্তা : কামোন্মাদ ব্যাকুলাত্মা দূতিপন্থং বিচিন্তয়েৎ।
তৎপশ্চাদ্রমণোদ্দেশে উন্মত্তা সাভিসারিকা ॥

সঞ্চরা : অনঙ্গবাণে মহাপীড়া অশঙ্কিত মন।
নিজ গৃহে স্থির নহে মন উচাটন ॥

নিজ অঙ্গের বেশ করিতে না পারে।
ভুজে নেপুর লই কঙ্কণ পদ ধরে ॥
অঞ্জন কপালে দেই সিন্দুর অধরে।
উন্মত্তা হয়ে সেই মুরলীর স্বরে ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসার কবি-কল্পনাকে সবধিক জাগরূক করেছে। বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন পরিবেশে অভিসারের নানা বৈচিত্র্যময় সংঘটন। তবে বর্ষাভিসারই কবিচিত্তকে সমধিক উদ্দীপিত করেছে। অভিসারের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের বর্ষাভিসার-পদাবলী শব্দ ও অলংকার চয়ন কৌশলে অপরূপ সুষমা মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাঁর 'কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল'—অভিসার প্রস্তুতি বিষয়ক পদটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর বিষয়বস্তু তিনি নিয়েছেন 'কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়'-এর নিম্ন পদ থেকে—

মার্গে পঙ্কিনী তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দ সঞ্চারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বামতিম্।
আজানূদ্ধৃত নূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছাল্লব্ধ পদস্থিতিঃ স্ব-ভবনে পন্থানমভ্যসতি ॥

প্রতিভার গুণে অনুবাদও মূলরূপে প্রতিভাত হয়। গোবিন্দদাসের পদেও একই বক্তব্য, একই কবি কল্পনার অতিশায়িতা। দয়িতের উদ্দেশ্যে অভিসারের জন্য শ্রীমতী নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। কণ্টক ও সর্প-সঙ্কুল, পিচ্ছিল পথে, ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা—গুরুজন বচন কানে না নিয়ে আপন গৃহেই চলে সে সাধনা। তারপর একদিন সঙ্গীগণকে ছেড়ে একা পথে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীমতী। 'অনুরাগ রীত' বুঝি এরূপই। শ্রীমতী চলেছেন—আকাশে মেঘের ঘন ঘটা, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের শিহরণ, প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষ, আর 'পবন খরতর বলগই'। মনে মনে উৎকণ্ঠা—'হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল।' দ্বিগুণ উৎসাহে শ্রীমতী পথ চলছেন—'তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ জীবন মঝু আগুসার'। তারপর পরম বাঞ্ছিতের সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গেল তখন—

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল ॥

পরম বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনে পথের কষ্ট সব দূর হয়ে যায়; পরম আনন্দে, পরম তৃপ্তিতে দেহ-মন পরিপ্লুত হয়ে ওঠে। এখানেই অভিসারের সার্থকতা।

(খ) বাসকসজ্জিকা

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥ (উ. নী.)

নায়ক আসিবে বলি মনেতে উল্লাস।
তাম্বূল পুষ্পের মালা সজ্জার বিলাস॥
নানাভূষা করি রহে সখীর সহিতে।
বাসকসজ্জায় রহে উৎকণ্ঠিত চিতে॥

'স্বীয় অবসর ক্রমে প্রিয় আসবেন'—এই মনে করে যে নায়িকা নিজ দেহ ও গৃহ সুসজ্জিত করে রাখেন তাকে বাসকসজ্জিকা বলা হয়। বাসকসজ্জিকা নায়িকা আট প্রকার—মোহিনী, জাগ্রতী, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, সুপ্তিকা, প্রগল্‌ভা, বিনীতা।

মোহিনী : সজ্জা করি মোহিনী রহে সখীর সহিতে।
কৃষ্ণকে করিব মোহ অনুমান করে চিতে॥

জাগর্তিকা : নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ।
উঠে বসে দ্বারে যাই করে নিরীক্ষণ॥

রোদিতা : বিলাপ করিয়া ধনি করয়ে রোদন।
অন্তরে হর্ষ হইলা নায়কের মিলন॥

মধ্যোক্তিকা : নিকুঞ্জকানন ধনি করে পরিষ্কার।
নিজগুণ গরিমা কিছু করএ বিস্তার॥
নায়ক আইলে যেমতে করিব মিলন।
মনে কত আশা করে কেলি স্মরণ।

প্রগল্‌ভা : প্রগল্‌ভা একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিয়া
নায়ক আসিব বলি উল্লসিত হিয়া॥

সুপ্তিকা : কুন্দ কুসুম বেশ বনাই
কুসুম শয়নে উল্লাস।
কুসুমিত কুঞ্জে বেশ বনাওত
সখী সঙ্গে হাস পরিহাস॥

সুরসা : নিজ মন্দিরে রহে নির্ভয় হইয়া।
বস্ত্র আভরণ পরে সেজ বিছাইয়া।
দূতি পাঠাইয়া জানে নায়ক সংবাদ।
বিলম্ব দেখিয়া কিছু করে অনুবাদ ॥

উদ্দেশা : নায়কের উদ্দেশে নিজ সখীরে পাঠায়।
নানা উপচার করি মঙ্গল গায়।

বাসকসজ্জিকা নায়িকার দৃষ্টান্ত :

সাজল কুসুম শেজ **পুন** সাজই
জারই জারল বাতী।
বাসিত খপুরে, কপূরে পুন বসাই,
ভৈগেল মদন ভরাতি ॥
আজু রাই সাজলি বাসকসেজ।

(গ) উৎকণ্ঠিতা

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥

—নিরপরাধ কান্ত না আসায় উৎসুকা নায়িকাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা নায়িকা বলে। "উৎকণ্ঠিতা কান্ত-পথ করে নিরীক্ষণ। কতক্ষণে হইবে নায়ক-মিলন" ॥ এ অবস্থায় নায়িকার গাত্রকম্প, চিন্তা অশ্রুমোচন ও বিলাপ দৃষ্ট হয়। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা আট প্রকার :—

উন্মত্তা বিকলা স্তব্ধা চকিতা চ অচেতনা।
সুখোৎকণ্ঠা প্রগল্‌ভা চ নির্বন্ধা চেতিলক্ষণা ॥

উন্মত্তা : 'ছট্‌পট্‌ করে কুসুম শয়ানে।......
মনমথ হানল সেল ॥

বিকলা : নায়ক না দেখি ধনি হএত বিকলা।
পথ পানে চাহে ধনি হইয়া চঞ্চলা ॥
কামশরে জর জর করয়ে রোদন।
কতখনে হইবেক নায়ক মিলন ॥

স্তব্ধা : ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে কাতর বয়নী।
নায়কের বিলম্ব দেখি লেখএ ধরণী ॥

চতিকা : খনে বিরহে করে নানা অনুতাপ।
খনে খনে কহি ধনি বচন প্রলাপ ॥
নায়ক বিলম্ব দেখি উনমত ধায়।
দূতী উপেখিয়া নিজ সখীরে পাঠায় ॥

অচেতনা : অচেতন হঞা ভূমি শয্যাতে জাগিয়া।
চিন্তাজ্বরে মূর্চ্ছাতনু রহএ শুতিয়া ॥
জল দেই সহচরী করাএ চেতন।
আইলা নাগর রাজ করহ মিলন ॥

সুখোৎকণ্ঠিতা : পূর্বে মুগ্ধা যেন করয়ে বিলাস।
সেই কথা মনে গুণি করয়ে উল্লাস।

প্রগল্ভা : প্রগল্ভা মূর্চ্ছিতা রাত্রৌ পর্য্যঙ্কে শয়নং ত্যজেৎ।
কান্তাগমনমুৎকণ্ঠা অগ্রে ধাবতি পদ্ধতীম্ ॥

উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চিত্র :

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু, দীপ উজারনু,
মন্দির হইল আলা ॥
সই, পাছে এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান ॥

(ঘ) বিপ্রলব্ধা

কৃতাসঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথামানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥

—সঙ্কেত স্থানে দৈবাৎ প্রিয়তমে না আসায় ব্যথান্তরা নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলা হয়। এই অবস্থায় নায়িকার নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূর্ছা ও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস দেখা দেয়। বিপ্রলব্ধা আট প্রকার—

এই বিপ্রলব্ধা হয় অষ্টমতা।
নির্বন্ধা প্রেমমত্তা ক্লেশা বিনীতা ॥

নিন্দয়া প্রখরা আর দূত্যাদরী।
চর্চ্চিতা অষ্টবিধা করি যারে চলে॥

নির্বন্ধা : দৈব-নির্বন্ধে কান্ত আসিতে না পায়।
সকল রজনী ধনি কান্দিয়া পোহায়॥

প্রেমমত্তা : আপন যৌবন দেখি কান্দিয়া বিকল।
নিশি পরভাত হইল না হৈল সফল।

ক্লেশা : নায়ক না আইল ঘরে জানিয়া নিশ্চয়।
সহচরী সঙ্গে সব দুঃখ কথা কয়॥

বিনীতা : বিরহে বিনয় বাক্য কহয়ে সখীরে।
ঝাঁপ দিব আজি আমি যমুনার তীরে॥

চর্চ্চিতা : কোপনবতী।

বিপ্রলব্ধা নায়িকার চিত্র :

তেজ সখী কানু আগমন আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বূল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যমুনাক পার॥…

(৬) খণ্ডিতা

উল্লঙ্ঘ্যসময়ং যস্যা প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।

—নায়ক সঙ্কেত কুঞ্জে না এসে অন্য নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগের চিহ্নাঙ্কিত হয়ে প্রাতঃকালে যখন নায়িকার সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন নায়িকার খণ্ডিতা অবস্থা। এ অবস্থায় নায়িকার রোষ, নিঃশ্বাস, যৌনভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

সকল রজনী ধনী কান্দিয়া পোহায়।
প্রভাতে নায়ক আসে তাহার সভায়॥
অন্য নারী ভোগ চিহ্ন তার কলেবরে।
খণ্ডিতা সে কোপ করে সেই নায়কেরে॥

খণ্ডিতা নায়িকা আট প্রকার—নিন্দয়া, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগল্‌ভা, মুগ্ধা, মধ্যা, রোদিতা, প্রেমমত্তা।

নিন্দয়া : প্রভাত সময়ে কান্ত আইসে তার ঘর।
অন্য রতি চিহ্ন দেখে তার কলেবর॥
সাক্ষাতে নিন্দা করে নায়ক দেখিয়া।
ধিক্ ধিক্ ভর্চ্ছনা করে লাজ তেয়াগিয়া॥

ক্রোধা : ক্রোধ করি রহে নায়িকা নায়ক সাক্ষাতে।

ভয়ানকা : নায়কের সব অঙ্গ বীভৎস দেখিয়া।
আপন দোষে ভয় পায় লজ্জা লাগিয়া॥

প্রগল্‌ভা : নায়কে দেখিয়া সেই নায়িকা কহএ
স্তুতি নিন্দা আদি যত সোল্লুণ্ঠন কয়ে॥

মধ্যা : নায়কের অঙ্গ দেখি ক্রোধে কিছু ভাসে।
আইলা শঙ্কর দেব পূজার অভিলাষে॥

মুগ্ধা : মুগ্ধা খণ্ডিতা গরিমা না জানে।
ঠমকি ঠমকি হাসে নায়ক বিদ্যমানে॥

রোদিতা : অন্তরে মহাক্রোধ বাহিরে নিবারে।
দুই এক কথা কয় কোপ পরিহারে॥

প্রেমমত্তা : প্রমত্তা নায়িকা কিছু কহয়ে না জানে।
ক্রোধ করি বাক্য কহে নায়ক বিদ্যমানে॥

খণ্ডিতা নায়িকার চিত্র :—

যে দেহে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আইস॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজু পায়্যা ছিল লাগ॥······

(চ) কলহান্তরিতা

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তারিতা হি সা॥

—যে নায়িকা পাদপতিত বল্লভকে সখীগণের সম্মুখে প্রত্যাখ্যান করে

পরে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হ'তে থাকেন, তাঁকে কলহান্তরিকা নায়িকা বলে।

কলহান্তরিতা মানে হইয়া বিমুখ।
কান্ত ব্যগ্রতা করে হইয়া সম্মুখ॥
চরণে ধরিয়া কান্ত পড়ে ভূমিতলে।
কোপ করি নিষ্ঠুর কথা অপমান করে॥
বিমুখ হইয়া কান্ত নিজ ঘরে যায়।
পিছে অনুতাপ করে বিকল হয়্যা তায়॥

এ অবস্থায় নায়িকার প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লান, দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ পায়। কলহান্তরিতা আট প্রকার:—আগ্রহা, বিকলা, ধীরা, অধীরা, কোপনবতী, মন্থরা, সমাদরা, মুগ্ধা। কলহান্তরিতার উদাহরণ:—

হাম কাহে উপখলু তায়।
অব মন ঘন ঘন রোয়॥
মোর দুখ কেহ নাহি জানে।
সো বহুবল্লভ কানে॥
সো বহুবল্লভ সহজাহিঁ ভোর।
কৈছনে জানব বেদন মোর॥
চলইতে চাঁহু আদর ভঙ্গ।
সহইতে না পারি মদন-তরঙ্গ॥
এ সখি কাহে উপেখলুঁ কান।
না জানিএ দগধি চলল মঝু মান॥···(গোবিন্দ দাস)

(ছ) প্রোষিতভর্তৃকা

'দূর দেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা'—যে নায়িকার কান্ত দূর-দেশে আছেন, তাঁকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। এই অবস্থায় নায়িকার ভাব—প্রিয়নাম কীর্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অনাসক্তি, জাড্যতা ও চিন্তাদি।

প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা তিন প্রকার—ভাবী, ভবন্ ও ভূত।

ভাবী:

নায়ক বিদেশ যাবে শুনিয়া সুন্দরী।
সহচরী সঙ্গে নানা বিলাপন করি॥

ভবন্ : কৃষ্ণ গোকুল হইতে মথুরা চলিলা।
অনুতাপ করে গোপী বিদরয়ে হিয়া ॥

ভূত : নানা প্রলাপ করে করিয়া বিসরে।
কি বলিতে কিবা করে বুঝিতে না পারে ॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকার দৃষ্টান্ত :—

হরি গেল মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥
নয়নক নিদ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ হাম দুখ পাশ ॥ (বিদ্যাপতি)

(জ) স্বাধীনভর্ত্তৃকা

"স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা"—নায়ক সর্বদা যে নায়িকার অধীন হয়ে তাঁর কাছে কাছে থাকেন, তাঁকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা বলে। প্রেম বিভ্রমে আকৃষ্ট নায়ক বিচিত্র সুখ স্বপ্নে মগ্ন থাকে, নায়িকার সঙ্গ কখনো পরিত্যাগ করতে চায় না। স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকার চেষ্টা—জলকেলি, বনবিহার, কুসুম চয়ন প্রভৃতি। এই শ্রেণীর নায়িকা আট প্রকার—কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা, উক্তকা, উল্লাসা, অনুকূলা ও অভিষেকা।

'রস মঞ্জরী'তে স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকার লক্ষণ :—

স্বাধীনভর্ত্তৃকা রহে নায়কের পাশে।
নায়ক যে বশ হয় তাহার প্রেমরসে ॥
যখন যে কহে নায়ক তাহাতে অনুকূল।
সকল নায়িকা হৈতে হএ বহুমূল ॥

স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকার দৃষ্টান্ত :—

যুথে যুথে রঙ্গিনী ব্রজকুল রমনী
কামিনী কানন-মাহ।

সবজন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি
ভুজে ধরি রাইক বাহু ॥
সজনি অব হরি কোন বনে গেল।
গুণবতী গুণহিঁ কানু মন বাঁধল
নাগর অনুকূল ভেল ॥··· (গোপালদাস)

উপরে বর্ণিত অষ্টবিধ নায়িকার প্রত্যেকের আবার তিন প্রকার ভেদ বর্তমান—উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা। ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি প্রেমের তারতম্য হেতু এই প্রকার ভেদ। তবে প্রশ্ন ওঠে—গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমে তারতম্য ঘটবে কেন? উত্তর—উত্তমাদি নায়িকাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁর যেমন ভাব, কৃষ্ণেরও তাঁদের প্রতি তেমন ভাব বর্তমান।—

ভাবঃ স্যাদুত্তমাদীনাং যস্যা যাবান্ প্রিয়ে হরৌ।
তস্যাপি তস্যাং তাবান্ স্যাদিতি সর্ব্বত্র যুজ্যতে ॥

পূর্বে পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের আবার অভিসার প্রভৃতি আট প্রকার ভেদ। তাহলে দাঁড়াল ১৫ × ৮ = ১২০। তাদের আবার উত্তমাদি তিন প্রকার ভেদ। তাহলে মোট নায়িকা সংখ্যা ১২০ × ৩ = ৩৬০। তবে শ্রীকৃষ্ণে যেমন নিখিল নায়কের সকল গুণ বর্তমান, শ্রীরাধাতেও সকল নায়িকার প্রায় অবস্থাই বর্তমান।

নায়িকার দূতীভেদ

নায়কের সঙ্গে মিলনের জন্য নায়িকার আশ্রিত-সহায়া নারীকে দূতী বলে। দূতী দু' প্রকার—স্বয়ং দূতী ও আপ্ত দূতী।

স্বয়ং দূতী—অত্যোৎসুক্যক্রটদ্ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা।

স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ং দূতী ততঃ স্মৃতা ॥

—যাঁর লজ্জা টুটে গেছে, যিনি অনুরাগে বিমোহিত এবং স্বয়ং নায়কদের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাঁকে স্বয়ং দূতী বলে। স্বাভিযোগ (নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ) তিন প্রকার—বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ। বাচিক হচ্ছে ব্যঞ্জনাময়। উহা দুই প্রকার—শব্দভব ও অর্থভব। এই দুটির প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ও অগ্রবর্ত্তি দ্রব্য বিষয়ক (পুরঃস্থ)। কৃষ্ণ বিষয়ক ব্যঙ্গ্য আবার দুই প্রকার—সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ। সাক্ষাৎ বিষয়ক ব্যঙ্গ্য —গর্ব, আক্ষেপ, যাচ্ঞা, নর্ম ইত্যাদি ভেদে বহু প্রকার। ব্যপদেশ অর্থে ব্যাজ বা ছল—অন্য বর্ণনা দ্বারা গূঢ় মনোভাব প্রকাশ করা। অন্য কোন বস্তুর বর্ণনা দ্বারা গূঢ় অভীষ্ট প্রকাশ করাকে ব্যপদেশ বলে—'জল্পে ব্যাজেন কেনাপি ব্যপদেশঃত্র কথ্যতে।' কৃষ্ণ শুনলেও যেন শুনছেন না, এমন মনে করে ছল করে সামনের কোন জন্তুকে লক্ষ্য করে যে জল্প বা উক্তি, তাকে পুরস্থ বিষয় বলে।

আঙ্গিক স্বাভিযোগ—অঙ্গুলিসংকেত, সম্ভ্রম ছলে অঙ্গাচ্ছাদন, চরণে ভূমিলিখন, কর্ণ কণ্ডূয়ন, তিলক রচনা, বেশরচনা, ভ্রূ-কম্পন, সখীর প্রতি আলিঙ্গন ও তাড়ন, অধর দংশন, ভূষণ ধ্বনি, তরুতে লতার সংযোগ ইত্যাদি।

চাক্ষুষ—নেত্রের হাস্য, ঘূর্ণন, সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বামচক্ষু দ্বারা দর্শন ও কটাক্ষ প্রভৃতি।

আপ্ত দূতী—ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং য কুর্যাৎ প্রাণাত্যয়েস্বপি।

স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্‌গোপসুভ্রুবাম্‌।

অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা ॥

—যিনি প্রাণ গেলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না, বাক্য প্রয়োগে নিপুণ ও স্নেহশীলা—তাকে আপ্তদূতী বলা হয়। আপ্তদূতী তিন প্রকার—

অমিতার্থা—যিনি যুগলের ইঙ্গিত বুঝে বিবিধ উপায়ে দুজনের মিলন ঘটান।

নিসৃষ্টার্থা—যিনি নায়ক-নায়িকা দুজনের কোন একজনের কাছ থেকে কার্যভার পেয়ে যুক্তি দ্বারা দুজনের মিলন ঘটান।

পত্রহারী—যিনি নায়ক বা নায়িকার বার্তা বহন করেন।

এই সকল আপ্ত দূতীদের মধ্যে ব্রজে শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (তাপসী বেশধারী), পরিচারিকা, ধাত্রী কন্যা, বনদেবী এবং সখী আছেন। এদের মধ্যে সখী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সখী—স্বাত্মনোহপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণান্যোন্যমচ্ছলম্।

বিস্রম্ভিণী বয়োবেশাদিভিস্তুল্যা সখী মতা॥

যারা পরস্পরের প্রতি নিজের অপেক্ষা অধিক প্রেম পোষণ করেন, পরস্পরের বিশ্বাসভাজন এবং বয়স, বেশাদি (অর্থাৎ ভূষণে, রূপে, গুণে, বৈদগ্ধ্যে, সৌন্দর্যে, বিলাসে) পরস্পরের তুল্য, তাদের সখী বলে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় সখীগণের ভূমিকা অপরিহার্য। তারা—"প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিকা সখী। বিশ্বাসরত্নপেটী চ।" ব্রজ সখীগণ রাধার কায়ব্যূহরূপা—কান্তাভাবের বৈচিত্র্য সাধনের জন্য শ্রীরাধাই অনন্ত ব্রজগোপীরূপে প্রকটিতা। রাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পাদনেই তাদের সুখ। তাদের নিজেদের কোনো কামনা নেই।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

অথবা,

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥

সখীদের ক্রিয়া নানা প্রকার যেমন—নায়ক-নায়িকার পরস্পরের মধ্যে আসক্তি করানো, উভয়ের অভিসার করানো, নিজ সখীকে কৃষ্ণে সমর্পণ, নর্ম পরিহাস, আশ্বাস-দান ভূষণ-বিধান, হৃদয়ভাব প্রকাশে পটুতা, দোষের আচ্ছাদন, চামরাদি দ্বারা সেবন, দোষে নায়ক-নায়িকাকে ভর্ৎসনা, পরস্পরের বার্তা প্রেরণ ইত্যাদি।

মঞ্জরীদের সঙ্গে সখীদের পার্থক্য আছে। মঞ্জরী প্রধানা সখীদের অনুবর্তিনী হয়ে রাধাকৃষ্ণের সেবায় অংশ নেন। কিন্তু সখীদের মত কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত তাঁরা প্রয়োজনে দেহদান করেন না, সে অধিকারও তাঁদের নেই। রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার অধিকার লাভ করেই তাঁরা কৃতার্থ বোধ করেন। সেবায় আনন্দ লাভই তাঁদের একান্ত কাম্য—

হরি, হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ মুখ নিরখিব দুহুঁ অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।……

মধুর বা শৃঙ্গার রস ভেদ

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সংযোগে স্থায়ী-ভাব রসে পরিণত হয়। মধুর ভক্তি রসের আলম্বন বিভাব—কৃষ্ণ ও কান্তাগণ ; অনুভাব—নৃত্য, গীত, অশ্রু, কম্প, পুলক ইত্যাদি ; উদ্দীপন বিভাব—গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, স্মিত, বংশী, অঙ্গ, সৌরভ ইত্যাদি ; ব্যাভিচারী ভাব—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি ইত্যাদি তেত্রিশটি। এই সকলের সম্মিলনে মধুরা রতি নামে স্থায়ীভাবের রস-নিষ্পত্তি ঘটে। বর্তমান ক্ষেত্রে মধুর রসের ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

মধুর রসের দুইটি ভেদ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

—'স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ'।

বিপ্রলম্ভ

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভ বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতি কারকঃ॥

—নায়ক ও নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব দেখা দেয়, তাকে বিপ্রলম্ভ বলে। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের উন্নতি কারক।

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥

—বিপ্রলম্ভ ছাড়া সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। যেমন—রঞ্জিত বস্ত্র আবার রঞ্জিত করলে তাঁর রাগ (উজ্জ্বলতা) আরো বৃদ্ধি পায়।

বিপ্রলম্ভ চার ভাগে বিভক্ত :—

পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রৈমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ॥

—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভের এই চারটি ভেদ কথিত হয়েছে।

(ক) পূর্বরাগ

পূর্বরাগের সংজ্ঞা :

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগ স উচ্যতে ॥

মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে যে রতি উন্মীলিত হয়, তাকে বলে পূর্বরাগ। মিলনের পূর্বে রূপ-দর্শনে বা রূপগুণাদির কথা শ্রবণে নায়ক বা নায়িকার মনে যে রতির উদ্গম হয়, তার ফলে মিলনের বাসনা জন্মে। কিন্তু তৃষ্ণা পরিপূরিত না হওয়ায় বিপ্রলম্ভের উদ্ভব। এই বিপ্রলম্ভকালে নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে অনন্যমনা চিন্তার ফলে স্ফূর্তিতে বিষয়ালম্বন বিভাবের আবির্ভাব এবং তখন মানস, চাক্ষুষ ও কায়িক সম্ভোগ হয়। এভাবেই পূর্বরাগ রতি আস্বাদ্য রূপে রসতা প্রাপ্ত হয়।

'রসকল্পবল্লী'তে পূর্বরাগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ।' এই উক্তির দ্বারা হৃদয়কমলের প্রথম উন্মেষ-চেতনাকে বোঝাচ্ছে। ইংরাজিতে একেই বলা হয়েছে : 'Love at the first sight।' তবে ইংরাজি সংজ্ঞাটির মধ্যে পূর্বরাগের সংকুচিত অর্থের সন্ধান মেলে। এক কথায় পূর্বরাগের সহজ সংজ্ঞাটি হচ্ছে : প্রথম দর্শনে বা শ্রবণে নায়ক বা নায়িকার হৃদয়ে যে রাগ-লক্ষণ অঙ্কুরিত হয়, তাকে বলে পূর্বরাগ।

নায়ক বা নায়িকা—যে কারো মনে পূর্বরাগ রতির প্রথম উন্মীলন হতে পারে। তবে রসশাস্ত্রে প্রথমে নায়িকার পূর্বরাগ বর্ণনার বিধি দেওয়া হয়েছে। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন—'আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদিঙ্গিতৈঃ।' 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে আছে—'অপি মাধব রাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি। আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তে স্যাচ্চারুতাধিকা॥'

দর্শন ও শ্রবণ—দু'ভাবে পূর্বরাগ রতির উন্মীলন। দর্শন আবার তিন প্রকার—সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন। 'রসকল্পবল্লী'তে বলা হয়েছে :

দর্শনে শ্রবণে রাগ দুই ত প্রকার।
সাক্ষাৎ দর্শন এক চিত্র পটে আর ॥
স্বপ্ন দেখি উঠি এক করে আলিঙ্গন।
এই অনুভব শুদ্ধ বিষম দর্শন ॥

সাক্ষাৎ দর্শন :

বেলি অবসান কালে একা গিয়েছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যামরায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাথে
পুন কানু জলেতে লুকায় ॥ (রামানন্দ বসু)

চিত্রে দর্শন :

এমন মূরতি কেমন করি !
লিখিলে বিশাখা ধৈরজ ধরি ॥
দেখি দেখি পট আনহ কাছে।
এমন পুরুষ কি জগতে আছে ॥ (রাধামোহন)

স্বপ্নে দর্শন :

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে,
তাহা বিনু আর কারো নই ॥ (জ্ঞানদাস)

শ্রবণ : সখী, দূতী, ভাট প্রভৃতির কাছ থেকে রূপগুণাদির বর্ণনা শ্রবণে কিম্বা স্বরলহরী শ্রবণে পূর্বরাগ জন্মে। 'কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে' —পদটি এর উদাহরণ।

॥ ২ ॥

পূর্বরাগ তিন প্রকার—সাধারণ, সমঞ্জস ও প্রৌঢ়। সাধারণী রতিতে জাত পূর্বরাগকে বলা হয় সাধারণ পূর্বরাগ। সাধারণী রতি অর্থে যে রতি গাঢ় নয়। কৃষ্ণকে দর্শন করে, তার রূপলাবণ্যে বিহ্বল হয়ে সম্ভোগকামনায় এই রতির জন্ম। এই রতির মূলে থাকে ইন্দ্রিয়পিপাসা চরিতার্থের বাসনা। এই 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'কে রতি বলা হয় এ কারণেই যে, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'—অতি সামান্য হলেও এতে বর্তমান থাকে। কুব্জার পূর্বরাগ এই স্তরের।

কৃষ্ণের রূপগুণের কথা শ্রবণ করে যেখানে সম্ভোগেচ্ছা জন্মে এবং শাস্ত্রমতে বিবাহের দ্বারা সম্ভোগেচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, তাকে বলা হয় সমঞ্জসা রতি। সত্যভামা ও রুক্মিণীর কৃষ্ণবিষয়ক রতি সমঞ্জসা।

প্রৌঢ় পূর্বরাগ এ দুই থেকে অনেক উচ্চ স্তরের। সমর্থা রতিতে জাত পূর্ব-

রাগকে বলা হয় সমর্থ বা প্রৌঢ়পূর্বরাগ। সমর্থা রতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রতি স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্যা; কৃষ্ণের প্রীতি-ইচ্ছা পূরণের অভিলাষেই এর উন্মীলন। লোকধর্ম, দেহধর্ম, বেদধর্ম—সব কিছুই এতে তুচ্ছ মনে হয়। কৃষ্ণ-সুখই একমাত্র লক্ষ্য। ব্রজগোপীদের রতি সমর্থা। বৈষ্ণবরস-শাস্ত্রে সমর্থারতিই শ্রেষ্ঠ।

॥ ৩ ॥

প্রৌঢ় পূর্বরাগে নায়িকার দশ দশা উপস্থিত হয়। এই দশ দশা হোল:

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যাস্তানবং জড়িমা তথা।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশাদশ॥

—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

লালসার সংজ্ঞা: 'অভিষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।'—অভীষ্ট বস্তুকে পাওয়ার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় লালসা। এতে ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণাশ্বাস—প্রভৃতি ভাবোদয় হয়। লালসা যত তীব্র হয়, তত তার গাঢ়ত্ব সূচিত হয়। এই স্তরে প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা যতই তীব্র হোক্, তা থাকে মনের সংগোপনে। কিন্তু উদ্বেগস্তরে মনের চঞ্চলতা, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু, চাপল্য, চিন্তা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। 'উদ্বেগো মনসঃ কম্প স্তত্র নিশ্বাসচাপলে'। আর জাগর্য্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ।' জাগর্য্যায় নিদ্রার অভাব দেখা দেয়। তানব অর্থে অঙ্গের কৃশতা বোঝায়—'তানবকৃশতাগাত্রে দৌর্বল্যভ্রমণাদিকৃৎ।' উৎকণ্ঠা, চিন্তা, নিদ্রার অভাব ইত্যাদি কারণে শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়ে। জড়িমা স্তরে নায়িকার ইষ্ট-অনিষ্টের কোন জ্ঞান থাকে না, দর্শন ও শ্রবণ শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়।—"ইষ্টানিষ্টা-পরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরম্। দর্শন-শ্রবণাভাবো জড়িমা সোহভিধীয়তে॥" এ স্তরে বাহ্যজ্ঞান-লুপ্ত নায়িকার হুঙ্কার, স্তম্ভ, শ্বাস, ভ্রম প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পায়। বৈয়গ্র্য অর্থে বোঝায় ভাবগাম্ভীর্যজনিত বিক্ষোভের অসহিষ্ণুতা। ভাবোৎকণ্ঠার তীব্র আলোড়নে মন বিক্ষুব্ধ হয়। হৃদয়-বেদনা হয়ে ওঠে একান্ত অসহনীয়। এই স্তরে অবিবেক, নির্বেদ, খেদ, অসূয়া—ইত্যাদি দেখা দেয়। বৈয়গ্র্যের সংজ্ঞা: বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্যাবিক্ষোভাসহতোচ্যতে।' আর ইষ্টের অ-প্রাপ্তিতে শরীর যখন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে এবং উত্তপ্ত হয়, তখন হয় ব্যাধি দশা।

—'অভীষ্টলাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।" এই দশায় শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস, ও পতন সূচিত হয়। উন্মাদ দশার লক্ষণ :

সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিং স্তদদি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্ত্যতে।

—সর্বদাই তন্ময়ভাব, ফলে যে বস্তু যা নয়, তাই বলে ভ্রান্তি জন্মে। এই অবস্থায় অভীষ্ট বস্তুর প্রতি দ্বেষ, নিঃশ্বাস, নিমেষ-বিরহ প্রকাশ পায়। মোহের স্বরূপ : 'মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তা নৈশ্চল্য-পতনাদিকৃৎ।' মোহ হচ্ছে বিচিত্ততা অর্থাৎ চিত্তের বিপরীত গতি। ফলে নিশ্চলতা ও পতন হয়ে থাকে মৃত্যুদশার লক্ষণ :

তৈ তৈঃ কৃতৈঃ প্রতিকারৈঃ যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণ কদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ॥

—দূতী প্রেরণ ও পত্রের মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করা সত্ত্বেও যদি কান্ত সমাগত না হন, তাহলে কন্দর্পবাণের পীড়নে মরণের উদ্যম হয়। এই মরণোদ্যম কালে নায়িকা নিজের প্রিয়বস্তু সখীগণকে অর্পণ করেন।

সমর্থারতিতে যে দশটি দশার কথা উল্লিখিত হোল, তার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে আকর্ষকের আকর্ষণের তীব্রতা সূচিত হয়। লালসা থেকে পূর্বরাগের শুরু, মৃত্যু দশায় গিয়ে তা চরমে উন্নীত। প্রেমাঙ্কুরের মহীরুহরূপ ধারণের অতিপ্রত্যক্ষ আভাস পাওয়া যায় পূর্বরাগ পর্য্যায়ের এই দশ দশার ভিতর দিয়ে।

॥ ৪ ॥

মধুররসের পদাবলীতে পূর্বরাগ প্রেমাভিব্যক্তির তথা রসপর্যায়ের সূচনা স্তর। কৃষ্ণকে দেখে বা তার কথা শুনে রাধার হৃদয়মুকুল প্রস্ফুটিত হওয়া কিম্বা রাধার কারণে কৃষ্ণহৃদয়ে প্রেমাঙ্কুর উপ্ত হওয়া—সাধারণ দৃষ্টিতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেম-চেতনার মতই মনে হয়। মানবপ্রেমের রূপবিন্যাসে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য পূর্বরাগ স্তরেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ সবই অলৌকিক।

এই অলৌকিক রূপ ও রসবৈচিত্র্যের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য ভক্ত কবিগণ তিলে তিলে সুচয়িত ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির জন্য কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনাও করেছেন। পূর্বরাগ বর্ণনায় কবিগণ অনেক ক্ষেত্রেই কবিমানসের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছেন। ফলে কেউ রাধার, কেউ কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় সমধিক

প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দেহের বর্ণনায় বিদ্যাপতি এবং হৃদয়-কমলের উন্মোচনে চণ্ডীদাস সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রাধার হৃদয়ে সঞ্জাত পূর্বরাগ প্রথম থেকেই অতি গভীর স্তরে নিহিত। চণ্ডীদাসের রাধা তো প্রথম স্তরেই প্রৌঢ় পারাবতী। হওয়া-ও স্বাভাবিক। প্রথম দর্শনজাত বা শ্রবণজাত রতি হচ্ছে পূর্বরাগ। এতো আলঙ্কারিক অর্থে! আসলে কি তাই? 'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে'—সেই অনাদিকালের পথ বেয়েই তো চলেছে তাদের যুগল প্রেমের রভসলীলা। তবুও বৈষ্ণব রসপর্যায় অনুসারে পূর্বরাগকে বলা হয় প্রেমের সূচনা স্তর। কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য, মহিমা ও আকর্ষণ এমনই যে, কৃষ্ণকে চকিত দর্শন করেই রাধার হৃদয়-মন উন্মথিত হয়ে উঠেছে :

আধক আধ— আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শতকোটি কুসুম শরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ॥

চকিত দর্শনেই রাধা একেবারে আত্মহারা। দুর্নিবার হৃদয়াবেগ তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। ঘরছাড়ানো বংশী ও বংশীধারী—দুয়ের আকর্ষণই অতি প্রবল ও সক্রিয়। ফলে ঘর-সংসারের কোন মোহই রাধাকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। রূপসাগরে ডুব দিয়ে যে অরূপরতনের সন্ধান পেয়েছে, সমস্ত হৃদয়মন তো তাতেই নিমগ্ন থাকতে চায়।—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥…

কৃষ্ণের রূপ ও স্বরূপ—দুয়ের আকর্ষণেই রাধা অধীরা। শুধু—'উড়ু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ।' এখন রাধা—

বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

॥ ৫ ॥

কৃষ্ণের পূর্বরাগে রাধার দেহের প্রতি আকর্ষণই অধিক প্রকাশিত। এটা

স্বাভাবিক। নারী মুগ্ধ হয় পুরুষের গুণে, আর পুরুষ মুগ্ধ হয় নারীর অপরূপ দেহ সৌন্দর্য্যে। অন্ততঃ প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রে এ উক্তি সর্ত্য। যেমন, বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট রাধিকার সৌন্দর্য :

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহর ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি ॥

রাধা মন্দির থেকে বাইরে এলেন গোধূলি বেলায়। মনে হোল : মেঘের বুকে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। এখানে নবজলধর ও বিদ্যুৎরেখা—এই দুয়ের বৈপরীত্যজাত সৌন্দর্যের যে আবেদন, তাতো কৃষ্ণের হৃদয়ের কাছে। বিদ্যাপতির আর একটি পদের দুটি পংক্তি :

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিএ উড়ই না পার ॥

শ্রীরাধার চোখ যেন চোখ নয়, দুটি কালো ভ্রমর। স্থির ভ্রমর। স্থির—কারণ মধুপানে রত হয়ে আর উড়তে পারছে না। রাধিকার রূপবহ্নি শুধু আকৃষ্ট করে না কৃষ্ণকে, তাঁর গমন-ভঙ্গীর চকিত দৃশ্যটুকুও তাঁর হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগায়—'চলে নীল শাড়ি নিঙারি নিঙারি পরাণ সহিত মোর।' এই রতিরাগের আবেশেই নায়কের মর্মবেদনা উচ্ছ্বসিয়া ওঠে :

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি ॥

ভক্ত কবিও সখীর কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন :

এমন পিরীতি কভু নাহি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি ॥

(খ) মান

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী মানের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করেছেন :

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্য দাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥

অর্থাৎ "যে স্নেহ উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্তিহেতু নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং

অদাক্ষিণ্য (কৌটিল্য) ধারণ করে, তাহাকে মান বলা হয়।” স্নেহ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, ফলে প্রিয়ের মাধুর্য নূতনতর বলে অনুভূত হয়। কিন্তু বাহ্যিক হাবভাবে প্রকাশিত হয় কৌটিল্য বা বামতা। ‘ভিতরে প্রচুর আনন্দ সত্ত্বেও যে বাহিরে অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য—বাম্য, বক্র ব্যবহার, ইহাই হইতেছে মানের প্রধান লক্ষণ।” (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে—প্রেমের গূঢ়ত্ব, গাঢ়ত্ব এবং তার আস্বাদন, সবকিছুরই তাৎপর্য যখন স্বয়ং সচ্চিদানন্দ পরম রসঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, তখন এই কৌটিল্য কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রেমের গতি বড়ই কুটিল—ভাগবত প্রেমও আর বক্রতার বৈচিত্র্যের মধ্যেই উপলব্ধ হয় নূতনতর আনন্দের স্বাদ। যা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত ক’রে তোলে।

মানের দু’ভাগ—উদাত্তমান, ললিতমান। ঘৃতস্নেহজাত মান হচ্ছে উদাত্তমান; আর মধুস্নেহজাত মান হচ্ছে ললিত মান। চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে :

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে পরে প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান প্রণয়।

ঘৃত স্নেহ জাতীয় প্রেমে থাকে তদীয়তাময় ভাব—অর্থাৎ ‘আমি তোমার’ —এই ভাব ; আর মধুস্নেহ জাতীয় ভাবে মদীয়তাময় অর্থাৎ ‘তুমি আমার’—এই ভাব বর্তমান থাকে।

উদাত্ত মানকে আবার দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে—দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান, বাম্যগন্ধোদাত্তমান। দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান হচ্ছে—অন্তরে কৌটিল্য, কিন্তু বাইরে দাক্ষিণ্য অর্থাৎ সারল্যের ভান। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সামনে শ্রীরাধার প্রশংসা করলে চন্দ্রাবলী অন্তরে কুপিত হলেন ; কিন্তু বাইরে উদারতা প্রকাশ করলেন।

আর বাম্যগন্ধোদাত্তমান হোল : অন্তরে দাক্ষিণ্য, কিন্তু বাইরে কৌটিল্যের প্রকাশ। যেমন, একবার শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ অদর্শনের পর গোপীদের সম্মুখে উপস্থিত হ’লে তাঁরা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী দ্বারা তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এখানে অন্তরে তাঁরা পরিপূর্ণ ভাবে কৃষ্ণপ্রেম মাধুর্য আস্বাদন করছেন, কিন্তু বাইরে কুটিলতা প্রদর্শন করছেন।

ললিতমান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মধুস্নেহ যদি স্বাতন্ত্র্য দ্বারা হৃদয়ঙ্গম কৌটিল্য এবং নর্ম্ম বিশেষ ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে ললিতমান বলা হয়।" ললিত মান দু'প্রকার—কৌটিল্যললিত ও নর্মললিত।

পদাবলী সাহিত্যে মানের তাৎপর্য ও প্রাধান্য বর্তমান। মানের হেতু—নায়িকা মনে করে, নায়ক তাকে অবহেলা করে অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা নায়িকা, কৃষ্ণ নায়ক, আর প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী অসীম গুণ সম্পন্না। তার মাধুর্য ও প্রেম কৃষ্ণ উপেক্ষা করতে না পেরে তার কুঞ্জে রাত্রি যাপন করেছেন; পরদিন এসেছেন শ্রীরাধিকার কাছে। নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে, সর্বাঙ্গে ভোগচিহ্ন। বাঞ্চিতা শ্রীরাধার প্রেম বামতা প্রাপ্ত হয়। তিনি রুষ্টা হন। এ অবস্থার নাম খণ্ডিতা। খণ্ডিতা নায়িকা যখন নায়কের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি কলহান্তরিতা। তখন শেল সম বচনে বিদ্ধ করতে থাকেন নায়ককে। সমস্ত বিশ্বাস আজ নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি কুঞ্জ থেকে চলে যেতে বললেন কৃষ্ণকে। নানা প্রবোধ বাক্যে রাধিকাকে শান্ত করতে না পেরে কৃষ্ণকে চলে যেতে হোল। কিন্তু তার পরেই শ্রীমতীর অনুতাপ শুরু। তিনি বুঝলেন :—

আকুল প্রেম পহিল নহি জানলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জ্বলত পরাণ॥

কিন্তু মানের রহস্যই এই যে, হৃদয়ের কথা ব্যক্ত কিছুতেই করবেন না শ্রীমতী। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আগ্রহ তার প্রবল, কিন্তু বাইরে তিনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি তার মনে বিরক্তিই উৎপাদন করছে। সুতরাং বিরক্তি অপনোদনের জন্য প্রয়োজন অন্য পক্ষের সক্রিয় প্রচেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণই তাই অগ্রণী হলেন—'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহিপদপল্লব-মুদারম্।'

চরণ কমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান॥
ধনি মুখ শশি হরি চকোর।
হেরিতে দুহুঁক গলয়ে লোর॥

ক্ষণিকের অভিমান চোখের জলে ভেসে গেল। এ অশ্রু মিলনের আনন্দাশ্রু। মাধব, চন্দ্রাবলীর নয়, অন্য কারো নয়, একান্ত আমারই। "হৃদয় উপর থুওল রাই।

তুহুঁ মুখ দরশনে তুহুঁ ভেল ভোর।
তুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥...
মান বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥

মানের পদে ফুটে উঠেছে—ভক্তের অসীম আকূতির একটি প্রতিচ্ছবি। সব সমর্পণ করেও পরম ভক্ত যখন সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পায় না, তখন তার অভিমান জন্মে। প্রেমের প্রগাঢ়তা এতে বেশী বলেই মান পর্যায় এতো রসঘন। সকল প্রকার ভেদবুদ্ধি এখানে লুপ্ত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত হয়েছে:

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥

প্রিয়ার ভৎর্সনার ভিতর দিয়েই তার গভীর প্রেমের পরিচয় পেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠেন কৃষ্ণ। 'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত'—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। মধুর রসের সাধনাতেই তিনি সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ। আমরা 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'। ঐশ্বর্যজ্ঞানে নয়, আমাদের গার্হস্থ্য পরিবেশের পটভূমিকায় আমাদের একজন মনে করেই চলে তাঁর আরাধনা। সুতরাং দাম্পত্য প্রেমে যেমন আছে প্রীতির প্রকাশ, আবার সেই প্রণয়কে বৈচিত্র্য দানের জন্য চলে মান-অভিমানের মালা। রসশাস্ত্রে মানভঞ্জনের ছয়টি পদ্ধতি—সাম, দান, ভেদ, নতি, উপেক্ষা, রসান্তর—থাকলেও বৈষ্ণব সাহিত্যে জয়দেব প্রবর্তিত রীতিই অধিকতর অনুসৃত হয়েছে।

(গ) প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তং প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

—প্রেমের উৎকর্ষের ফলে প্রিয়তম সন্নিকটে থাকলেও প্রিয়বিচ্ছেদ আশঙ্কায় যে আ... জন্মে, তাকে বলে প্রেমবৈচিত্ত্য। এ অবস্থায় নায়িকার সমস্ত চিত্ত-... নায়কেই নিহিত থাকে; এর ফলে গাঢ় তন্ময়তা জন্মে, তাতে নায়ক কৃষ্ণ

অতি নিকটে থাকলেও নায়িকা রাধা বুঝতে পারেন না ; কিংবা বুঝতে পারলেও ঐকান্তিক নিবিড়তার বশবর্তী হয়ে বিচ্ছেদ ব্যাথায় কাতর হয়ে পড়েন। প্রেমের উৎকর্ষবশতঃই এরূপ ঘটে থাকে। প্রেমবৈচিত্ত্য কথার অর্থ হচ্ছে প্রেমের বিচিত্ততা, অর্থাৎ চিত্তের অন্যথাভাব। প্রিয় সন্নিকর্ষে থেকেও প্রেমের স্বভাবে বিরহভ্রান্তি প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ। বৈষ্ণব রস সাহিত্যে প্রেমবৈচিত্ত্যের তাৎপর্য অসীম। এর দ্বারা একদিকে যেমন রাধার প্রেমের অসীমতা সঙ্কেতিত করে, অন্যদিকে বিরহের বেদনাস্পর্শ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে লীলাকে ব্যাপ্ত করে তোলে। 'রসকল্পবল্লী'তে প্রেমবৈচিত্ত্যের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

দম্পতীর পরস্পর প্রেমোৎকর্ষ হয়।
অধিকারিতা সেই বিচারি না লয় ॥
অঞ্চলে বান্ধিয়া রত্ন চাহি ফিরে ফিরে।
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে ॥

প্রেমবৈচিত্ত্য নায়িকার নায়কের প্রতি সুগভীর অনুরাগের পরিচায়ক। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে আছে :

সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনব সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥

যে রাগ সর্ব্বদা প্রিয়কে নূতন নূতন রূপে অনুভব করায়, তাকে বলে অনুরাগ। অনুরাগ নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে অতিগাঢ় প্রীতির বৈচিত্র্যমণ্ডিত রূপ। এই অনুরাগের বশেই কৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য বারবার আস্বাদন করেও রাধার তৃপ্তি হচ্ছে না ; সর্ব্বদাই একটা অতৃপ্তির সুর রাধার হৃদয়, মন ভরে আছে। 'তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ॥' প্রিয়কে নিত্য নূতন অনুভব করায় বলেই তৃপ্তি পাওয়া যায় না, পরিপূরিত হয় না তৃষ্ণা। কৃষ্ণকে পেয়েও মনে হয় পাইনি ; মিলনের লগ্নেও আসে তাই বিরহ ভ্রান্তি :

নাগর-সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরি
দারুণ বিরহ হুতাশে ॥

এই ভয়ের পিছন থাকে অননুভূতপূর্ব্ব মাধুর্য বোধ। প্রতি মুহূর্তেই নিত্য নূতন রূপে এই মাধুর্য প্রতিভাত হতে থাকে। প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে এর

মূলে। সর্ব্বদাই একটা ভয়—“এই ভয় ওঠে মনে এই ভয় ওঠে। না জানি কানুর প্রেম তিল জনি জোটে।” তাই প্রিয় সন্নিধানে থেকেও প্রিয়ের অন্তর্ধান জনিত বিরহবেদনায় অস্থির হ'য়ে ওঠেন রাধা। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রেমবৈচিত্ত্য গাঢ় অনুরাগের একটি লক্ষণ। অন্য লক্ষণগুলি হচ্ছে, পরস্পর বশীভাব, অপ্রাণীতে জন্মলালসা. বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তি।

(ঘ) প্রবাস

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রবাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ :

পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে॥

—পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশান্তরে গমনজনিত ব্যবধানকে প্রবাস বলে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে প্রবাস—বুদ্ধিপূর্বক ও অ-বুদ্ধিপূর্বক—এই দু'প্রকার। কার্যব্যপদেশে দূরে গমনের ফলে যে প্রবাস, তা বুদ্ধিপূর্বক এবং পরাধীনতার ফলে উদ্ভূত যে সুদূর প্রবাস, তা অ-বুদ্ধিপূর্ব্বক। বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস আবার দু'প্রকার—দূর ও নিকট। বৃন্দাবনের গোচারণে গমন জনিত প্রবাস নিকট প্রবাস। দূর প্রবাস তিন প্রকার—ভাবী, ভবন্ ও ভূত।

কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে এলে ব্রজের সকল গোপ-গোপী, বিশেষ করে রাধা, সেই সংবাদ শুনে বিচ্ছেদ ভাবনায় অস্থির হ'য়ে পড়েন। কৃষ্ণ বিরহ সম্ভাবনায় যে বিরহ কল্পনা, তাই ভাবী বিরহ। ভাবী বিরহের লক্ষণ প্রসঙ্গে রসকল্পবল্লী গ্রন্থে বলা হয়েছে :

নায়ক বিদেশে যাবে শুনিয়া সুন্দরী।
সহচরী সঙ্গে বিলাপ নানাবিধ করি॥
দুষ্ট অক্রুর এ দেশে কেনে বা আইল।
কৃষ্ণকে লইয়া যাবে একথা শুনিল॥
কুৎসিত স্বপনে দেখে দক্ষিণ অঙ্গ নাচে।
অনুক্ষণ উচাটন নিরবধি কান্দে॥

পদাবলী সাহিত্যে ভাবী বিরহের দৃষ্টান্ত :

কিয়ে সখি চম্পক— দাম বনায়সি
করইতে রভস-বিহার।
সো বর নাগর, যাওব মধুপুর,
ব্রজপুর করি আঁধিয়ার॥ (যদুনন্দন)

অক্রূরের রথে চড়ে কৃষ্ণ মথুরা চলেছেন। এই নিদারুণ দৃশ্যে ব্রজকুল বিরহে কাতর হ'য়ে পড়েন। এই হোল ভবন্ বিরহ। ভবন্ বিরহের লক্ষণ—

শ্রীকৃষ্ণ চলিলা রথে দেখি ব্রজনারী।
সহচরী সঙ্গে রাই যায় গড়াগড়ি॥
আলুয়াইল কেশপাশ তাহা নাহি বান্ধে।
লোকাপেক্ষা নাহি করে উচ্চস্বরে কান্দে॥ (রসকল্পবল্লী)

ভাবী বিরহ অপেক্ষা ভবন্ বিরহের বেদনা অনেক বেশী। কৃষ্ণের মথুরাগমন ব্রজকুলের হৃৎপিণ্ড ছেদনের তুল্য। সারা বিশ্বব্যাপ্ত হ'য়ে একী অমঙ্গলের হাহাকার! কানু বিনা জীবন তুষানলে জ্বলতে থাকবে। এই মর্মদাহী বিরহসন্তাপ সহ্যের ক্ষমতা কারো নেই। এখন 'করুণা সাগরে, বিরহ বেয়াধিনা. ডুবায়ল স্বজন চিত।' কৃষ্ণের গমন পথের উপর এদের বিরহ বিলাপ প্রমূর্ত হয়েছে বৈষ্ণবপদে:

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরি মুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি, করত জানি ঐছন,
কানু সঞে জাবন যাহ॥ (রাধামোহন)

কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন। আর ফিরে আসেন নি। সমস্ত ব্রজ তাঁর বিরহে ক্ষীয়মাণ। বিরহের এই অবস্থাটি ভূত বিরহের অন্তর্গত। এই ভূত বিরহই মাথুর বিরহ।* বিরহ বেদনা দিক্ দিগন্তর পরিপ্লাবিত করে তুলেছে। ক্রন্দন করে ওঠেন:

অব মথুরাপুর মাধব গেল;
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥···

প্রবাস জনিত বিরহের দশটি উল্লিখিত হয়েছে: চিন্তা, জাগর্যা, উদ্বেগ, তানব, মালিন্য, প্রলাপ; উন্মত্ততা, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু।

সম্ভোগ

সম্ভোগের সংজ্ঞা:

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে॥

* মাথুর বিরহ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

—"নায়ক ও নায়িকার (পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়ের) দর্শন, আলিঙ্গন, সম্ভাষণ ও স্পর্শাদির যে পরস্পর সুখতাৎপর্য্যমূলক নিষেবণ, তাহাদ্বারা উল্লাস-প্রাপ্ত ভাবই পণ্ডিতগণ কর্তৃক সম্ভোগ বলিয়া কথিত হয়।" মুখ্য ও গৌণ ভেদে সম্ভোগ আবার দু'প্রকার। মুখ্য সম্ভোগ জাগ্রত অবস্থায় সম্ভোগ, গৌণ সম্ভোগ হচ্ছে স্বপ্ন সম্ভোগ।

মুখ্য সম্ভোগকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ হচ্ছে লজ্জা, সম্ভ্রমহেতু যে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। যে সম্ভোগে নায়িকা সম্পূর্ণ ধরা দেয় না, তাহা সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। মানের পরে এ সম্ভোগ হয়। অদূর প্রবাসের পরে হয় সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসের পরে হয় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

গৌণ সম্ভোগকে প্রথমে দু'ভাগ করা হয়েছে—সামান্য ও বিশেষ। মুখ্য সম্ভোগের মত গৌণ সম্ভোগও—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান্—এই চারপ্রকার।

পদাবলীর রস পর্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্বের রস-ভাষ্য, রস-প্রকাশ। সর্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন, শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তি, আত্মপর্যন্ত-সর্বচিত্তহর গোলকাখ্য শ্রীকৃষ্ণকে নানাভাবে সাধনা করা চলে—'নানা ভক্তে রসামৃত নানা মত হয়।' এর মধ্যে আবার 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার'। এই কান্তাপ্রেমের বহুধা বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে সাধ্যশিরোমণি রাধার প্রেমের সর্বাতিশায়িতা তুলনা রহিত। পদাবলী সাহিত্যে মধুর রসের প্রগাঢ়তা সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রেমের গাঢ়তা ও গূঢ়তার বিকাশ অনুসারে বৈষ্ণব পদাবলীর কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায় :—পূর্বরাগ, অনুরাগ ও রূপোল্লাস, অভিসার, মান ও কলহান্তরিতা, প্রেম-বৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন, মাথুর, ভাবসম্মিলন। কৃষ্ণপ্রেমের ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের ভাব-সত্যকে পদকর্তা ছন্দোবদ্ধ বাণী রূপ দিয়েছেন। এ ছাড়া সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদও আছে। তবে মধুর রসের পদাবলীতেই বৈষ্ণবপদকর্তাদের চূড়ান্ত কবিত্ব শক্তির পরিচয় নিহিত। সাধারণভাবে, পদাবলী বলতে মধুর রসের পদাবলীই বুঝায়।

মধুর রসের পদাবলীর রসপর্যায়গত বিভাগের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া নায়িকাভেদেও পদাবলী বিভাগ করা যায়—যথা, শ্রীরাধার অষ্ট নায়িকাবস্থার বাঙ্ময় রসরূপ। তবে মধুর রসের পদাবলীর স্তর পরম্পরায় প্রেমের বিকাশের রূপটি দেখা যায়। পূর্বরাগে দর্শন বা শ্রবণে প্রেমের উদ্‌গম, অভিসারে মিলনের আকূতি বশে পরমের উদ্দেশ্যে দূর দুর্গম পথে যাত্রা, সব কিছু দিয়েও পরিপূর্ণভাবে তাঁকে না পাওয়ার জন্য মান ও আক্ষেপ, মাথুরে কৃষ্ণ-বিরহে নিদারুণ বেদনা, পরিশেষে ভাবসম্মিলন পর্যায়ে এসে মানস-মিলনে সে বেদনার পরিসমাপ্তি। এক আত্মা, দুই দেহ পুনরায় মিলিত হলে সব জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয়—তখন 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।' সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী মোহনার উদ্দেশ্যে গমনের বহু বিচিত্র রস-প্রকাশ। আর গৌরচন্দ্রিকা তার মুখবন্ধ স্বরূপ।

গৌরচন্দ্রিকা—পালাবদ্ধ রস-কীর্তনের পূর্বে তার মুখবন্ধ স্বরূপ গৌরাঙ্গ বিষয়ক যে পদ গীত হয়, তাকে বলা হয় গৌরচন্দ্রিকা। এ জাতীয় পদের

উৎস ও অবলম্বন শ্রীগৌরাঙ্গদেব; বর্ণনায় বিষয় তাঁর দিব্য জীবন লীলার বিচিত্র ভাবসম্পদ।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর দিব্য জীবনের পাবনী স্পর্শে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন তমসাচ্ছন্ন জাতির জীবনকে। বহিরঙ্গ দিক থেকে—ধর্মপ্রচারের দ্বারা আচার-সর্বস্ব, খণ্ডচ্ছিন্ন জাতিকে এক সূত্রে বিধৃত করা ও শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। শুষ্ক আচার-বিচার নয়, ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রেমই মানবকে সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহের করুণা লাভের পথ প্রদর্শনে সমর্থ—সমগ্র জগৎ মহাপ্রভুর কাছ থেকেই প্রথম একথা শুনল। মহাপ্রভুর ঘোষণা—'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী. শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥' কেননা—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যে ক্ষেত্রেও মহাপ্রভুর প্রভাবে মরা গাঙ্গে বান ডাকল। মহাপ্রভু কিন্তু নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি; তার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। কিন্তু তাঁর মহিমায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে কত শত ভক্ত কবি বাঙ্ময় ভক্তি-পুষ্প উপহার দিয়েছেন সচ্চিদানন্দ রসঘন-বিগ্রহ পরম বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে। মহাপ্রভুই তাঁর উৎস, মহাপ্রভুই তাঁর অনুপ্রেরণা।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে, মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রেমরস আস্বাদনের কারণে। (১) শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, (২) শ্রীরাধা কর্তৃক আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-মহিমাই বা কিরূপ, (৩) শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদন করে রাধার সুখই বা কিরূপ—এই তিন অভীপ্সা পূরণের জন্য রাধাকৃষ্ণের দেহ-ভেদ গত হ'য়ে ঐক্যপ্রাপ্তরূপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব:

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গাকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥

মহাপ্রভুর জীবন সাধনায় শ্রীরাধায় ভাবমাধুর্য প্রকটিত হয়েছে। প্রকটকালের শেষ দ্বাদশ বৎসর রাধাভাবে ভাবিত হ'য়ে তিনি অবিরত প্রলাপ বকতেন:

রাধিকার ভাব মূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ ওঠে নিরন্তর॥

শেষ লীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥
রাত্রে বিলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাবে কহেন উঘাড়ি॥

শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে শ্রীরাধার যে ভাবরূপ ফুটে উঠল, তাতে রাধা ও গৌরাঙ্গ এক হ'য়ে গেলেন। যেমন:

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
খেনে খেনে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে॥

বৈষ্ণব পদাবলী মূলতঃ মধুররসের সাধনায় রাধার জীবনের করুণার্তির বাঙ্ময় প্রকাশ; আর চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনই হোল এই অপ্রাকৃত রাধাপ্রেমের ভাব-ব্যাখ্যা—বৈষ্ণব পদাবলীর রস-সাগরে প্রবেশের নিগূঢ় চাবিকাঠি। "সাধারণ লোকের পক্ষে অপ্রাকৃত রাধা। প্রেম একটি তত্ত্ব-ভাবনা মাত্র; এই তত্ত্ব-ভাবনা সকল বিষয়ীকৃত হইয়াছিল মহাপ্রভুর জীবনে; সাধারণ জীবের পক্ষে তাই মহাপ্রভুর প্রেমের দ্বারা রাধাপ্রেমকে বুঝিয়া লওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা।"

(ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত)

বাসু ঘোষের একটি পদে এই তত্ত্ব চমৎকার কাব্যরূপ লাভ করেছে:

যদি গৌরাঙ্গ না হোত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।

রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে ॥
মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, নীলাচল বাসের শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভুর এক প্রকার দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাল কাটত।—

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥
এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি দিনে।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে ॥

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে অন্যতম, মুকুন্দ, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখা দিলে 'ভাবের সদৃশ পদ' গান করতেন :

প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গায়িতে ॥

এখানে ভাবের সদৃশ পদ বলতে বোঝায়—চৈতন্যদেব প্রেমধারার যে বিশিষ্ট ভঙ্গীটির দ্বারা আবিষ্ট হ'তেন, তার অনুরূপ রাধাভাবের পদ। এ পদ কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা নয়। গৌরচন্দ্রিকা হচ্ছে—রাধাভাবানুগ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। লীলাকীর্তনের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গীত হ'য়ে থাকে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, শ্রীরাধার যে ভাবটিকে আশ্রয় করে রস-পর্যায়টি ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপ লাভ করেছে, চৈতন্যদেবের জীবনে ঠিক সেই ভাবের বিলাস যে পদে রসরূপ লাভ করে সে গুলিই গৌরচন্দ্রিকা। একেই বলা হয়—'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা' কিংবা 'তদ্‌ভাবানুগ গৌরচন্দ্রিকা'। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেছেন—'গৌর লীলা বৃন্দাবনলীলার ভাব প্রতিরূপ। এই গৌরলীলার প্রতিটি স্পন্দন ছন্দোবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে গৌর পদাবলীতে। এই সকল পদের নাম গৌরচন্দ্রিকা" গৌর-চন্দ্রিকার সংজ্ঞা সুতরাং নিম্নরূপ হ'তে পারে—পালাবদ্ধ রস কীর্তনের আগে তদ্‌ভাবানুগ গৌরাঙ্গ বিষয়ক যে পদ গীত হয় তাকে বলা যায় গৌরচন্দ্রিকা।

গৌরাঙ্গবিষয়ক অন্যান্য পদকে গৌরাঙ্গচন্দ্রিকা বলা যাবে না। সেগুলিকে

গৌরলীলাপদ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এতে গৌরাঙ্গ আছে, চন্দ্রিকাও আছে, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা অনুপস্থিত। গৌরচন্দ্রিকাও অবশ্য গৌর-লীলাপদ। কিন্তু বিশেষ ধরণের।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তের বিশ্বাস—'আমার গোরা ভাবের রাধারাণী।' তদনুযায়ী রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের বিচিত্রভাব অবলম্বনে রচিত গৌর-চন্দ্রিকার সঙ্গে সাধারণতঃ আমরা পরিচিত থাকলেও কৃষ্ণভাব অবলম্বনে রচিত গৌরলীলা তথা গৌরচন্দ্রিকার পদ-ও দেখা যায়। যেমন—বাসু ঘোষের 'হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥' পদটিতে সন্ন্যাসগ্রহণ কালে চৈতন্যদেবের নদীয়া ত্যাগের এই চিত্রটি কৃষ্ণের ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করে মথুরাগমনমূলক পদাবলীর গৌরচন্দ্রিকারূপে এঁকেছেন ভক্ত কবি।

পালাকীর্তনের আগে গৌরচন্দ্রিকা পদ গীত হওয়ার সার্থকতা নানা প্রকার। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—"বৃন্দাবনের বিপিনে যে লীলা মাধুর্যের বিস্তার ঘটিয়াছে তাহার ভিতরে প্রবেশ-চাতুরি-সার হইল এই গৌরাঙ্গ প্রেম। এই জন্য রাধাপ্রেম কীর্তন করিবার পূর্বে ভক্তচিত্তে নিগূঢ় তত্ত্বভাবনা জাগ্রত করিবার জন্য এই গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন করিয়া লইতে হয়।"

তাছাড়া বহিরঙ্গ কারণ; কীর্তন গানের আগে গৌরচন্দ্রিকা গানের দ্বারা রসজ্ঞ শ্রোতা বুঝে নিতে পারেন যে, কোন্ রসের পদ তখন গীত হবে। এদিক থেকেও গৌরচন্দ্রিকার সার্থকতা।

তৃতীয়ত, বৈষ্ণব কবিতা রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহের মধুর আবেশের ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপের প্রতিফলন মাত্র। সাধারণ পাঠক বা শ্রোতা পদাবলীকে স্থূল কামকেলি বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু ভক্ত কবি নিজেদের জীবন সরোবরে বিকশিত পদ্ম, কান্তপ্রেমকে, রাধাকান্তপ্রেমে পরিণত করেছেন। ব্যক্তিক ভোগ-বাসনা প্রকাশের সুযোগ বৈষ্ণব পদে নেই। এঁরা ছিলেন লীলাশুক। শুকের মতই দূর থেকে রাধাকৃষ্ণলীলা দর্শন করে তাঁরা তাকে বাঙ্ময়রূপ দিয়েছেন মাত্র। আর কাম ও প্রেমের স্পষ্ট গণ্ডীও তাঁদের জানা ছিল। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়:

কাম আর প্রেমের দুই স্বরূপ লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

সুতরাং স্পষ্টতঃই বলা চলে যে, তত্ত্ব-জ্ঞানহীন লোকের পক্ষে বৈষ্ণব কবিতা অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল বলে মনে হ'লেও মহাপ্রভুর আস্বাদিত ও অনুপ্রেরণায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলী কখনই প্রাকৃত কামকলার পরিপোষক হ'তে পারে না। কেন না :

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ ॥

পদাবলী কীর্তনের পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা কীর্তনের ফলে মহাপ্রভুর দিব্যজীবন বিভার স্মরণে গায়ক ও শ্রোতার মন পরিশীলিত হয়। একটি আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা সমগ্র পরিমণ্ডলকে অপরূপায়িত করে তোলে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এভাবে স্মরণ করলে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়; ফলে পদাবলীর গূঢ় তাৎপর্যটি শ্রোতার চিত্তে সহজে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা নিরূপণের জন্যও গৌরচন্দ্রিকার অবদান অসামান্য।

এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন; "মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব যেরূপ ভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করেন নাই। বস্তুতঃ সেই নিখিল-রস-মাধুরী-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজ রসমাধুর্য্য নিজেই আস্বাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারই অনুগত হইয়া রসাস্বাদন করিবার যে প্রতিজ্ঞা গায়ক ও ভক্তগণ করেন, তাহা তত্ত্বের দিক দিয়া সর্ব্বথাযোগ্য বলিয়া মনে হয়।" রায় রামানন্দের ভাষায়, গৌরচন্দ্রিকা রসকীর্তনে পরমান্নে কর্পূরবিন্দু স্বরূপ।

তাছাড়া, প্রাণে যিনি সাড়া জাগিয়েছেন, যাঁর পূতস্পর্শে ভাবের মরাগাঙ্গে বান ডেকেছে, কমলা-শিব-বিধির দুর্লভ প্রেমধন যিনি করুণাভরে জগজ্জনকে দান করেছেন, সেই মহাজীবনকে স্মরণ করা জাতির কর্তব্য। বৈষ্ণবপদাবলী কীর্তনের পূর্ব্বে গায়ক জাতির মুখপাত্র স্বরূপ সেই কৃত্য সমাপন করে থাকেন। গৌরচন্দ্রিকার প্রত্যেকটি পদেই চৈতন্যদেবের ভাবজীবনের চিত্র প্রতিফলিত। এগুলি পদাবলী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

বাল্যলীলা

বাৎসল্য রসের পদ বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রচুর নয়। প্রাক্-চৈতন্য যুগে এ জাতীয় পদ প্রায় ছিলই না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সখ্যপ্রেম ও বাৎসল্য প্রেম যখন

উত্তম বলে পরিগণিত হোল, তখন এ জাতীয় পদ রচনায় মহাজন কবিদের আগ্রহ দেখা দিল। বৈষ্ণব মতে, 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার' হলেও বাৎসল্যপ্রেম অবহেলিত নয়। 'আমারে ত যে যে ভক্ত ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥'—কৃষ্ণের উক্তি। ভগবান আরো বলেছেন:

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি।
আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন॥
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্দে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥ (চৈ. চ. ১।৪)

কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক পদে সখ্য ও বাৎসল্য এই দু'জাতীয় পদ পাওয়া যায়। তত্ত্বের দিক থেকে, এতে ঐশ্বর্যের কোন জ্ঞান থাকে না। সখ্যে থাকে সমত্ববোধ; বাৎসল্যে মমত্ববুদ্ধির আধিক্য বশতঃ কৃষ্ণকে হেয়জ্ঞান। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান—এ অনুভবও শ্রীদাম-সুদাম, কিম্বা নন্দ-যশোদার মনে অণুমাত্র জাগে না।

সন্তানকে ঘিরে মাতৃহৃদয়ের স্বতোৎসারিত স্নেহধারা বাল্যলীলার পদে অভিসিঞ্চিত হয়েছে। শিশুর প্রতিটি আচরণ—তার হাসি, চাপল্য, ভাবভঙ্গী—সব কিছু মায়ের মনে আনন্দের তুফান তোলে। সন্তানের মধ্যেই মা অনুভব করেন সমস্ত জগতকে।

দেখসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেল নন্দ রায় আনন্দ বহিয়া যায়
নয়ান ভরিয়া দেখসিয়া॥

কখনো গোপাল মায়ের কোলে বসে পা নাচায়, ফলে নূপুরের শব্দ হয়। হাসিমুখের অমৃত সিঞ্চিত আধআধ বাণী মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। মনে হয়—'ধরণী আনন্দিত অঙ্গ বিরাজিত, সুন্দর বাল গোপাল।'

একবার গোপাল আবদার ধরেছে, মায়ের কোলে উঠবে। কিন্তু মায়ের

কাখে কলসী, সেটি না নামিয়ে সন্তানকে কোলে নেবেন কি করে। অতএব, নানা কথায় তাকে নিরস্ত করতে হয়—

মরি বাছা ছাড় রে বসন।
কলসী উলায়্যা তোমারে লইব এখন ॥
মরি তোমার বালাই লয়্যা, আগে আগে চল ধায়্যা,
ঘাঁঘর নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙা লাঠি দিব হাতে, খেলাইও শ্রীদামের সাথে,
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর-ননী ॥ (নরসিংহ দাস)

মায়ের এই সামান্য অনুযোগে গোপালের অভিমান হয়। বংশীবদনের একটি পদে এই চিত্র: যাদুমণি রাণীর আগে আগে চলেছে, মায়ের ডাকে অভিমান ভরে ফিরেও তাকাচ্ছে না। চোখে তার জল। মা উতলা হয়ে পড়েন। 'না জানি কেমন বিধি লাগিল আমারে।' কিন্তু যাদুমণির জন্য শুধু চোখের জলই ফেলেন না মা যশোদা। সন্তান অন্যায় করলে তিনি তাকে শাসন করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। সেখানেও থাকে সন্তানের মঙ্গল চিন্তা—

হেদে গো রামের মা ননীচোরা গেল এই পথে।
নন্দ মন্দ বলু মোরে, লাগালি পাইলে তারে,
সাজাই করিব ভাল মতে ॥
শূন্য ঘরখানি পায়্যা, সকল নবনী খায়্যা,
দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
আঙ্গুলির চিনাগুলি, বেকত হইবে বলি,
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানী ॥···
যে মোরে দিলেক তাপ, সে মোর হয়্যাছে বাপ,
পরাণে মারিব ননীচোরা ॥···(যদুনাথ দাস)

বাল্যলীলার গোষ্ঠবিষয়ক পদে বাৎসল্য ও সখ্য—দুই রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বলাই ও সখাদের সঙ্গে কানাই যখন গোঠে যায়, তখন পিছনে তাকিয়ে থাকে যশোদার স্নেহবিহ্বল দুটি উৎকণ্ঠ নয়ন। কানুকে তিলেকের অদর্শনে নানা অমঙ্গল চিন্তায় মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে। মাতা বারবার

তাকে সাবধান হ'য়ে চলতে উপদেশ দেন—যাতে কোন অমঙ্গল তাকে স্পর্শ না করে।

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পুরিহ মোহন বেনু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে॥ (যাদবেন্দ্র দাস)

গোঠে যাওয়ার সময় মাকে প্রণাম করে কানু অন্য শিশুদের সঙ্গে গোঠের পানে চলল। কানুর যে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষিধে পায়, একথা মা ভোলেন নি। তাই তিনি ক্ষীর-নবনী উপযুক্ত পরিমাণে তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন। দলবদ্ধ সেই গমন দৃশ্যটি অতি মনোরম—

প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা-বেণু গগনে গো-খুর-রেণু
শুনি সবার হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ শবদ ঘনরোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥ (মাধব দাস)

গোষ্ঠলীলায় সখ্যরসেরও চরম উৎকর্ষের চিত্র পাওয়া গেছে। খেলায় পরাজিত কানাই সখা সুবলকে কাঁধে চড়িয়েছে—সখ্যপ্রীতির কি অদ্ভুত মহিমা!

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায়॥ (বলরাম দাস)

'বাল্যলীলা'র পদের রসমূল্য তত না হলেও তা মাতৃহৃদয়ের ঐকান্তিক নিবিড়তা, স্নেহের উৎসারণ, সখ্যের সহজ প্রীতি ও সারল্যের অকৃত্রিম ভাবসম্পদে অমূল্য।

॥ আক্ষেপানুরাগ ॥

আক্ষেপানুরাগের মূলেও থাকে কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অনুরাগ। পূর্বরাগে প্রেমের সূচনা, অনুরাগে প্রেমের শিকড় অতি গভীরে চলে যায়। আক্ষেপানুরাগে শ্রীরাধা 'অনুরাগের আধিক্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অনুপস্থিত প্রিয়কে, নিজেকে ও স্বজনকে ভর্ৎসনা' করেন। সর্বত্রই ধ্বনিত হ'তে থাকে একটি আক্ষেপের সুর। এই আক্ষেপজনিত বেদনা ও নৈরাশ্যই আক্ষেপানুরাগ পদাবলীর উপজীব্য। এক কথায় বলা যায়—নায়ক-নায়িকার মিলনের পরে গাঢ় অনুরক্তি জনিত যে আক্ষেপ, তাকেই বলা যায় আক্ষেপানুরাগ।

'রসকল্পবল্লী'তে বলা হয়েছে :

আক্ষেপানুরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে।
দিগ্ দরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে ॥
কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপ করে আর যে সখীকে ॥
গুরুজনে আক্ষেপ আর কুলশীল জাতি।
আপনাকে নিন্দে কভু দৈন্য ভাব গতি ॥
কন্দর্পেরে মন্দ বলে করিয়া ভর্ৎসনা।
বিপক্ষাদির ব্যঞ্জিয়া কভু করয়ে বঞ্চনা ॥
বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈবে দোষে।"

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ—উভয় রস-পর্যায়েই রাধার হৃদয়ের বেদনা নৈরাশ্য ও আক্ষেপের আকারে প্রকাশিত। উভয় পর্যায়েই থাকে অতি গাঢ় ও গূঢ় অনুরাগের দ্যোতনা। তা সত্ত্বেও এ দুয়ের মাঝে ভেদচিহ্ন বর্তমান। প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ে কৃষ্ণসন্নিধানে অবস্থিতিকালেই রাধার হৃদয়ে বিরহভ্রান্তিজনিত বেদনার প্রকাশ; অপরদিকে আক্ষেপানুরাগে অনুপস্থিত নায়কের উদ্দেশ্যে কিংবা তাঁকে কেন্দ্র করেই চলে রাধার বিলাপ অথবা ভর্ৎসনা। একটা বঞ্চনাবোধজনিত শূন্যতার বেদনা রাধার হৃদয়কে নিরন্তর দহন করতে থাকে। এই বেদনার অভিঘাতেই রাধা বিলাপ করেন :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

—যে প্রেম-স্পর্শকে চন্দ্রকিরণের মত শীতল বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখা যায় তাতে সূর্যকিরণের জ্বালা। এ জ্বালা প্রেমেরই জ্বালা। রাধা প্রেম করেছেন তাই এ জ্বালা। শ্রীমতি আত্মধিক্কার দিয়ে ওঠেন :

বঁধু, সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, করেছি পীরিতি,
কাহারে করিব রোষ ॥······

এখন তাই—'জাতিকুলশীল সকলি মজিল ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি।' কাঁদতে কাঁদতেই রাধার জীবন যাবে। কেননা—এ প্রেম—'শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।' রাধিকা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেন :

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈলুঁ দিবস, দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পীরিতি ॥

—কেমন করেই বা পারবেন? নিত্য নূতন করে প্রিয়তমের যে মাধুর্য রাধা আস্বাদন করছেন, তার শেষ কোথায়? রাধার দিক থেকে কৃষ্ণকে সর্বস্ব সমর্পণের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। তবুও কৃষ্ণ-প্রেম-রহস্যের কুল কিনারা না পেয়ে তিনি বেদনায় অস্থির। ঘর-সংসার-গৃহজন-পরিজন-মান-লোক-লজ্জা—সব কিছু যিনি কৃষ্ণকে পাবার আশায় ত্যাগ করতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে এতদূর উৎকণ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। কৃষ্ণপ্রেমবঞ্চিতা হ'য়ে এ বিশ্বে শ্রীরাধিকা এখন একা। আপন দুঃখের কথা শোনানোর মত আপনজন তাঁর কেউ নেই। পরম ব্যাকুলতায় রাধা তাই কৃষ্ণের কাছেই কৃষ্ণের ঔদাসিন্যের কথা শোনান :

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই ॥······
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে আর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥ (চণ্ডীদাস)

ক্রন্দন ক'রে মনের ভার শ্রীমতি কিছুটা হালকা করে নেবেন, সে উপায়ও নেই। গুরুজন পরিজনের ভয় তো আছেই; তারপরে আছে দুর্জন স্বামীর পাঁজরবেঁধানো বাক্যবাণ। অন্য রমণী পর্যন্ত রাধাকে দেখে চোখ ঠারাঠারি করে

পাপ ননদিনী বিষের অধিক বিষ ; দারুণ শাশুড়ী যেন জলন্ত আগুনের মত এমত অবস্থায়—

> কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই।
> নিশ্চয় মরিব তোমার চান্দ মুখ চাই ॥
> শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
> তোমার নিঠুরপণা সোঙরিয়া মরি ॥
> চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
> এমত রহিয়ে পাড়া পড়শীর ডরে। (জ্ঞানদাস)

—রাধার প্রতি কৃষ্ণের উপেক্ষার বেদনা রাধার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হয়েছে। তারপর আবার রাধা যখন বুঝলেন যে,—কৃষ্ণ তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য নাকিয়াতে আসক্ত, তখন রাধা একেবারে ভেঙ্গে পড়েন :

> বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়।
> এ ধন আমার লয় আনজনা ইহা কি পরাণে সয় ॥
> সই কত না রাখিব হিয়া।
> আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া ॥

এই অবমাননা ও উপেক্ষার ব্যথা রাধার পক্ষে সহ্যাতীত। তাই নিদারুণ কষ্টেই রাধা অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করলেন—'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।' সংক্ষিপ্ত, অথচ কত তীব্র এই বাণী অনলংকৃত, অথচ সকল অলংকারকে হারিয়ে দিয়ে পরম বেদনার রাজ্যে মহীয়ান্। এরপর রাধিকার মনে হোল, দোষ তাঁরও নয়, অন্য কারো নয়, সব দোষ অনঙ্গ দেবতার। অনঙ্গ দেবের হাতে নিপীড়িত হচ্ছেন বলেই রাধার এই দুর্দ্দশা। তাই মদনের উদ্দেশ্যে তাঁর উক্তি :

> কতহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
> হাম নহে শঙ্কর হুঁ বরনারী ॥

—মন্মথ দেবতার ধর্মবিচার নেই ; সে নারীর মনের মাঝারে প্রবেশ করে সরম দূরীভূত করে দিয়েছে ; ফলে কালার পীরিতি-শরবিদ্ধ হ'য়ে রাধা যন্ত্রণায় ছফফট করছেন।

শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী ঠিক করলেন—কালাকেই তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করবেন। 'যোগিনী হইয়া যাব দেশে দেশে যেথায় নিঠুর হরি।' সখিদের প্রবোধবাক্যও

তাঁকে এ সঙ্কল্প থেকে বিরত করতে পারল না। শ্রীমতীর প্রেমের প্রবল বেগ যারা উপলব্ধি করতে পারছে না, তারা মূঢ়। তাঁদের কথায় রাধা কোন কান দেবেন না। এখন 'খাইতে শুইতে চিতে, আন নাহি হেরি পথে, বন্ধু বিনে আন নাহি ভয়।' তাই শ্রীমতীর শেষ সঙ্কল্প :

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও ॥
জীয়ন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
পরাণ পুতলি করি, লয়্যাছি মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুন জ্বালি, সকলি পোড়াঞাছি,
জাতি কুল-শীল অভিমান ॥
না জানিয়ে মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে,
না করিয়ে শ্রবণ-গোচরে।
স্রোত বিথার জলে, এ তনু ভাসাঞাছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ (মুরারী গুপ্ত)

—এ কূল হারাণো তো গোকূলে উত্তীর্ণ হওয়ার আশায়। এই-ই তো রাধার মনের চরম কথা।

আক্ষেপানুরাগে রাধার মনের বেদনা তাঁর কল্পিত আশঙ্কার ফলেই সৃষ্ট। কেন না শ্রীকৃষ্ণ এখনও রাধার প্রতি সমভাবে অনুরক্ত। প্রগাঢ় অনুরাগ বশেই শ্রীরাধার হৃদয়ে নানা আশঙ্কার উদয় হচ্ছে। রাধার দুঃখ রাধার মনেরই সৃষ্টি।

কৃষ্ণ রাধার এই কল্পিত দুঃখের উত্তরে বলেছেন :

সুন্দরি, কাহে করসি তুহুঁ খেদ।
তুয়া বিনে রাতি— দিবস হাম না জানিয়ে
কোন্ কমল তুহে ভেদ ॥······
তোহারি নাম গুণ, অবিরত জপি হাম,
সদয় হৃদয় তুয়া চাই ॥······(প্রেমদাস)

নিবেদন

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—"সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম বাঞ্ছিতের পদে শরণাপন্ন হলে তিনই আমাকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত করবেন। বৈষ্ণবদর্শন এই সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করে নতুনতর জীবনবাণী শোনাল! কৃষ্ণভক্তিই যেখানে শেষ কথা, সেখানে মোক্ষের কথা আসে কি করে? বৈষ্ণবের মতে, "মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥' বৈষ্ণব ধর্মে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ রসের সাধনার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণলীলা উপভোগ করাই জীব জগতের চরম ও পরম কর্তব্য। এর মধ্যে মধুর রসের সাধনাই সর্বোৎকৃষ্ট। তার মধ্যে আবার "রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥" তত্ত্ববেত্তাদের মতে—সমস্ত জীব জগৎ ছুটে চলেছে অসীমের পথে সচ্চিদানন্দ, পরম রসঘন বিগ্রহ, পরম বাঞ্ছিত গোলকের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। শ্রীরাধা এই জীব জগতের প্রতীক। অবশ্য পরম বৈষ্ণবের মতে, রাধা কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি। 'রাধা শক্তি কৃষ্ণ শক্তিমান। দুই বস্তুভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ॥" কবিরাজ গোস্বামী আরো বলেছেন:

> মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
> অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥
> রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
> লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

লীলারসের পুষ্টির জন্যেই অদ্বৈত থেকে দ্বৈতের সূচনা। আবার এই দ্বৈত থেকে অদ্বৈতের পথে পরিক্রমণের আলেখ্যই সমগ্র বৈষ্ণব কবিতা। পূর্বরাগ থেকে শুরু হয় দয়িতের উদ্দেশ্যে যাত্রা। অভিসারে গিয়ে আকূতির চরম অভিব্যক্তি দর্শিত হয়।

নিবেদন পর্যায়ে এসে রাধা সর্বসমর্পণ করে দয়িতের কাছে আশ্রয় কামনা করেন। এই যাচ্ঞার ভিতর আছে সর্বসমর্পণের সুখ, বাঞ্ছিতকে প্রাপ্তির আশ্বাস। রাধা দেখেন—এই বিশ্বভুবনে তিনি একা। কৃষ্ণকে তিনি হৃদয়-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন, কিন্তু হারিয়েছেন সমাজ, সংসার, গৃহজন, পরিজন। আজ 'রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে।' নিঠুর কালা কৃষ্ণের

উদ্দেশ্যে রাধা শব্দ করে কাঁদতে পর্যন্ত পারেন না। ফলে—"রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদি।" এত বিঘ্ন বলেই হয়ত কৃষ্ণের জন্য রাধার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'নিবেদন' পর্যায়ে এসে রাধার বক্তব্য: "সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী।' আত্মসমর্পণের দুরন্ত তাগিদে রাধা সমাজ, সংসার, গৃহজন-পরিজন সব ত্যাগ করেছেন; অসহ্য গঞ্জনা সহ্য করেছেন। তবু রাধার দুর্জয় আত্ম-বিশ্বাস:

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

কৃষ্ণ-পিরীতির সুখ-সায়র মাঝে কুলশীল-লাজ-মান সবই ডুবেছে। এর মাঝে শ্রীমতী ভাবছেন কৃষ্ণকে কিছু নিবেদনের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে:

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

রাধার শ্রেষ্ঠ ধন হচ্ছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণকেই কৃষ্ণ দান করবেন—এ অতি রহস্যের কথা! কিম্বা বলা যায়—শক্তি ও শক্তিমান যখন তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয়, তখন দুইয়ের মধ্যেকার ভেদচিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। তখন—"ন সো রমণ ন—হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।" নিবেদনের পদে দেখা গেল, কৃষ্ণপদে নিজেকে একেবারে নিবেদন করে দেওয়াতেই রাধার পরম সার্থকতা। অহৈতুকী ভক্তিই এর মূলকথা।

আবার শ্রীভগবানও ভক্তের আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেন না। এক অর্থে ভগবানও ভক্তের অধীন—প্রেম-ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ। "আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।" কিন্তু ভগবান সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান এই মধুর রসের ভজনায়। 'ঐশ্বর্য শিথিলপ্রেমে নহে মোর প্রীতি।' আর ভক্তকে না হ'লে ভগবানের চলে না। কেন না একাকী লীলা হয় না। ভক্তের কথা—'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর

তোমার প্রেম হোত যে মিছে।' এই প্রেমেরই দুরন্ত আকর্ষণে ভগবান ভক্তের কাছে আসেন। বলেন :

রাই তুমি যে আমার গতি।
তোমারই কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥

ভক্তের কাছে ভগবানের আগমন—ভক্তেরই প্রেম-ভক্তির তীব্রতা সূচিত করে। নিবেদনের পদগুলিতে রাধার সেই গভীরতম হৃদয়াকৃতির বাঙ্ময় প্রকাশ।

মাথুর

নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজমাঝে।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ॥

অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। ঘরে ঘরে অমঙ্গল বার্তা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীরাধা তা বিশ্বাস করেন না—শ্যাম তো তাঁর অন্তর-মন্দিরে অনুরাগের তুলিকাশয্যায় নিদ্রিত। কোন্ পথে বঁধু পলায়ন করবে? "ঐ বুক চিরিয়া বাহির করিব গো তবে তো শ্যাম মধুপুরে যাবে॥" কিন্তু শ্রীমতীর এ আশ্বাস বেশিক্ষণ টিকল না। কর্তব্যের আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন অক্রুরের রথে চড়ে। পিছনে পড়ে রইল সাজানো কুঞ্জবন, ব্রজপুর, গোপগোপী; আর রইলেন শ্রীরাধা। অতল হৃদয়বেদনা-বিমথিত নিশ-জাগরণের পালা চলল তাঁর এখন থেকে। গোকুল-মাণিক হৃত হয়েছে। ফলে—

শূণ ভেল মন্দির শূণ ভেল নগরী।
শূণ ভেল দশ দিশ শূণ ভেল সগরি॥

শূণ্যতার বেদনায় পরিপ্লাবিত দিক্‌দিগন্তের এক কোণে বিরহিনী রাধিকা। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে বিরহিণী, কৃষ্ণ অন্তর্ধানে বিরহিণী। রাধিকার এই হৃদয়-বেদনাই মাথুর পালার উপজীব্য।

বিশ্ব-জগতে রাধিকার আজ কেউ নেই। প্রিয় সমাগমে যৌবন-মধুর দিনগুলি কেটেছে, এখন তার স্মৃতিই শুধু অবলম্বন! কিন্তু 'কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী।' চোখে ঘুম নেই, মুখে হাসি নেই, প্রিয়-সঙ্গ-সুখ-চিহ্ন-টুকুও চলে

গেছে, দুঃখের অমানিশাই আজ তাঁর একমাত্র সঙ্গী। অথচ যে প্রিয় তাকে এমনি করে অবহেলায় ফেলে চলে গেল, তার সঙ্গে মিলনের জন্য রাধিকা কি না করেছেন। প্রতিকূল ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসেই সেই প্রিয় আজ দূরে। গরবিনীর গরব এমনি করেই বুঝি ভূমিস্যাৎ হয়। রাধিকা ক্রন্দন করেন:

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥

প্রিয় তাঁকে ভুলতে পারলেও রাধিকা কি করে তাঁকে ভুলবেন? কিন্তু আশা নিয়েই বা কতদিন কাল কাটবে? নব যৌবনবেদনায় উচ্ছ্বলিত দিনগুলি একে একে চলে গেলে প্রিয়সমাগমের মূল্যই বা কি?

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঁয়ায়লুঁ
কি করব সো পিয়া লেহে॥

বর্ষণ মুখর রাত্রিতে এই বিরহবেদনা আরো উচ্চকিত হয়ে ওঠে। বর্ষণ-মুখর রাত্রির প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বস্তু-নিচয় রাধার হৃদয়বেদনাকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে। বর্ষণমুখর ভরা ভাদ্র, বাজ পড়ছে, তার মধ্যে শূণ্য মন্দিরে একা যামিনী জাগরণে শ্রীরাধা। মত্ত দাদুরি, ময়ূর, বজ্র, বর্ষা—এ সবই উদ্দীপন বিভাব হিসাবে কাজ করছে। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠছে রাধার হৃদয়ের শূণ্যতার বেদনা:

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন খর শর হন্তিয়া॥

সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য এই পদটিতে রাধার হৃদয় বেদনা বিশ্বব্যাপ্ত হয় উঠেছে, অন্যদিকে প্রকাশ পাচ্ছে ভালবাসা-রূপ ঐশ্বর্যের উচ্চকিত ঘোষণা। কিন্তু ব্যর্থ যৌবনবেদনা বহন করে প্রতীক্ষার কাল যে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হতে থাকে। প্রিয় আর আসে না। দিন যেতে যেতে মাস, মাস যেতে যেতে বছর কাটল, বছর-ও এক এক ক'রে কেটে গেল। এখন 'ছোড়লুঁ জীবনক আশা'। অবশেষে সখীর মারফত শ্রীমতী খবর পাঠালেন—

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে মধুপুরে ॥

সেই সঙ্গে ব্রজপুরের সব খবরই পাঠাচ্ছেন—এক নিজের খবর ছাড়া। এখানেই রাধার দুঃখ যে কত নিবিড়—তা বোঝা যায়। নিজের কারণে কৃষ্ণকে তিনি আসতে বলছেন না। কারণ রাধাতো তখন এ জগতে থাকবেন না। শুধু—

দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥
তারে আসি পিয়া যেন দেয় দরশন।

শ্রীরাধার এই মরণে সাধ প্রেমেরই কারণে। কৃষ্ণবিরহে তিনি প্রাণত্যাগে ইচ্ছুক। কিন্তু তার কামনা—

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥

মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে বিলীন দেহ-সুরভি পাবে কৃষ্ণের সংস্পর্শ। তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি।

মাথুর পর্যায়ে কবি-কল্পনার চূড়ান্ত পরিচয়। "মাথুরের বারমাস্যা কবিতাগুলি পদবিন্যাসের মাধুর্যে, ছন্দোবৈচিত্র্যের চাতুর্যে, অলঙ্করণের ঐশ্বর্যে জগতের বিরহ-সাহিত্যে অপূর্ব্ব দান।" এ প্রসঙ্গে মাথুরের সঙ্গে বিরহের পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে। মাথুরও বিরহ-পর্যায়ের। কিন্তু বিশেষ ধরণের বিরহ। কৃষ্ণের মথুরা গমনের পর রাধাহৃদয়ের বেদনার্তির বাঙ্ময় রূপরূপ হোল মাথুর পদগুলি।

আর পদাবলীর সর্বত্রই তো বিরহের ছড়াছড়ি। বলা যায়, পদাবলী বিরহের গীতি আলেখ্য। পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যন্ত চলেছে এই বেদনারই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এমন কি মিলন লগ্নেও বিচ্ছেদ আশঙ্কার বেদনা। আর এই বেদনাময় বলেই তো পদাবলী সাহিত্য এত মধুর। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought". রাধাবিরহ-ই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাণ-স্বরূপ।

ভাবসম্মিলন

অক্রুরের রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ কঠোর কর্তব্যের আহ্বানে মথুরায়—মাধুর্যের জগত থেকে ঐশ্বর্যের জগতে—চলে গেলেন। শ্রীমতী ও গোপীদের তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন—আবার তিনি ফিরে আসবেন। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়—তিনি এলেন না। মথুরার সিংহাসনে আসীন কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-ঝলমল মুহূর্তে ব্রজের কথা হয়ত মনে পড়ত, হয়ত পড়ত না। এদিকে বিরহের তরুণ তাপে সমস্ত ব্রজবাসী ক্ষীয়মান্, মর্মবেদনায় অস্থির। শ্রীরাধার অবস্থা আরো সঙ্গীন্। মেঘ দেখে তাঁর মনে হয় কৃষ্ণ; কৃষ্ণভ্রমে তিনি তমালবৃক্ষ আলিঙ্গন করেন। শ্রীরাধার 'দিনে দিনে খীন তনু হিমে কমলিনী জনু।' বৈষ্ণব কবিদের কাছে এ বেদনা অসহ্য হয়ে উঠল। বাস্তবে মিলন ঘটানো সম্ভব হোল না—তাই তাঁরা করালেন—রাধাকৃষ্ণের মানস-মিলন। এই হচ্ছে ভাবসম্মিলন।

তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলেও মাথুরে পদাবলীর শেষ হতে পারে না। কেননা—'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমা- ॥' লীলার জন্য তাঁরা দুই দেহরূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। লীলার শেষে আবার তাঁরা এক হয়ে গেলেন। ভাবসম্মিলন এই অদ্বয়-তত্ত্বের রূপায়ণ।

এছাড়া, ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডির স্থান নেই। পরলোকে বিশ্বাস ইত্যাদি কারণে ভারতীয়গণ মনে করেন যে, এ-জীবনে দয়িতের সঙ্গে মিলন না হলেও পরলোকে মিলন হবেই। হিন্দুদর্শনের এই বিশ্বাস ভাবসম্মিলনের তত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়।

ভাবসম্মিলনের পদাবলী উপর্যুক্ত তত্ত্বসমূহের রস-প্রকাশ। এখানে নিত্য মিলনের পরমক্ষণে বিরহের ছায়া নেই। "ভাবলোকে বিরহ নাই, সেখানে রাধা-কৃষ্ণের মিলন নিত্যমিলন। কবিরা রসসম্ভোগের জন্য ভাবকে রূপের মাঝারে

অঙ্গ দিয়াছিলেন। এই কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন অন্যভাবে—অরূপ লীলারস-সম্ভোগের জন্য রাধাকৃষ্ণ এই দুইরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, তারপর লীলান্তে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রূপ আবার ভাবের মাঝারে' ছাড়া পাইল—অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ ত্যাগ করিলে সীমা অসীমের মাঝে হারা হইল। বৃন্দাবনের রূপ লীলাই বিরহ, রূপের ভাবে ফিরিয়া যাওয়াই ভাব-সম্মেলন। এই মিলনই নিত্য মিলন। এই মিলনের আনন্দই ভাবসম্মেলনের প্রধান উপজীব্য।"

(পদাবলী সাহিত্য)

ভাবসম্মিলনের পদে তত্ত্ব আছে একথা ঠিক। কিন্তু তত্ত্ব অপেক্ষা কাব্য এখানে অনেক বড়ো। তত্ত্বের কর্পূরখণ্ড কাব্যের পরমান্নকে স্বাদুতর করে তুলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীরাধার অন্তহীন বিরহের সকরুণ বেদনায় অবসানে মানস-মিলনের উল্লাস যখন শত কলাপের বহু বিচিত্র পাখা বিস্তার করে, তখন রসজ্ঞের মন আপনা থেকেই এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্যের নন্দন-কানন-সান্নিধ্য-সুরভির নেশায় মেতে ওঠে। রস চমৎকৃতির এটাইতো লক্ষণ।

সকাল থেকেই সব শুভ বলে মনে হচ্ছে। মাধবের আগমন সংবাদ দ্যোতিত হচ্ছে। কুদিন হয়ত শেষ হোল। এখনও অবশ্য দ্বিধা। কেননা স্পষ্ট প্রমাণ তো পাননি শ্রীরাধা। শুধু 'কপাল কহিয়া গেল।' কিসে বুঝলেন :

চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময় কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥

প্রিয়ার আগমন আভাসে শ্রীমতী এখন ভাবতে বসেছেন—বঁধুয়াকে কি দিয়ে কেমন করে অভ্যর্থনা জানাবেন। স্থির করলেন :

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥

প্রিয় এলে সব কথা, সব উল্লাস যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কিন্তু এত কথা,

এত গানে দেহপ্রাণমন ভরে উঠলেও 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।' বিগত দুঃখের কথা, অধুনাতন উল্লাসের কথা কিছুই তো বলা হোল না। শান্ত অবস্থায়, নিরানন্দ ভাষায় শ্রীমতি বললেন—শুধু গুটিকয়েক কথা :

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥

স্বল্পাক্ষর-সমন্বিত এই উক্তির মধ্য দিয়ে 'বেদনায় প্রাণ মূছিত, দেহ-মন স্তিমিত' শ্রীরাধার তপোক্লিষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ বেশীক্ষণ থাকে না। দীর্ঘদিন পরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের উল্লাসকে কিছুতেই আর হৃদয়ে নিবদ্ধ রাখা যায় না। বিদ্যাপতির রাধা বিশ্বজগৎকে শোনাতে থাকেন :

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

হৃদয়ের গভীরতম স্তর থেকে উত্থিত এই উল্লাসের সমুদ্রে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে সেই মিলনের আনন্দকে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে থাকেন শ্রীমতী। বিধি আজ অনুকূল। তাই আকাশে এক চন্দ্র নয়, লক্ষ চন্দ্র উদিত। পঞ্চবাণ নয়, লক্ষ বাণে বিদ্ধ হ'য়েও এত সুখ! এত আনন্দ!

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

এ উল্লাস ভাবোল্লাস বলেই এত লাখের সমাবেশ। যথার্থ-ই এ সীমাহীন রাজসিক উল্লাস। সুখ বুঝি তাই বিলাস—হৃদয়ের, মনের॥ এই সুখ-বিলাসের অকুণ্ঠ আতিশয্যেই শ্রীরাধা বলেন :

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দির মোর॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন-মুহূর্তে শ্রীরাধিকা বড়ো বেদনায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'এ হিয়া হইতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি।' আধুনিক সমালোচকের দেওয়া ভাব সম্মেলনের ব্যাখ্যা এ প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য : "রাধার হিয়ার ভিতর হইতে শ্যামকে বাহির করিল বৈষ্ণব কবিরাই। ইহাতেই তো বৃন্দাবন লীলা। সমগ্র লীলাবিলাস হিয়ার ভিতর হইতে বহিষ্কারিত হৃদয়ের ধনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। হিয়ার ধনের হিয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার নামই ভাবসম্মেলন।" মিলন-মুহূর্তে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেন :

বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেইখানে লয়ে থোব।

আর এই অদ্বয়তত্ত্বই ভাবসম্মেলনের শেষ কথা।

প্রার্থনা

প্রার্থনা বিষয়ক পদের মধ্য দিয়ে প্রাক্ ও পরচৈতন্য—এই দুই যুগের ভাব-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। প্রাক্-চৈতন্য যুগে মুক্তি বাঞ্ছাই ছিল ভক্তের চরম ও পরম কাম্য। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির জন্য জীবের উৎকণ্ঠার সীমা থাকত না। কিন্তু প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতির কবিতায় দেখি সৃষ্টির মূল রহস্য সম্পর্কে তিনি সচেতন—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥

সুতরাং তিলতুলসী দিয়ে তিনি নিজেকে অর্পণ করেছেন মাধবের পায়ে। তিনি যেন তাঁকে একবার দয়া করেন অর্থাৎ এই ভবসিন্ধু থেকে মুক্তি দেন।

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভব সিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল দেহ এক দীনবন্ধু॥

কিন্তু পরচৈতন্য যুগে জীবের মুক্তিবাঞ্ছা যে কৈতব প্রধান হ'য়ে গেল, তা আগেই বলা হয়েছে। এ যুগে পঞ্চম ও চরম পুরুষার্থ হোল প্রেম। প্রেম সাধনাই ভগবদ্ সাধনা। ভক্তিরস্তু ভজনম্। প্রেমই ভক্তি। এই প্রেম-সাধনার আবার প্রকার ভেদ আছে। রাগাত্মিকা ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি এবং বৈধি ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। গোপীদের মধ্যেই তার বিকাশ। তা সাধনার দ্বারা লব্ধ নয়। একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে রাধাজীবনের রাগাত্মিকা ভক্তি বিকশিত হয়েছিল। জীবের কর্তব্য হচ্ছে গোপীদের অনুগত হ'য়ে রাধাকৃষ্ণ সেবা। একেই বলে রাগানুগ ভজন। রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য উপলব্ধি করাই জীবজগতের একমাত্র কাম্য। ভক্ত-সাধকদের এ জন্য লীলাশুক বলা হয়। নরোত্তম দাসের পদে এই ভাব সুষ্ঠু প্রকাশ লাভ করেছে :

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি।
যোগাইব অধর যুগলে ॥

কবি পরিচিতি

চণ্ডীদাস

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস কয়জন, কোথায় কাঁর জন্মভূমি, তাঁরা প্রাক্‌চৈতন্য কি পরচৈতন্য যুগের ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রাপ্ত বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার এবং তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতি তার্কিকদের কল্পনার বল্গাকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু এ ধরণের বিতর্ককে আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে চাই। আমাদের আলোচ্য—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রসসমৃদ্ধ পদগুলি।

॥ ২ ॥

কিন্তু তাতেও সমস্যার অন্ত নেই। চণ্ডীদাসের পদাবলীর কাব্যমূল্য বিচারে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নিরাশ হ'তে হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির পরম আনন্দে মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। এর কারণ: চণ্ডীদাস যে কবি ছিলেন, তার চেয়েও বড় কথা—তিনি সাধক ছিলেন। আপন পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীন আত্মবিস্মৃত, ভাবমগ্ন, সাধককবি আপন একতারায় তান দিয়ে যে সুর সাধনা করেছেন, তা একান্তভাবে পরম দেবতার পদপ্রান্তে ভক্তি-উপচার। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, পরিবেশের প্রতি উদাসীন হয়ে চণ্ডীদাস যে পদ রচনা করেছেন, সে যেন আপন মনে উচ্চারিত অনলংকৃত অথচ ভাবসমৃদ্ধ বাণী। ভাবের অতি গভীরতম স্তরে অতি সহজেই তাঁর গতায়াত ; কিন্তু বক্তব্য বিষয়কে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত করার প্রতি তাঁর সমান অনাগ্রহ। তিনি যত বড় দ্রষ্টা ছিলেন, তত বড় স্রষ্টা ছিলেন না—চণ্ডীদাস সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকের এ মনোভাব অতি সত্য। কোন গুরু-গম্ভীর তত্ত্ব ও তথ্যের সমারোহ নয়, হৃদয়ের অতি গভীরতম স্তর থেকে উত্থিত বাণীর অনাড়ম্বর প্রকাশেই চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব। এ বাণীও তাঁর সচেতন মনের প্রকাশ নয়, ভাববিহ্বল কবির আসংজ্ঞান মনের উপচে পড়া তরঙ্গ-বিক্ষেপ মাত্র। যেটুকু কূল ছাপিয়ে পড়ল, রস-অনুসন্ধিৎসুকে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে নিপুণ রসিক বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শনের ন্যায় সেই সামান্য

উপকরণ থেকে মূলের ধারণাটি করে নিতে পারবেন। বুঝবেন—চণ্ডীদাস সিন্ধুকে বিন্দুর মধ্যে ধরে দেওয়ার জন্য মহাকবি, চণ্ডীদাস বলার চেয়ে না বলার মহাকবি এ বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব, চণ্ডীদাসের সীমাবদ্ধতা দুই-ই।

চণ্ডীদাস সম্পর্কে আরো বলার আছে। পালাবদ্ধ রসকীর্তনের জন্য চণ্ডীদাসের পদ সংকলন করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ চণ্ডীদাসের কোন পদই সুস্পষ্ট ভাবে কোন রসপর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগের স্তরেই—'বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে যেমতি যোগিনীপারা', মিলনের পরম লগ্নেও অতি সংযত স্বরে দুঃখের কথা কয়ে ওঠে—'দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।' পূর্বরাগের পর্যায়েই আত্মনিবেদনের সুর, কিংবা বিরহের স্তরেও বিরহোত্তীর্ণ অনুভূতি—চণ্ডীদাসের পদে এর বহু দৃষ্টান্ত সহজেই মেলে। এর মূলেও ছিল চণ্ডীদাসের বিশিষ্ট কাব্য ভাবনাটি। চণ্ডীদাসের কবিমনের 'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।' সুতরাং বাইরের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কবিচিত্তকে আকৃষ্ট করবে কি করে! রূপসাগরে ডুব দিয়ে কবি অরূপরতন আশা করেন না। গহন মনের সংগোপন থেকে আত্মবিহ্বল কবি অন্যমনস্কভাবে তুলে আনেন অনুভূতির হীরকখণ্ডটি। অবিন্যস্ত, অপরিশীলিত সে হীরকখণ্ডটি বিদগ্ধ সমাজের অনুপযোগী বলে মনে হলেও তার বহু মূল্যতা অস্বীকার করবে কে? তাই বলি, চণ্ডীদাস সহজতম ভাষার কবি; প্রাণের গভীরতম স্তর থেকে যে জীবনবাণী উদ্ধার করেন তিনি, তাতে উপরিভাগের বৈচিত্র্য ও রূপ-রসের স্পর্শ না থাক, শাশ্বত প্রেম সত্যের গভীরতম পরিচয়টি নিহিত আছে।

চণ্ডীদাসের কাব্য গহনে প্রবেশ করলে পাঠকের তাই আপাতদৃষ্টিতে স্বাদহীন, বৈচিত্র্যহীন লাগে। অবশ্য যে সব পাঠক নিত্যনূতন বৈচিত্র্যের অভিলাষী, আমি তাদের কথা বলছি। বৈদগ্ধ্যের আতশবাজি, অর্থদীপ্তির চোখ-ঝলসানো সমারোহ নাইবা থাক্ চণ্ডীদাসের পদে, তথাপি মহত্তম আবেগের সহজতম প্রকাশে চণ্ডীদাস অনন্য। কঠিনতম ভাবটিকে সহজভাবে বলতে পারার কৃতিত্ব যদি প্রতিভার পরিচয় হয়, চণ্ডীদাস সেই সহজের কবি, সহজিয়া কবি; ধর্মে তিনি যাই হোন না কেন। সহজের সাধনায় চণ্ডীদাসের যে আত্মবিলোপ, তার মধ্যেই চণ্ডীদাসের বিশিষ্ট কাব্য ভাবনা ও তার পরিচয়টি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

চণ্ডীদাস অনেক ক্ষেত্রেই রাধার হৃদয়ের সঙ্গে আপন হৃদয়কে এক করে ফেলেছেন। রাধার হৃদয়বেদনা অনেক ক্ষেত্রে কবিরই হৃদয়-বেদনা। কবি-আত্মার নিষ্কাষিত বেদনার মাধুর্যে যেন গড়া হয়েছে বিষণ্ণ-মলিন রাধার সৌন্দর্য-প্রতিমা। ফলশ্রুতি—চণ্ডীদাসের অনেক পদ আত্মভাবনালীন গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। বৈষ্ণবদর্শনের দিক থেকে বিচারে চণ্ডীদাসের এই কবি-বৈশিষ্ট্য হয়তো সমালোচনার বিষয়বস্তু হ'তে পারে, কিন্তু চণ্ডীদাসের মানস-প্রকরণ এর জন্য দায়ী। নিজেকে হারিয়ে ফেলার মধ্যেই চণ্ডীদাসের সুখ ও আনন্দ। চণ্ডীদাস নিরাসক্ত শিল্পী নন, দূর থেকে লীলাশুকের মত রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য দর্শন করতে করতে কখন নিজেকেই রাধার অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। আধুনিক সমালোচক অনুমান করেছেন—এমন হওয়া সম্ভব হয়েছিল, কারণ চণ্ডীদাসের নিজের জীবনেও ঠিক অনুরূপ বেদনামুখর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল বলে। চণ্ডীদাসের জীবনে রামী সম্পর্কিত সমস্ত কিম্বদন্তী কতদূর সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ জাগা পাঠক মনে স্বাভাবিক। তবুও একথা অনুমান করা সম্ভব যে, চণ্ডীদাসের ব্যক্তিজীবনে কিছু ঘাত-প্রতিঘাত জুটেছিল, যার প্রবল ঢেউ তাঁর কবি-আত্মার রসসাগরে তুফান তুলেছিল। আমাদের মনে হয়, চণ্ডীদাস যে আক্ষেপানুরাগের শ্রেষ্ঠ কবি, তার কারণ, তাঁর কবিমনের ভাবনার বিশেষ গড়ন। বিষাদ ও বেদনার কৃষ্ণপক্ষ মেঘখণ্ড দিয়ে তাঁর মনের আকাশটি গড়া। তাই সে আকাশে যে চিত্রকল্প ফুটে উঠবে, তাতে বিষণ্ণতার স্পর্শ থাকবেই। বিদ্যাপতির কবিভাবনা নির্বিশেষের পথে নয়, সবিশেষের পথে। অর্থাৎ বিশেষ অনুভূতিটিকে রঙে, রসে, চিত্রকল্পে তিনি ফুটিয়ে তুলতে জানেন। কিন্তু চণ্ডীদাস নৈব নৈব চ। অবশ্য, একেবারে যে কোথাও করেন নি, তা বলা ভুল হোল। 'চলে নীল শাড়ি নিঙারি নিঙারি পরাণ সহিত মোর,—এ ধরণের পংক্তি চণ্ডীদাসে মেলে, কিন্তু কদাচিৎ যেন এ ধরণের পংক্তি আকস্মিক ভাবে ছিটকে এসেছে। নইলে চণ্ডীদাস মনেপ্রাণে আত্মবিস্মৃত কবি। অনুভূতির যে স্তরে তিনি পৌছেছেন, সেখানে রূপের বৈচিত্র্য নেই, আছে উপলব্ধির গভীরতম বাণী। গভীরতম সত্যের মর্ম উপলব্ধিতেই চণ্ডীদাস সার্থক।

এতক্ষণ চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে সাধারণ আলোচনা করা হোল, তাতে পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, চণ্ডীদাসের কাব্য-বৈশিষ্ট্যের কোন বৈচিত্র্য আমরা দেখাতে পারিনি, বৈচিত্র্য দেখানো সম্ভব নয় বলেই। চণ্ডীদাসের কাব্যে

উপরি ভাগের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ সমন্বিত বাণী-বৈচিত্র্য নেই, অন্তরতম সত্তার নির্বিশেষ রূপটি নিরাবরণ ভাষায় ধরা দিয়েছে চণ্ডীদাসের কাব্যে। এইটাই চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম কাব্য-বৈশিষ্ট্য।

॥ ৩ ॥

(পূর্বরাগের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলঙ্কারিক বলেন যে, মিলনের পূর্বে নায়ক-নায়িকার দর্শন বা শ্রবণজাত যে রতি রাগ-রূপে মনে উন্মীলিত হয়, তাকে বলে পূর্বরাগ। অর্থাৎ পূর্বরাগ—প্রেমপুষ্পের প্রথম মুকুল বিকশিত হওয়া। চণ্ডীদাসের রচিত পূর্বরাগের পদে, বিশেষ করে রাধিকার পূর্বরাগের পদে, এ ধরণের মাপকাঠি অচল। রাধা প্রথমেই ঘোষণা করছেন :

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

প্রথম শ্রবণেই মরমে ঘা দেয়, প্রাণ আকুল করে তোলে,—এ ঠিক সাধারণ স্তরের পূর্বরাগ নয়। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার পূর্বরাগের আকুলতা প্রকাশিত এতে। তারপর 'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো'—এ উক্তি অনুরাগের সূচনা মাত্র, একথা বলা যায় না। এ যেন 'আমরা দুজন ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে।' সেখানে ব্যক্তিপুরুষটি নয়, তার নামটিই রতিবোধের গভীরতম স্তরে নাড়া দিতে সমর্থ।) হৃদয়ের এই আলোড়নের ফলেই রাধা 'পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।' আপন মনের অনুরাগেই বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে শ্যামের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন রাধা। (কবিতাটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচকের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : "এই কবিতাটিতে প্রথমতঃ নাম শোনার প্রসঙ্গ। সামান্য নায়ক-নায়িকার নাম শুনিয়া প্রেম উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, নামের মাধুর্য—ইহাও ভগবৎ প্রেমের লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, নাম-জপ (মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপঃ)—ইহাও ভগবৎ প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না।")

(পূর্বরাগের আত্যন্তিক আবেশেই রাধা আত্মহারা। প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশ-

দশার বিভিন্ন স্তর পর্যায়ে রাধার দ্রুত উন্নয়ন। সমাজ-সংসার সম্পর্কে তাঁর চেতনা ধীরে ধীরে কমে আসছে। এখন অন্তর-বেদনা-মথিত রাধা :

(বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥)
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।
(বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা ॥)

হৃদয়-মথিত রাগ-বেদনা রাধাকে আবেশে মুগ্ধ করে তুলেছে। রাধার মনোমন্দিরে চলেছে নিত্য কৃষ্ণারতি। মাঝে মাঝে তারই বহিপ্রকাশ দেখা দিচ্ছে রাঙা বাস পরণে, এলায়িত কুন্তলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে, মেঘ পানে দু'হাত তুলে আকুতি জ্ঞাপনে, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণে। রাধা এখন :

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।)
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥

রাধা এখানে আত্মহারা। ফলে পরিজন ও গুরুজনের ভয়, নারীর স্বাভাবিক লজ্জাবৃত্তি তাঁর কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'এখন সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে'। পূর্বরাগের কবিতাকে যেমন বলা হয় আত্মস্বরূপের আচম্বিত জাগরণ, তেমনি এক ধাপ অগ্রসর হ'য়ে বলা যায় আত্মস্বরূপের বিলোপ সাধনায় অগ্রসরের সোপানও বটে।) সে কারণেই রাধার উক্তি— 'কুলের ধরম রাখিতে নারিনু কহিলু সবার আগে।' এখন—'শ্যাম সুনাগর সদাই হিয়ায় জাগে'। শ্যাম নামে অভিষিক্ত হিয়ার মর্মবেদনাটুকুই এখন রাধার সম্বল। রাধার 'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা'। আর সেখানে তো অনুভূতির একচ্ছত্র অধিকার; মন-শতদলের এক একটি দল উন্মোচিত হচ্ছিল, আর চেতনার পরতে পরতে সঞ্চারিত হচ্ছিল অনুভূতির রসে নিষিক্ত তারই স্বপ্ন-মধুর সুষমা।

পরিপূর্ণ প্রেমভারে-আনত-রাধার মর্মবেদনা প্রকাশের স্থান নেই। কেই বা প্রত্যয় করবে তাঁর কথা! অপর দিকে উদ্বেগ ও ভাবাকুলতাকে কিছুতেই মনের

গহনে চেপে রাখতে পারছে না তিনি। ফলে চমকিত চিত্ত, সদা ছল ছল আঁখি নিয়ে, গুরুজনের সামনে দাঁড়ানোর মত ধৈর্য তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। বিশ্ব-সংসার তাঁর কাছে শ্যামময়। কিন্তু যথার্থই যখন শ্যামকে স্থূল চক্ষু দিয়ে দেখলেন, তখন 'সে কথা কাহবার নয়।' কেননা তখন তো রাধা দেহমনের প্রতি অণুপরমাণু দিয়ে উপলব্ধি উপভোগ করছেন, অন্যকে বোঝাবেন কি করে তাঁর অনুভূতি? পূর্বে শ্যামকে বিশ্বময় দেখছিলেন, এখন হিয়ার পালঙ্কে আসীন —'শ্যাম সুনাগর সদাই হিয়ায় জাগে।' ফলে—'কুলের ধরম রাখিতে নারিলু কহিলুঁ সবার আগে।' এখন রাধার এবং কৃষ্ণেরও মনে হয়—অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে ভেসে চলেছেন তাঁর যুগল প্রেমের স্রোতে।

কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনামূলক কয়েকটি কবিতায় দেহাবেশ একেবারে বিসর্জিত হয় নি। রূপদর্শনে পুরুষের অধিকার। কৃষ্ণ রাধার অনিন্দ্য সৌন্দর্য-কান্তি দর্শনে একেবারে আত্মহারা।

থির বিজুরি বরণ গৌরী
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানাড়া ছাঁদে করবী বাঁধে
নব মল্লিকা ফুলে॥

রূপশেল-বিদ্ধ কৃষ্ণ এখন বিকল। তাঁর অনুভূতি:

আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করিল মোরে॥

লক্ষ্য করতে হবে যে, রাধার দেহসৌন্দর্যের জগতেই এখন পর্যন্ত কৃষ্ণের দৃষ্টি নিবদ্ধ। রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি সঞ্চালন, বসনের সামান্য স্থানচ্যুতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। রাধাঅঙ্গের স্থূল বর্ণনার চিত্র এখানে দেখি। কিন্তু তার দু' একটি এমন পংক্তি প্রকাশিত হয়েছে, যার দ্বারা কৃষ্ণের মনোবেদনা সুচিহ্নিত। যেমন:

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

এখানে স্নান শেষে রাধা তাঁর পরিধানের নীল বসন নিঙড়াতে নিঙড়াতে চলছেন, তাতে কৃষ্ণের মনে হচ্ছে—নীল বসন নয়, কৃষ্ণের প্রাণতন্ত্রীকে দলিত করে এগিয়ে চলেছেন রাধা। অনুপম এই কাব্য পংক্তি।

॥ ৪ ॥

চণ্ডীদাসের পদে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে যে, দুঃখের কথা, বেদনার কথা প্রকাশে চণ্ডীদাস মুখর। সুখের কথায় যেন তাঁর অধিকার নেই। বেদনা সমুদ্রের তুফানে হাবুডুবু খেয়ে চণ্ডীদাসের রাধা বেদনার মহনীয়তাকে যেন আরো বহু উচ্চগ্রামে তুলে দিয়েছেন। খণ্ডিতা-শীর্ষক পদগুলি খণ্ডিতা নায়িকার আর্তস্বর ও বঞ্চিত জীবনের হাহাকারে সমুজ্জ্বল। 'খণ্ডিতায় ব্যঙ্গের সূচিকা, রোষের জ্বালা, ঘৃণার আতিশয্য, তিক্ততার চরম।' চণ্ডীদাসের খণ্ডিতার পদে এই বৈশিষ্ট্যগুলি চরম অভিব্যক্তি পেয়েছে। প্রসঙ্গত, বলা চলে—শ্রদ্ধেয় সমালোচক খণ্ডিতার পদগুলি "আমাদের নিষ্কলুষ চণ্ডীদাস বোধের কাছে অবাঞ্ছিত" বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ মন্তব্য অহেতুক বলে আমাদের মনে হয়। কারণ ভালবাসার চেয়ে বড় কিছু রাধার জীবনে নেই। সেই ভালবাসার অনাদর সহ্য করা কি রাধার পক্ষে সম্ভব? খণ্ডিতা নায়িকা রাধার ক্ষোভের উৎস শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ সমীপেই তাঁর বেদন-বিষের জ্বালার উদ্গীরণ।

ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলুঁ
দিন যাবে আজি ভাল ॥

অন্য নারীতে আসক্ত কৃষ্ণকে চরম আঘাত দিচ্ছেন রাধিকা প্রেমেরই কারণে। কৃষ্ণকে ভালবেসেই তাঁর সুখ, আবার সেই ভালোবাসার জন্য তাঁর দুঃখেরও অবধি নেই। সেই দুঃখ-দহনের বিষ-জ্বালা উদ্গীরণ হয়েছে খণ্ডিতার পদগুলিতে। আর বিষবাণ নিক্ষেপেই রাধা চরিত্রের শেষ কথা নয়।

॥ ৫ ॥

আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভা শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন। আক্ষেপানুরাগে রাধা কৃষ্ণের অনাদরে বিস্রস্ত, বিক্ষিপ্ত, বিরহ-হুতাশে কাতর। যে রাগ প্রিয়কে নিত্য নূতন রূপে অনুভব করায়, তা হোল অনুরাগ। এই অনুরাগের বশেই রাধা আক্ষেপ করেন, কৃষ্ণকে পেয়েও যেন তিনি পান নি। তিলমাত্র অদর্শনে তাঁর

বিশ্ব সংসার অন্ধকারও শূন্য মনে হয়। রাধার দিক থেকে কৃষ্ণকে ভালোবাসায় তো কোন ফাঁকি নেই। কুলমর্যাদা, লোকধর্ম, আত্ম-মর্যাদা—সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন রাধা সেই চতুর চূড়ামণির পায়ে। রাধার সব মনপ্রাণ, অনুভূতি কৃষ্ণেই নিবদ্ধ—'সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।' যার জন্য রাধা :

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।

—এত করেও সেই পরম রহস্যের সন্ধান তিনি পান না—'বুঝিতে নারিলু বন্ধু তোমার পিরীতি।' মনচোরার বাঁশীও তথৈবচ। তা সুমধুর স্বর রাধাকে আকুল থেকে আকুলতর করে তোলে। বাঁশীর আকর্ষণে কুলধর্ম কালিন্দীর কালো জলে বিসর্জিত; গৃহকাজে মন নেই; নিশিদিন তুঁষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে মন, তা সত্ত্বেও দশ জনের সামনে হাসি মুখে থাকতে হয়। এর চেয়ে বিড়ম্বনা রাধার জীবনে আর কি আছে? রাধা ভাবেন—বাঁশীই তাঁর কাল—'কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী।'

কিন্তু রাধার মনে হয় যে, এর জন্য দায়ী তিনি স্বয়ং। পিরীতির জ্বালার কথা চিন্তা না করে তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করে বসে আছেন। সুতরাং তিনি কাকে আর দোষ দেবেন?

'সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ ॥'

কিন্তু সুখের আশায়ই তো রাধা এই প্রেম-সরোবরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। যাকে ভেবেছিলেন সুশীতল শান্তির সাগর, সেখানে স্নানে পেলেন গরলের প্রচণ্ড জ্বালা। রাধা অপযশের কালিমা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে লেপন করতেও দ্বিধা করেন নি যাঁর জন্য, আজ সেই রসিক নাগর তাঁকে উপেক্ষা করে অন্যাসক্ত। শ্রীমতি এতে চরম বেদনায় ভেঙে পড়লেন :

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।

এ ধন আমার লয় আনজন
ইহা কি পরাণে সয় ॥
সই, কত না রাখিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া ॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিল
না জানি সেজন কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে ॥

বিশ্বসংসারে রাধা একটি মাত্র অভিশাপ খুঁজে পেলেন—'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।' এই উক্তির মধ্যেই রাধার অন্তরের সুগভীর বেদনামন্থন ও নৈরাশ্যের নিদারুণ শূন্যতাবোধ প্রকাশ পায়। কিন্তু শ্রীমতির প্রেমের তুল্য অন্য কারো প্রেম হ'তে পারে না। শ্রীরাধার :

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি।

এ হেন রাধার দশা যেন স্রোতের শ্যাওলার মত। রাধা নিজেকে দোষারোপ করেন। এমন কোন ব্যথিত নেই, যার স্নেহচ্ছায়ায় রাধা নিরাপদ আশ্রয় যাচ্ঞা করতে পারেন। রাধার মনের দুঃখ বুঝবার কেউ নেই, সান্ত্বনা দেওয়ারও নেই কেউ। মরণেই বুঝি এ জ্বালার উপশম হ'তে পারে। রাধা ব্যথিত চিত্তে আবেদন জানান :

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে ॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদ মুখ ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ্।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥

শেষ পর্যন্ত রাধা সঙ্কল্প করলেন কালাতেই তিনি নিমগ্ন হবেন। কুল ত্যাগ করে অকূলের স্রোতে তিনি গা ভাসিয়েছেন, কালিন্দীর সেই সর্বগ্রাসী কালো জল রাধাকে গ্রাস করে নিতে চায়। তার হাত থেকে অভাগী রাধার পরিত্রাণ নেই, পরিত্রাণ চান-ও না। তিনি ঘোষণা করলেন :

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
দুখানি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥

শ্যাম-সন্নিকটেও তিনি স্পষ্টভাবে মনের কথা জানালেন। শ্যামহারা হয়ে তিনি কিছুতেই বাঁচতে পারবেন না। শ্যামকে নিয়েই তাঁর সুখ, শ্যামকে নিয়েই তাঁর দুঃখ, শ্যামই তাঁর সব্বস্ব। সেই নয়নপুত্তলিকে তিনি আঁচলে বেঁধে রাখবেন, নয়ন ভ'রে দেখে মানস-বাসনা সফল করবেন ; তার চেয়েও বেশী, মনের মণিকুট্টিমে রত্ন-সিংহাসনে চিরদিনের জন্য বসিয়ে রাখবেন :

বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেইখানে লঞা থোব॥

॥ ৬ ॥

'নিবেদন' পর্যায়ে চণ্ডীদাসের রাধা নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পিত করেছেন কৃষ্ণের পায়ে। এতদিন রাধার উক্তিতে কিছু আক্ষেপ, অভিমান, অভিযোগ ছিল। এখন অভিমানের রেশ কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও দেহ, মন, কুল, শীল সঁপে দেওয়ার মধ্যে রাধার নিশ্চিত বিশ্বাসই সূচিত হচ্ছে। প্রতি অণুপরমাণু দিয়ে যে কথা অনুভব করেছেন, মুক্ত কণ্ঠে সে কথা রাধা আজ নিবেদন করছেন :

বঁধু, তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥

—এই আত্মসমর্পণের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। পিরীতি-রসে তনুমন তিনি কৃষ্ণের পায়ে ঢেলে দিয়েছেন, বিধিবদ্ধ কোন ভজন-পূজন তাতে নেই, কিন্তু সচ্চিদানন্দরসঘন বিগ্রহ যেন সেই ঐকান্তিক প্রেমাকৃতির প্রতি কৃপা করেন, কৃষ্ণ জন্মজন্মান্তর যেন প্রাণনাথ রূপে বিরাজ করেন।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

রাধার আজ আর কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধা নেই। তিনি বুঝেছেন যে, 'ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর॥' ধন, জন, জীবন, যৌবন—রাধার নিজস্ব বলতে আর কিছু নেই, সব কিছু কৃষ্ণ-প্রেম-রসের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এখন কৃষ্ণই তাঁর গলার হার। রাধার মনেপ্রাণে কৃষ্ণই তাঁর পতি, কৃষ্ণই তাঁর গতি। এর জন্য রাধা বিশ্বসংসারে সতী, কিম্বা অসতী—কি বলে বিদিত হবেন, তা তিনি জানেন না। জানার জন্য তিলমাত্র আগ্রহ-ও তিনি মনে পোষণ করেন না। উচ্চ কণ্ঠে রাধা ঘোষণা করেন:

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

রাধা জানেন যে, কানুর পিরীতি চন্দনের রীতির মত, ঘর্ষণের মধ্য দিয়েই তার সৌরভ অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়। সেই সৌরভে উন্মত্তা রাধার কাছে 'কানু সে জীবন জাতিপ্রাণধন ও দুটি আঁখির তারা।' সুতরাং সেই পরমপ্রিয় বলে যাঁকে জানেন, তাঁকে কিছু দেওয়ার জন্য রাধার ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কানুকে কিইবা তিনি দিতে পারেন? রাধার শ্রেষ্ঠধন কানু। এখন কানুকেই কানু দান করবেন। আশ্চর্যের কথা!

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

তুমি আমার প্রাণ বঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥

ক্ষতি নেই কিন্তু লাভ আছে। আর তা বহুগুণ বেশী। রাধা-প্রেমের ঐকান্তিক ও গভীরতা প্রকাশক এই উক্তি সহজ, সরল, অথচ অকৃত্রিম ভাব-কল্পনার বাহন। রাধার এই অকৃত্রিম ও গভীরতম প্রেমের আকর্ষণে কৃষ্ণও মুগ্ধ। সেই চতুরচূড়ামণি অবশেষে রাধার প্রেম-বেদনাকে নিজ অন্তরে অভিষিক্ত করে নেন :

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥

॥ বিদ্যাপতি ॥

॥ ১ ॥

বাংলাদেশে বিদ্যাপতির প্রধান পরিচয় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদকর্তা হিসাবে। কিন্তু বিদ্যাপতির আরো একটি পরিচয় আছে, সে পরিচয় যদিও কোন অংশে গৌণ নয়, তা হ'ল বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্যের ব্যাপক ও নিরঙ্কুশ পরিচয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র দিকে ছিল তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহল। কীর্তিলতা, ভূ-পরিক্রমা, লিখনাবলী, দানবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী—ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁর বিচিত্রমুখীন্ প্রতিভার উল্লেখযোগ্য পরিচয়।

॥ ২ ॥

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে : বাঙালী নন এবং বাঙলা ভাষায়ও সাহিত্য রচনা করেন নি, এমন কবিকে আমরা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সাদরে অত উঁচু আসন দিয়েছি কেন? কবি সার্বভৌম ও মহাজন বলেই বা তাঁকে আমরা নিত্য শ্রদ্ধা জানাই কেন? উত্তরে বলা যায় যে, বিদ্যাপতির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্তির কারণ অনেক। প্রথমত, তৎকালীন মিথিলা ও বাংলার মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ঐক্য বর্তমান ছিল; দ্বিতীয়ত, তৎকালীন মিথিলা ও বাংলা—উভয়েই ছিল সংস্কৃতচর্চার পীঠস্থান। সে কারণে মিথিলার ছাত্র বাংলায় এবং বাংলার ছাত্র মিথিলায় গমনাগমন করতেন। ফলে উভয় দেশের মধ্যে একটি আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে। তৃতীয়ত, শ্রীচৈতন্যদেব

বিদ্যাপতির পদাবলী আস্বাদন করে পরম আনন্দলাভ করতেন; চতুর্থত, মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে পরচৈতন্য যুগে বৈষ্ণব সাধক ও রসজ্ঞগণ কর্তৃক বিদ্যাপতি পদাবলীর আস্বাদন; পঞ্চমত, বাঙালী কবি, বিশেষ করে গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতিকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে পদ রচনা করেন। এ কারণে গোবিন্দ 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। বস্তুতঃ বাংলাদেশে বিদ্যাপতি-পদাবলীর নবজন্ম হয়েছে। বিদ্যাপতির পদাবলী যে বাঙালীর আন্তর-নৈকট্য লাভ করেছিল, তার আর একটি কারণ: বিদ্যাপতির পদাবলী ছিল মধুর রসের; আর বাঙালী রসিকচিত্তের প্রবণতা এই মধুর রসের প্রতিই। লক্ষ্য করতে হবে যে, বিদ্যাপতির বাংলাদেশে আদর তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর জন্য; আর তাঁর জন্মভূমি মিথিলায় তিনি নন্দিত তাঁর হরগৌরী বিষয়ক পদ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীর জন্য। বাংলাদেশে যেখানে বৈষ্ণবধর্মে 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার' এবং 'রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি', সেখানে মধুর রসের বাঙ্ময় আলেখ্যকার বিদ্যাপতি যে কেন বন্দিত হবেন, তা সহজেই অনুমেয়।

॥ ৩ ॥

বিদ্যাপতির ধর্মমত নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অন্ত নেই। একদল পণ্ডিত বলেন, তিনি পঞ্চোপাসক হিন্দু ছিলেন। গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা—এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করতেন তিনি। তাছাড়া তিনি ছিলেন স্মার্ত। স্মার্ত-পণ্ডিত বিদ্যাপতি হঠাৎ রাধাকৃষ্ণের পদ লিখতে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে এঁদের যুক্তি: বিদ্যাপতির অন্তরের শিল্পচেতনা তাঁকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রসকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। কোন ধর্মচেতনার দ্বারা আবিষ্ট হ'য়ে নয়, লৌকিক প্রেমচেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণলীলারসাত্মক পদ রচনা ক'রে তাঁর কবি-প্রতিভারই বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়েছেন। আর এই প্রেমকাব্য রচনার পটভূমি হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন রাজসভা-পরিপুষ্ট এক নাগরসভ্যতার পক্ষপুটে আশ্রয়—উগ্র বিলাসকলাকুতূহল উচ্ছৃলতায় পূর্ণ জীবনের বৈদগ্ধ্যসমাকীর্ণ মদিতার নিবিড় স্পর্শ। তাকে আশ্রয় করেই বিদ্যাপতি রচনা করেছেন রাধাকৃষ্ণ পদাবলী—নামান্তরে মর্তপ্রেমের আকর্ষণে যৌবন-বিহ্বল এক নারীর দেহ-দেউলে প্রেম-আরতির বাঙ্ময় রসমন্দির আলেখ্য।

অন্যমতে, "তাঁহার স্বহস্তলিখিত ভাগবতখানি তাঁহার বৈষ্ণব ধর্মে প্রীতির সাক্ষী,—তাঁহার রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস।......তিনি

বাহিরে যাহাই থাকুন, তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণব ধর্মের অনুকূলে ছিল, একথা বোধ হয় দ্বিধাশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে।" (দীনেশচন্দ্র সেন)

স-যুক্তি বিচারে দ্বিতীয় মতটিকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। 'ভাগবত' মহাগ্রন্থখানি কবি তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে স্বহস্তে শুধু শ্রদ্ধাবশেই লিখেছিলেন, এ অনুমান আমরা অবশ্যই করতে পারি। আর রাধাকৃষ্ণপদাবলী তিনি রচনা করেছিলেন, ভক্তির বশে নয়, নিছক কবিপ্রেরণার বশে, এ যুক্তিও যথেষ্ট তথ্যসহ কিনা, পণ্ডিতমহল তা বিচার করবেন। আমাদের বিশ্বাস, বৈষ্ণবচেতনা কবির মনে বর্তমান ছিল। নিছক কবিপ্রেরণা হ'লে একই বিষয়ে কবি এত পদ রচনা করতেন কিনা সন্দেহ। কেননা এটি ধ্রুব সত্য যে, কবিরা সর্বদাই বিষয়ান্তরের অভিলাষী। একই বিষয়ে কবিতা রচনা করে তাঁরা পরিতৃপ্ত থাকতে পারেন না, অন্ততঃ বিদ্যাপতির মতো শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভা তো নয়ই। রাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্ব এর আগেই প্রচলিত ছিল সাধারণের মধ্যে। ভাগবতের লীলাতত্ত্ব কবির জানা ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিষয়েও পণ্ডিত-কবি অবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। এছাড়া কবির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রাজা ভৈরব সিংহ বৈষ্ণব ছিলেন বলে সমালোচক যে উক্তি করেছেন, তাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৈষ্ণব রাজা ভৈরব সিংহের আশ্রিত বিদ্যাপতির উপর তাঁর প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক। সুতরাং নিছক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামলীলা-চিত্র কবি অঙ্কিত করেছেন, এ ধরণের মতবাদ কবির প্রতি নিরপেক্ষ বিচার-প্রসূত নয় বলে মনে হয়। বিদ্যাপতি প্রায় আটশত পদ রচনা করেছেন বলে গবেষক মহলের ধারণা। এই আটশতের মধ্যে পাঁচশত পদ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বলে স্পষ্ট উল্লিখিত। দুইশত পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ না থাকলেও সেই চেতনা উপলব্ধি করা যায়। আর বাকি একশত কবিতা অন্যান্য বিষয়ক। সুতরাং, বৈষ্ণবীয় ভক্তিচেতনা বিদ্যাপতির মানসলোকে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল; আর সেই চেতনা বশেই কবি রাধাকৃষ্ণের পদ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কবি রাধাকৃষ্ণের রূপকে প্রাকৃত কামলীলার চিত্র এঁকেছেন, প্রতিবাদীর এ-যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে, তাহলে রসপর্যায়ের ক্ষেত্রে পরিপাট্য বজায় থাকত বলে মনে হয় না। আর রাধাকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যের বিভিন্ন রসপর্যায়ের অনুসরণে বিদ্যাপতি প্রাকৃত কামলীলার চিত্র এঁকেছেন, এমন কষ্ট কল্পনা না করলেই বোধ হয় বিদ্যাপতির প্রতি সুবিচার করা হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। বৈষ্ণব ধর্মের কথা উঠলেই আমাদের মনে পড়ে পরচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ধর্মের কথা। সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মাপ-কাঠিতেই আমরা বিদ্যাপতির কবিতার রসমূল্য বিচার করতে বসি। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও ভ্রমাত্মক। চৈতন্যোত্তর যুগের মত প্রাক্-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণবধর্মে কোন সুস্পষ্ট সম্প্রদায়গত ভাবনা ছিল বলে জানা যায় না। এ যুগে বৈষ্ণবধর্ম-ভাবনা ছিল অনেকটা স্ব স্ব অনুভূতির জগতে লালিত। চৈতন্য সংস্কৃতির কূল-প্লাবনী বন্যার দ্বারা আদৌ প্লাবিত না হয়েও রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্যকে বাঙ্ময়রূপ দিয়েছেন যাঁরা, মহাকবি বিদ্যাপতি তাঁদের অন্যতম। অন্য দু'জন—বড়ু চণ্ডীদাস ও জয়দেব। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মানদণ্ডে বিদ্যাপতির পদের রসবিচারে অনেক অসামঞ্জস্য দেখা দেওয়া সম্ভব। যেমন, তাঁর প্রার্থনার পদগুলিতে বৈষ্ণব ধর্মবিরোধী আকুতি। কিন্তু প্রাক্-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণবের মুক্তিবাঞ্ছা তো একেবারে অপাংক্তেয় ছিল বলে জানা যায় না। আমাদের বক্তব্য: বিদ্যাপতির মানসে বৈষ্ণব চেতনা ছিল। তবে তা প্রাক্‌চৈতন্য যুগোপযোগী যতটা থাকা সম্ভব, ততটাই।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিদ্যাপতির মনোভঙ্গির উপরিতলে ছাপ পড়েছিল অন্য সংস্কার, অন্য সংস্কৃতির। এই অন্য সংস্কার, অন্য সংস্কৃতির অর্থে রাজসভার অভিজাত শিক্ষাদীক্ষা ও মানস-পরিবেশের কথা বলছি। যে ব্রাহ্মণ বংশে বিদ্যাপতির জন্ম, সে বংশ কয়েক পুরুষ ধরে ছিল মিথিলার রাজ-বংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিদ্যাপতির ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষের প্রথম চারি পুরুষ মিথিলার রাজসভায় উচ্চপদ অধিকার করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির প্র-পিতামহ বেছে নেন শাস্ত্রচর্চা ও যাজনিক ক্রিয়ার পথ। পরবর্তী পুরুষদের সকলেরই কোন-না-কোন সূত্রে মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এরই উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্যাপতিও পেয়েছিলেন মিথিলার রাজবংশের সৌহার্দ্য ও আশ্রয়। শৈশব থেকেই তাই বিদ্যাপতি পরিচিত হয়েছিলেন রাজ-সভাপুষ্ট নাগরিক জীবন-পরিবেশের সঙ্গে। সেখানকার বিলাস-কলা-কুতূহল জীবনের ফেনিলোচ্ছলতা তাঁর মনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে কবি উৎসাহিত হয়েছিলেন নাগর বৈদগ্ধ্য, মার্জিত নৈপুণ্য এবং প্রভূত পাণ্ডিত্য আয়ত্ত করে নিজের ব্যক্তিত্বকে শাণিত করে তুলতে। ব্যক্তিগত জীবনে কবি আপন প্রতি-ভার ছটায় আকৃষ্ট ছ'জন রাজা এবং একজন রাণীর অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। এই সকল

আশ্রয়দাতাদের আদেশে রসিকজনের মনোরঞ্জনের জন্যও তাঁকে অনেক পদ রচনা করতে হয়েছিল, যেমন হয়েছিল অন্যান্য গ্রন্থসমূহ রচনা করতে। ফলে বিদগ্ধ নাগর মনের উপযোগী করে যে পদ রচিত, তাতে উচ্ছলতা থাকা স্বাভাবিক—সে দেহের উচ্ছলতা, মনের উচ্ছলতা। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃতিত্ব এখানেই যে, আদিরসের দুঃস্তর পল্বল-পঙ্কে রাধাহৃদয় যে কমলদল মেলেছিল, তার নিরুপম সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যকলায়। এটা সম্ভব হয়েছিল, একদিকে বিদ্যাপতির চেতন মনে বৈষ্ণবতা বজায় ছিল, অন্যদিকে কবির দায়িত্ব তিনি বিস্মৃত হননি বলে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভারতচন্দ্রের কথা। ভারতচন্দ্রও ছিলেন রাজসভার কবি। তদানীন্তন ক্ষয়িষ্ণু, বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত রুচিময় কৃষ্ণনগর রাজসভার তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। তিনি যুগরুচির তাগিদে বাক্ ও বুদ্ধির চতুরালির দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের গোপন প্রণয়ের ঝরোকা উন্মোচিত করেছেন। নাগর-বৈদগ্ধ্য সেখানেও উপস্থিত। ভারতচন্দ্র তাঁর বৈদগ্ধ্যের আতশবাজিতে পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাব-নিবিড়তা অপেক্ষা বিন্যাস চাতুরির জৌলুস ভারতচন্দ্রের কবিজীবনকে প্রায় সর্বাংশে প্রভাবিত করেছিল। বাগবৈদগ্ধ্য ও ছন্দোকুশলতার বুদ্ধিগম্য পথেই তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর আনাগোনা। এছাড়া চিত্রধর্ম ভারতচন্দ্রের কাব্যের অন্যতম গুণ। ধ্বনির দ্বারা চিত্র রচনার প্রতিভা ভারতচন্দ্রের কুশলতার পরিচায়ক। অন্যদিকে বিদ্যাপতির কাব্যেরও অন্যতম গুণ চিত্রধর্মিতা। তবে তাঁর কাব্যের চিত্রধর্ম অনেক অংশেই চিত্তধর্মে পরিণতি লাভ করেছে। বিদ্যাপতির মনোভঙ্গি ও লিপিকুশলতা ভারতচন্দ্র যেন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

বিদ্যাপতির পদে দেহধর্মের প্রতি যে আকর্ষণ, তা এই পরিবেশ-সঞ্জাত। বিশেষ কোন সম্প্রদায়গত প্রভাব তাঁর উপর পড়লে ফলাফল কি হত বলা যায় না। সে সম্ভাব্য ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে লাভও নেই। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণভক্তি ছিল নিছক ব্যক্তিক। তদুপরি ছিল অভিজাত পরিবেশ। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই, পরোক্ষ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ—মানসবৃন্দাবন অপেক্ষা দেহ-বৃন্দাবনের—আকর্ষণ থেকে কবি দূরে থাকতে পারেননি। আর নিজের মানস-সুন্দরীকে যদি রাধাসুন্দরীতে রূপায়িত করে থাকেন, তাহলেই বা ক্ষতি কি? দেহধর্মকে কবি অস্বীকার করেন নি—যেহেতু দেহকে অতিক্রম করে যাওয়ার সামর্থ তাঁর ছিল বলে। যেহেতু প্রত্যেক কবিরই মানস-প্রতিমা থেকে থাকেন,

আমাদের কবিও তার ব্যতিক্রম নন। তাছাড়া বৈষ্ণবধর্ম জীবনকে অস্বীকার করে নয়। বৈষ্ণব কবি 'কান্তপ্রেম'কে 'রাধাকান্তপ্রেমে' পরিণত করেছেন। লৌকিক প্রেমই তো অলৌকিক প্রেমে রসোত্তীর্ণ হ'য়ে রাধার হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যের আভাস দান করেছে। অতএব, মূলে যে চেতনাই থাক, পরিণতির যে বিশিষ্ট-রূপটি আমাদের সামনে ধরা পড়েছে, তাই-তো বিচার্য। কোরক নয়, প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্যই আমাদের অধিকতর কাম্য।

আমাদের এতক্ষণের বিস্তারিত আলোচনার কিছু সারসংক্ষেপ করা যাক্। আমরা বলেছি, বিদ্যাপতির পদরচনার মূলে স্বাভাবিক বৈষ্ণবচেতনা বর্তমান। কিন্তু নিছক বৈষ্ণবচেতনার বশবর্তী হ'য়ে কবি পদাবলী রচনা করতে বসেননি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অতুলনীয় কবিপ্রতিভা। আর রাজসভার কবি বিদ্যাপতি দেহকে অস্বীকার করেননি। দেহরহস্যকে অবলম্বন করে তিনি যে সৌন্দর্যলোকের পরিচয় দিয়েছেন, তা কেবল দেহের সীমায় আবদ্ধ থাকেনি। তা লৌকিকের সীমা পার হ'য়ে আনাগোনা করেছে অলৌকিকের রাজ্যে, আধ্যাত্মিকতার সুষমাস্বর্গে।

॥ ৪ ॥

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বিদ্যাপতির কবিত্বমুকুল বিকশিত হয়েছিল রাজসভাপুষ্ট নাগরসভ্যতাজাত মনোলোকে। এই রাজসভাজাত মনোভঙ্গি তাঁর অন্তরে স্বাঙ্গীকৃতি লাভ করেছিল। এর ফলে শুধু সৌন্দর্যরসপিপাসাই নয়, বোধের সচেতন প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকের ভাষায়, বিদ্যাপতির 'দৃষ্টিভঙ্গিতে রসপিপাসার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কৌতুহলও' যুক্ত হয়েছে। সেজন্যই তাঁর পদাবলীতে মানবজীবনউত্তাপ অতি সহজেই মেলে। বয়ঃসন্ধির পদগুলিতেই আমাদের কবির এই দৃষ্টিক্ষুধা ও জীবনতৃষ্ণা অধিকতর প্রত্যক্ষ। আধ্যাত্মিকতার পথে অভিনিবিষ্ট পদপাত করতে গেলেও বিদ্যাপতির পক্ষে এই মানবিক জীবনতৃষ্ণাকে এড়ানো সম্ভব ছিল না। কারণ বিদ্যাপতি ছিলেন 'সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসের কবি'। আর শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় বিদ্যাপতি জয়দেবকে অনুসরণ করেছেন। জয়দেবের মত তিনিও বিলাসকলা-কুতূহল কবি; তাই তিনি 'অভিনব জয়দেব।' জয়দেব প্রেমের উচ্ছলতার প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট; তাঁর কাব্যে ছন্দের নূপুর-নিক্কণে যে সুর উচ্ছ্বসিত. তা অতিগভীর হৃদয়াবেগ প্রসূত নয়, উজ্জ্বল উচ্ছল প্রেমবিলাস। এদিক থেকে বিদ্যাপতি জয়দেবের কিয়ৎ-

অনুপন্থী। অবশ্য বিদ্যাপতির কাব্যে আরো কিছু আছে। বিদ্যাপতি গুরুতেই চণ্ডীদাসের মত আধ্যাত্মিক কবি নন, তাঁর পক্ষে হওয়া সম্ভব ছিল না। মানবিক পরিবেশজাত দৃষ্টিক্ষুধার বশবর্তী হ'য়ে জীবনরহস্যের অলিতে-গলিতে বিচরণ করেছেন তিনি। বিদ্যাপতি রাধাকমলিনীর তিল তিল আহৃত সৌন্দর্য-সুষমা উপমার সাহায্যে ধরে রাখতে চান। আবার বৈষ্ণব দৃষ্টিতে, বিদ্যাপতি তো নিছক লৌকিক কবি নন, তিনি গোপী-অনুগতও বটে। সুতরাং রাধার রূপ-বর্ণনার দায়িত্ব ও অধিকার তাঁর আছে।

॥ ৫ ॥

এবার বিদ্যাপতির কাব্যগহনে প্রবেশ করা যাক্। বয়ঃসন্ধি পদে রাধার শৈশব ও যৌবন—এই দুইয়ের সন্ধিক্ষণ বর্ণনায় বিদ্যাপতির কবিত্বশক্তির অতি-বড় পরিচয়! দেহ ও মন—উভয় রাজ্যেই কবিপ্রতিভা পদার্পণ করেছে। একটি উদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া যাক্—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ করহু উঘারি॥
অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।…

শৈশব ও যৌবনের দ্বন্দ্বের মধ্যে এখনো শৈশবের প্রাধান্য। অধিকন্তু, যৌবনের দেহলক্ষণও পরিস্ফুট। আর একটি পদ :

খণে খণে নয়ন কোণ অনুসরই।
খণে খণে বসন ধূলি তনু ভরই॥
খণে খণে দশন ছটাছুট হাস।
খণে খণে অধর আগে করু বাস॥
চউকি চলয়ে খণে খণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠে পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।
খণে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর॥

এখানে রাধিকার শৈশব ও যৌবন—দুইয়েরই দেহে অধিষ্ঠান লক্ষণীয়। শৈশবসুলভ চপলতা দেহে বর্তমান, কিন্তু যৌবন উষার আবির্ভাবটিও চাপা

পড়েনি। 'হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর'—কথায় তার ব্যঞ্জনা। এই যৌবন সমাগমের অরুণ-আভাস আর একটি পদে ব্যঞ্জিত হ'য়ে রাধার মনের পরিবর্তনকে সূচিত করছে। নবোদ্ভিন্নযৌবনা রাধা এখন রসকথা শুনতে বিশেষ উদ্গ্রীব :

শুনইতে রসকথা থাপয় চিত।
জইসে কুরঙ্গিনী শুনয়ে সঙ্গীত॥

নবযৌবন সমাগমে রাধার এই যে নবচেতনা, তা একদিকে মনস্তত্ত্বসম্পন্ন, অন্যদিকে অলঙ্কারমণ্ডিত ও কাব্যরসান্বিত। রবীন্দ্রনাথ রাধার এই বয়ঃসন্ধিক্ষণের বিশ্লেষণ করেছেন বিশ্বকবির উপযুক্ত ভাষায় : "বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত, বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।······আপনাকে আধখানা প্রকাশ, আধখানা গোপন,······বিদ্যাপতির রাধা নবীনা, লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটু মাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।······ যৌবন, সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে,—তখন সকলই রহস্য পরিপূর্ণ। সদ্যবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে ; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না···!" বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতি কথার ছবি এঁকেছেন। শৈশব অপস্রয়মান, যৌবন সমাগত—এই বিচিত্র পরিবেশে সৃষ্টি হ'ল দুইয়ের বৈপরীত্য—'দুহুঁ দল বলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল'। এমন অবস্থায়—"খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ। হেরত ন হেরত সহচরী মাঝ॥" কারণ—'দিনে দিনে বাঢ়য় পীড়য় অনঙ্গ।" বয়ঃসন্ধির এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্যচ্ছটা। এখন শ্রীরাধার :

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়এ ন পার॥

বয়ঃসন্ধির পদে রাধার রূপ ও যৌবনের যে চিত্র বিদ্যাপতি এঁকেছেন, তার মধ্য দিয়ে রাধা-কমলিনীর বিচিত্র হৃদয়-স্বরূপটিও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অনঙ্গের আবির্ভাবে হৃদয়ের জাগরণ সূচিত হয়েছে, রূপচেতনার সুখোল্লাসে বিভোর রাধা প্রবেশ করলেন পূর্বরাগের—প্রথম প্রেমোপলব্ধির—জগতে। এখান থেকে শুরু হোল রাধার জীবনের নতুন অধ্যায়।

॥ ৬ ॥

বয়ঃসন্ধির পদে লক্ষ্য করা গেছে—বাহ্য সৌন্দর্যের প্রতি কবির আকর্ষণ যথেষ্ট। পূর্বরাগ পর্যায়ে এসে এই বাহ্য সৌন্দর্যের রূপাঙ্কণ সোৎসাহ সমর্থন পেয়েছে। রূপমুগ্ধতা ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এই পূবরাগ পর্যায়েই বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের পার্থক্য অতি সহজে দৃষ্ট। যেখানে দেহরূপ বর্ণনার প্রশ্ন, সেখানে বিদ্যাপতি 'শতহস্ত', কবিজনোচিত উল্লাসে 'আটখানা'। কিন্তু যেখানে রূপ নয়, স্বরূপ বর্ণনার প্রশ্ন, সেখানে বিদ্যাপতি ঈষৎ ম্রিয়মান। স্বরূপ বর্ণনার কবি বিদ্যাপতি নন, সে কবি চণ্ডীদাস। নিজস্ব ক্ষেত্রে বর্ণন শক্তির উৎকর্ষ প্রমাণের জন্য বিদ্যাপতি উপজীব্য করেছেন শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগকে; কারণ পুরুষের দৃষ্টিতে নারীরূপ অঙ্কনেই আমাদের কবির কৃতিত্ব সমধিক প্রকাশমান। এই বিষয়ক পদের বর্ণনায় বিদ্যাপতি রূপ-চিত্রণ দক্ষতা, রসসৃষ্টি, হৃদয় চেতনার উন্মোচন, সম্ভোগেচ্ছা ও ঈষৎ প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিয়েছেন।

অনেক পরে স্থূলত্ব প্রকাশ পেলেও রসসিদ্ধিও যে অনেক পদে ঘটেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। ভালো ও মন্দ—দুই জাতের বর্ণনাতেই বিদ্যাপতির অধিকার। আমাদের বিচারের সময় মন্দ পদের জন্য শুধু বিদ্যাপতিকে 'দুয়ো' দিলে চলবে না, অনেক উৎকৃষ্ট পদের জন্য তাঁকে 'বাহবা'ও দিতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক :

জব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহর ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি॥

গোধূলিবেলায় শ্রীরাধা মন্দির (গৃহ) থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখে মনে হ'ল, যেন নবীন মেঘ ও বিদ্যুৎ দ্বন্দ্ব বিস্তার করে গেল। এখানে আলো ও অন্ধকার, মেঘ ও বিদ্যুতের দ্বন্দ্বমূলক চিত্রকল্পের সাহায্যে শ্রীরাধিকার যে রূপসৌন্দর্য বিদ্যাপতি আঁকলেন, তা কবিপ্রতিভার বিশেষ পরিচয় বহন করে। আর একটি চিত্র : 'মেঘমাল সঞে তড়িত লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।' শ্রীরাধা নয়—বিদ্যুল্লতা, তাকে এক পলক দর্শনজাত অনুভূতি কৃষ্ণের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হোল। কৃষ্ণ যেন মরণাহত হ'য়ে পড়লেন—মৃত্যুবাণে নয়,

রূপবাণে। কিন্তু হৃদয়বুঝি পরিপূর্ণ বিদ্ধ হয়নি, কারণ তখনও তো 'হেরি হেরি ন পূরল আশা', তখনও রাধারূপ নিরীক্ষণ করেছেন তিনি :

আধ আঁচর খসি আধ বদন হাসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥

রাধার রূপসাগরে মনপবনের নৌকা ভাসিয়েছেন কৃষ্ণ। এ সময় তাঁর রূপ-দর্শন স্পৃহার মধ্যে ছিল দেহকামনার স্থূল অবলেব ; দেহের 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ' ; কামনার বসন্ত বাতাসে উদ্দীপিত হয়েছে কৃষ্ণের যৌবন-জ্বালা। কিন্তু দেহকামনাই সব নয়, অসীম সৌন্দর্যাকৃতিও তাঁর হৃদয়ে নিবদ্ধ, তার প্রমাণ আছে :

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ॥···
যঁহা যঁহা নয়ন বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল পরকাশ॥

এখানে যে সৌন্দর্য-ছবি প্রকাশিত, তাতে দেহকে অতিক্রম ক'রে অনঙ্গের সূক্ষ্ম রসরূপায়ন চিত্র প্রতিফলিত।

এরপর শ্রীরাধার পূর্বরাগ। এই জাতীয় পদে বিদ্যাপতি বিশেষ উৎকর্ষ দেখাতে পারেন নি। এর কারণস্বরূপ বলা যায়—প্রেমের প্রথম অবস্থায় নারীমনের অনুভূতির তত প্রখর প্রকাশ থাকে না। কারণ নারীর 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'। তবুও মহাকবির তীক্ষ্ণ অনুভূতির সামান্য প্রকাশ-ও অসামান্য তাৎপর্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। এ ধরণের একটি পদের উল্লেখ করা যাক :

অবনত হাম কয় হমে রহলিহু
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবয় ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥

তত্‌হু সঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধয়ল চরণ রাখি।
মধুক মাতল উড়য় ন পারয়
তইঅও পারয় পাখী॥

ভীরু লজ্জাবনত অথচ প্রেমবিদ্ধ শ্রীরাধার অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর চিত্র এটি। প্রথম প্রেমের লজ্জারুণ ভাবের আভাস ও তার পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রাধা-হৃদয়-শতদল-পদ্মের পাপড়ি একটি একটি করে উন্মোচিত হচ্ছে। যৌবন দেবতা অকস্মাৎ সাড়া জাগিয়েছে রাধার দেহে ও মনে। তারই ইঙ্গিত স্বরূপ :

তনু পসেবে পসাহনি ভাসলি
তইসন পুলক জাগু।
চুণি চুণি ভয়ে কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলয়া ভাগু॥

এই অনঙ্গ দেবতাই রাধাকে চতুরা করে তুলেছে। তাই বুদ্ধিবলে যে কোন উপায়েই হোক, তিনি কৃষ্ণদর্শন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নেন। প্রেমের বিঘ্নসঙ্কুল বিচিত্রপথে রাধা এখন অনেকটা অগ্রসর :

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈসনে হেরব বয়ান॥
সখিহে, অপরূব চাতুরী গোরি।
সবজন তেজি অগুসরি সঙ্করি
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুণি চুণি সঞ্চর
শ্যাম দরশ ধনী লেল॥

॥ ৭ ॥

শ্রীরাধা এখন যৌবনবতী, প্রেমবিষয়ে বেশ সজাগ। নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়েছে : দেহ-ভূধর কামনায় থরো থরো, ফুলে ফুলে উঠছে আবেগ-তরঙ্গ, আকুল-পাগল-পারা হৃদয় প্রেমসিন্ধুর দুর্বার স্রোতে ভেসে যেতে যায়। রাধার সাধ্য কি, স্থির থাকে ? যে দয়িতের উদ্দেশ্যে দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করা যায়, তাকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি কোথায় ? আর সেই অসীমের, সেই পরমের উদ্দেশ্যে যাত্রার পথও তো দূর-দুর্গম। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত—কোন ভেদ নেই, দূর-দুর্গম পথে বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে গমনের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় একদিকে প্রেমের গভীরত্ব, অন্যদিকে প্রেমিকের আকর্ষণের অতি গাঢ়তর আস্বাদ্যমানত্ব। এ পথও সামান্য নয়। সামান্য, সরল পথে সেই পরমকে পাওয়া যায় না—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। নব অনুরাগে যার হৃদয় উন্মত্ত, কোন বাধাকেই আর সে বাধা মনে করে না।—

নব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নাহি মান॥

রাধার অভিসারের কষ্ট কি একটি ? পথের কষ্ট তো আছেই ! তারো আগে আছে—প্রিয়ের অদর্শনজনিত কষ্ট, সমাজ-সংসারের বাধাজনিত কষ্ট। কিন্তু রাধা কোন বাধাকেই আজ আমল দেন না। হৃদয়ের গহনে যাঁর প্রেমের আগুন জ্বলছে, সমাজের বাধা, গুরুজনের বাধার খড়কুটো তাঁর কি করবে ?—

সখি হে আজ যাওব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর না মানব
বচন চুকব নহী।

এখন শ্রীরাধা—'কুলবতী ধরম করম ভয় অব সব গুরু-মন্দির চলু রাখি।' ভয় তিরোহিত, লোকলজ্জা অন্তর্হিত। এখন রাধার অন্য চিন্তা, অন্য ভাবনা। এখন তার—'অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই কাঁপই নীল নিচোল।'

অনাস্বাদিত মধুর মিলন-পুলকের কল্পনায় কম্পমান রাধার তনু লজ্জারুণ। প্রেমের দুরন্ত আকর্ষণে রাধার দুর্গম পথে অভিসার :

বরিস পয়োধর ধরণী বারি ভর
রয়নি মহাভয় ভীমা।
তইও চললি ধনি তুঅ গুণ মনে গণি
তসু সাহস নাহি সীমা॥

শ্রীরাধার প্রেমাবেগের চূড়ান্ত পরিচয় অভিসারের পদে। আর বিদ্যাপতি এই অভিসার বর্ণনায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য—অভিসারের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতি এ শ্রেণীর পদ রচনায় 'দ্বিতীয় গোবিন্দ দাস'। তবে এ তুলনা—গুরু ও শিষ্যের মধ্যে। নচেৎ অভিসার বর্ণনায় বলতে গেলে—অন্যান্যদের তুলনায় এই দুজনেরই কৃতিত্ব।

॥ ৮ ॥

কিন্তু বিরহের পদে বিদ্যাপতি কবিপ্রতিভার বিজয়-বৈজয়ন্তি উড়িয়েছেন। বিরহের বর্ণনাতে বিদ্যাপতি অতুলনীয় কবিকল্পনার রাজসিক ঐশ্বর্যে মহীয়ান্ করে তুলেছেন পদগুলিকে। শ্রীরাধার বিরহ বিদ্যাপতির পদে ব্যক্তিক অনুভূতির ক্ষেত্রে সীমায়িত হয়ে থাকেনি, পরম বেদনার শিল্প-সমুন্নত প্রকাশে বিশ্বজগৎকে সোচ্চারে ঘোষণা করেছে। বিদ্যাপতির মিলনে সুখ, বিরহে দুঃখ—দু'টিই চরম পর্যায়ের। অপর দিকে চণ্ডীদাসের পক্ষে—'সুখ দুখ দুটি ভাই। সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাই॥' কিন্তু বিদ্যাপতির পদে সুখ দুঃখের বিপরীত কোটিতে অবস্থান করে। বিদ্যাপতির রাধা দুঃখের বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েন, আবার সুখের অভ্যাগমে তাঁর শতধা উল্লাস ছল্‌কে উঠে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বপটভূমিকায়। বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বিরহবেদনাকে "সৃষ্টির আগুন জ্বলা-বিরহ" নামে যে শ্রদ্ধেয় সমালোচক আখ্যাত করেছেন, তাঁর সূক্ষ্ম রসদৃষ্টির বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। বিরহে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। বিরহের অনুভূতিতে এত ব্যাপ্তি, এত গভীরতা আর কোন্ বৈষ্ণব কবির পদে আছে? জানি, খড়্গ-হস্ত পাঠক হয়ত সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম করবেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের নাম স্মরণে রেখেও আমরা বলি, বিরহের পদে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। চণ্ডীদাস মিলনকেও যেমন অনুল্লাসের দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন, বিরহের

বেদনাও তাঁর কাছে তত উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বিদ্যাপতির পদে বিরহের বিশ্বব্যাপ্ত বেদনার তরঙ্গে দোলায়িত রাধার মর্মযাতনা অতি গভীর, অতি তীক্ষ্ণ, অতি করুণ।—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূণ্য মন্দির মোর॥

কিন্তু এই তীব্র বেদনার মুহূর্তেও বিদ্যাপতির রাধার আত্ম-সচেতনতা একেবারে লোপ পায়নি, যেমন পেয়েছে চণ্ডীদাসের রাধার। 'কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হন্তিয়া।' আমার দুঃখ!—এই আত্মসচেতনতার অনন্যসুলভ গৌরবেই বিদ্যাপতির রাধা মহিমময়ী।

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গমাওব
কি করব সো পিয়া লেহে॥

অথচ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের সুখকে পূর্ণ করে তুলতে রাধার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশ্লেষে সামান্যতম ব্যবধান-ও অসহ্য রাধার। মিলনের নিবিড়ত্বের কারণেই রাধা অঙ্গে বস্ত্র, হার, এমন কি চন্দন পর্যন্ত পরেন নি। তবু প্রিয় আজ নদী-গিরির ব্যবধানে দূরন্তর দেশে :

চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥

প্রিয়তমের ভালোবাসার গরবে গরবিনী রাই একদিন 'কাহুকন গণলা।' কিন্তু আজ বুঝি তার প্রতিফলস্বরূপই যেন বক্ষে প্রিয়-বিরহ-বেদনা শেলসম বিদ্ধ হচ্ছে। 'আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা। পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥' প্রিয় তাঁর জন্য সামান্যতম ভালোবাসাও যেন রেখে যায়নি। 'সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা।' রাইকমলিনীর এই মর্মবেদনার মূল্য আজ কে দেবে? অন্যদিকে আবার যৌবন-মধুর-দিনগুলি একে একে অতিবাহিত হচ্ছে প্রিয়বিহনে। যৌবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরেছে, বসন্তের মদির বাতাসে ভূতলে নুয়ে পড়ার অপেক্ষা; কিন্তু আহরণে সার্থক করে

তুলবার মত কেউ নেই। এমন অবস্থায় যৌবন আর রবে কতদিন? প্রিয় বিহনে সে যৌবনের মূল্যই বা কি? যেমন—

সরসিজ বিনু সর   সর বিনু সরসিজ
কি সরসিজ বিনু সূরে।
যৌবন বিনু তন   তন বিনু যৌবন
কি যৌবন পিয় দূরে॥

এই কারণে রাধা পরিধেয় অলঙ্কার ইত্যাদি সব ত্যাগ করতে চান। কেন না, প্রিয় সমাগমে যৌবন ধন্য না হ'লে সাজসজ্জার মূল্যই বা কি? তাই প্রিয় যখন কাছে নেই, তখন;

শঙ্খ কর চূর   বসন কর দূর
তোড়হ গজমোতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল   কি কাজ সিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ভার রে।

কিন্তু বসনভূষণ সব ত্যাগ করেও তো রাধা বিরহবেদনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান না। কৃষ্ণই তাঁর জপ, কৃষ্ণই তাঁর তপ। অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করতে করতে কখন যেন রাধা নিজেই কৃষ্ণভাবে ভাবিত হ'য়ে গেছেন এবং রাধার জন্য বেদনা অনুভব করছেন:

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিসরল
আপন গুণ লুবুধাঈ॥

পরবর্তীকালে পরমকরুণাঘন শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনে রাধার এই ভাবটি মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছিল।

॥ ৯ ॥

ভাবসম্মেলনের পদেও বিদ্যাপতি অতুলনীয় কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতি সচেতন শিল্পী। ভাবদেহকে রঙে, রসে, অলঙ্কারে যথাযথ রূপে মণ্ডিত করে পরম রমণীয় করে তুলতে তিনি সুদক্ষ। এর পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। ভাবসম্মেলনের পদে বিদ্যাপতির কবিকৃতি নতুনতর প্রতিষ্ঠা পেল।

ভাবোল্লাসের নিবিড় আনন্দস্বাদ পরিপূর্ণ রসরূপ নিয়ে তাঁর পদে উপস্থিত। বিরহের পদ আলোচনাকালে আমরা বিদ্যাপতির রাধার মিলনে অপরিসীম উল্লাসের কথা উল্লেখ করেছি। বিরহে রাই ডুকরে কেঁদে উঠেছিল—'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।' ভাবসম্মিলনে সে দুঃখ রাধার মন থেকে একেবারে মুছে গেছে। এখন রাধার কথা :

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

মাধবের সঙ্গে মিলনের আনন্দ জগৎ সমক্ষে ঘোষণা না করা পর্যন্ত রাধার স্বস্তি নাই। বিশ্বজগৎ শুনুক ও জানুক যে, রাধার আনন্দের সীমা নাই। রাইকমলিনীর মিলনোল্লাসে বিশ্বজগৎ প্লাবিত হয়ে গেছে :

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

কোন দিক দিয়েই রাধার মনে দুঃখের লেশমাত্র নেই। আকাশে-বাতাসে এ কার অশ্রুত ললিত কলগুঞ্জন? রাধাহৃদয়ের আনন্দমণির পরশে সমস্ত বিশ্বজগৎ তাহ'লে জেগে উঠেছে! আকাশে লক্ষ চন্দ্রের কিরণোচ্ছ্বাস! বৃক্ষদেশে লক্ষ কোকিলের কলনাদ! রাধার এত সুখ, এত আনন্দ! 'ধনি ধনি তুয়া নব লেহা।'—

সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে স্বতোৎসারিত এই বাঙ্ময় অনুভূতির ঢেউ রঙে ও রসে হৃদয়কে অতি সহজেই দোলা দিয়ে যায়। লাখ-লাখের সমাবেশে যে অতিশয়োক্তির উল্লেখ, তার দ্বারাই বিদ্যাপতির কবিকৃতির যথার্থ লক্ষণটি আর একবার আমরা চিনে নিতে পারি। বিদ্যাপতি রূপের কবি, রসের কবি—ভাবোল্লাসের পদে সেই অসামান্য কবিকৃতির আর একবার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে। বলাবাহুল্য, বিদ্যাপতি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাবসম্মেলনের পদে বিদ্যাপতি অতুলনীয়!

॥ ১০ ॥

এর পর প্রার্থনার পদ। বাংলাদেশে বিদ্যাপতি প্রার্থনা বিষয়ক তিনটি পদ সবিশেষ পরিচিত। এই তিনটি পদ প্রাক্চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবের মুক্তি-বাঞ্ছারূপে দ্যোতিত হয়ে থাকে; ফলে এর কাব্যমূল্য হয়েছে উপেক্ষিত। কিন্তু কাব্যমূল্যের দিক থেকে একে আমরা একেবারে নস্যাৎ করতে পারি না। ব্যক্তিজীবনের নৈরাশ্য ও বেদনার প্রতিফলনে সমুজ্জ্বল এই পদগুলি। নাগরিক পরিবেশের বিলাসোচ্ছল প্রমত্ততায় বিদ্যাপতির ভোগজীবন কেটেছে, জীবনের অপরাহ্ন বেলায় এসে তিনি অনুশোচনার তুষানলে জ্বলছেন—'নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলুঁ তোহে ভজব কোন বেলা।' মেঘে মেঘে বয়সের বেলা অনেক বেড়েছে, এখন পরকালের হিসাব-নিকাশের সময় এসেছে। তাই মাধবের কাছে কবির একান্ত মিনতি:

দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।

এতদিন কবি 'অমৃত তেজি কিএ হলাহল পিয়ালুঁ।' এখন শেষ সমনের ভয়ে বিদ্যাপতি মাধবেরই পদপ্রান্তে আশ্রয় যাচ্ঞা করেন:

ভনই বিদ্যাপতি শেষ সমন ভয়
তুঅ বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
অব তারণ ভার তোহারা॥

মাধবে একান্ত বিশ্বস্ততা ও পরম প্রশান্তির সুরে মেদুর এই পদগুলি রসমধুরও বটে। একদিকে আত্মবেদনার প্রকাশ, অন্যদিকে ভক্তহৃদয়ের পরম ঐকান্তিকতা সমুজ্জ্বল রূপ লাভ করেছে। হৃদয়ের আক্ষেপের, অতৃপ্তির, নৈরাশ্যের রসাশ্রিত বাণীরূপ দানে বিদ্যাপতি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

জ্ঞানদাস

কোনও বিশিষ্ট তত্ত্বভাবনাকে কাব্যাকারে প্রকাশ করতে গেলে দু'ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমে দরকার সেই তত্ত্বটির যথাযথ উপলব্ধি; দ্বিতীয়ত, তত্ত্বকে রসাশ্রিত কবিতাকারে প্রকাশের জন্য সৃষ্টির যাদুদণ্ডপ্রতিভা। সত্য বটে,

বৈষ্ণবপদাবলী কাব্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণব-সাধক-কবিগণ বৈষ্ণবতত্ত্ব-কথাকেই বাঙময় রসরূপে ভক্তিঅর্ঘ দিয়েছেন পরম বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে। তবে তত্ত্বকথা সর্বদাই যে তাঁদের পদে সার্থক রসরূপ লাভ করতে পেরেছে, তা নয়। কারণ তত্ত্বোপলব্ধি ও ভক্তি এক কথা, কবিত্বশক্তি অন্য কথা। কবিত্বশক্তি না থাকলে ভক্তিবশে ছন্দায়িত তত্ত্বকথা শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু একথা সত্য যে, বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে এমন কয়েকজন অন্ততঃ ছিলেন, যাঁরা অতুলনীয় সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাদের রচনা শুধু নীরস তত্ত্বকথায় পরিণত হয়নি, শ্রেষ্ঠ কাব্যমূল্যেও তা হ'তে পেরেছে অভিসিঞ্চিত। জ্ঞানদাস ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন—চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। আবেগের গভীরতা, অনুরাগের আধিক্য, দুঃখের মধ্যে সুখ, সুখের মধ্যে দুঃখ এবং সুখদুঃখকে এক বেণীবন্ধনে বেঁধে নেওয়ার আকুতি, চণ্ডীদাসের পদে সহজলভ্য। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে প্রকাশ-ভঙ্গী নামে কলাটি একেবারে প্রায় অচল। আত্মসচেতন হয়ে চণ্ডীদাস কোন পদ রচনা করেছেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া তিনি ভাবের এমন গভীরে চলে গেছেন, যেখানে অনুভূতিটুকুই তাঁর একমাত্র সম্বল। সেই অনুভূতির অলঙ্কৃত প্রকাশে তিনি মোটেই তৎপর নন। ফলে চণ্ডীদাসের পদাবলী ভাবের অনাবৃত প্রকাশের সমৃদ্ধ। অপর দিকে গোবিন্দদাসের পদে পাওয়া যায় অলঙ্করণ ও মণ্ডনকলার সমারোহ। বক্তব্যকে কেমন করে সজ্জিত করে নয়ন-মন এক সঙ্গে হরণ করা যায়, এ বিষয়ে গোবিন্দদাস অত্যধিক সচেতন। জ্ঞানদাসের পদে আমরা পাই এ দুয়ের সংমিশ্রণ। ভাবের গভীরতা ও মণ্ডনকলা—দুইই তাঁর পদে লক্ষণীয়। অতি গভীর ভাবের যথাযথ প্রকাশের জন্য যেটুকু অলংকরণ প্রয়োজন, জ্ঞানদাস তাতে নারাজ হননি। কিন্তু অতিরিক্ত অলংকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। অতিরিক্ত অলংকার সাহিত্যের ভাবস্বরূপ হয়ে পড়ে। কিন্তু অলংকার সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে তখনই, যখন ভাব ও ভাষার সমন্বয়ে অলঙ্কার প্রসাধনরূপে কাব্যদেহের লাবণ্য বিচ্ছুরিত করে। জ্ঞানদাসের কাব্যে আত্যন্তিক অনুভূতি অতি সাদা ও সহজ কথায় কিম্বা সামান্যমাত্র অলঙ্করণের ফলে অপূর্ব শিল্পবস্তু হয়ে উঠতে পেরেছে।

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হয়ে সে তত্ত্বকে সম্যক্ অনুশীলন-ও তিনি করেছেন জীবনে ও কাব্যে। কিন্তু জ্ঞানদাসের আর একটা পরিচয়, তিনি কবি। তাই কবিমনের বিশেষ প্রবণতা বশে রসপর্যায়ের কয়েকটি দিকেই শুধু তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। যেমন, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে কবিকল্পনা যেখানে সাড়া দেয়নি, ভক্তের কর্তব্য বশে পদ রচনা করেছেন, তা রসমধুর হয়নি। যেমন, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। রাধাকৃষ্ণলীলা কবিকল্পনাকে সমধিক উদ্বোধিত করেছিল। জ্ঞানদাস হৃদয়বেদনার ঘনীভূত নির্যাস দিয়ে যেন রচনা করেছেন তাঁর পদগুলি।

চণ্ডীদাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক জ্ঞানদাস বস্তুবিদ্ধ কবি নন। বস্তুর রূপাঙ্গণে কখনো কখনো অগ্রসর হলেও, কোন্ মায়াবলে তিনি এক মুহূর্তে রূপ থেকে স্বরূপে চলে যান। বহিঃসৌন্দর্যচ্ছবি আঁকা আর হয় না, হৃদয়সৌন্দর্যের ঝরোকাখানি তিনি উন্মোচন করেন। আর রসজ্ঞগণ মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করেন তার মাধুর্য। জ্ঞানদাসের রাধা রূপ দেখতে গিয়ে বলে ফেলেন: 'যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ।'

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি—উভয় ভাষায় পদ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলি কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলিতে কবিকল্পনা তেমন সাড়া দেয় নি। স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর ভাব ও ভাবনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন বাঙলা ভাষা, কিন্তু যেখানে চাতুর্য ও পারিপাট্যের সমারোহ দেখাতে চেয়েছেন, সেখানে তিনি ব্রজবুলির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জ্ঞানদাসের কবিমনের পক্ষে ব্রজবুলি উপযুক্ত বাহন নয়। শব্দ চিত্রও অলংকারের সমারোহে ব্রজবুলির মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যে রাজকীয় ঐশ্বর্যের আভাস, সেখানে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কবিচিত্ত ঠাঁই পাবে কেন? একে প্রতিভার দৈন্য বললে ভুল হবে। বলা যেতে পারে, এটা প্রতিভার বিশেষ অভিব্যক্তি।

চণ্ডীদাস-শিষ্য জ্ঞানদাসের রাধার কণ্ঠ অতি উচ্চ নয়। সুখের মাঝেও দুঃখের আভাস। আবার দুঃখের মুহূর্তেও বিদ্যাপতির রাধার মত জ্ঞানদাসের রাধা বিশ্বসংসারকে তাঁর দুঃখের কাহিনী শোনাতে বসেন না। দুঃখের

আগুনের মত রাধার হৃদয়ে বেদনা ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে, অস্ফুচ্চ বিলাপের মধ্য দিয়ে তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

জ্ঞানদাসের পদে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কবিকল্পনা স্বল্প পরিসর বর্ণনার মধ্যেই সার্থক। দীর্ঘায়িত বর্ণনায় কবিচিত্ত যেন খেই হারিয়ে ফেলে। ফলে দেখা যায় যে, একটি পদেরই প্রথমাংশ অতি উৎকৃষ্ট শিল্প বস্তু হয়ে উঠেছে, কিন্তু অপরাংশ কবিত্ব—বিবর্জিত পদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'আলো মুঞি জানোনা। জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে ॥'—পদটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাঁর পদে চিত্তধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করলেও চিত্রধর্ম একেবারে অনুপস্থিত থাকে নি। শব্দ-চিত্র ও ধ্বনি-চিত্র—দুইয়েরই রূপায়ণে আমাদের কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিম্‌ঝিম্ শবদ বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরষে ॥

সমালোচকের ভাষায়, "এমন আশ্চর্য্য শব্দ মন্ত্র, রূপচিত্র, রহস্যময় বর্ণার আবেষ্টনী, এমন ভাষা-সুর-ছন্দের অনিবার্য্য মায়াবিস্তার—জারক শক্তি—ইহা নিত্যকালের একটি চিত্র হইয়া রহিল।" (শঙ্করীপ্রসাদ বসু)

প্রস্ফুটিত পদ্মের বিকশিত সৌন্দর্য নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের অঙ্গনে জ্ঞানদাসের আবির্ভাব হয়নি। প্রথম জীবনে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাজন কবির অনুকরণ করে তিনি সিদ্ধির মন্ত্র অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু নিজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যটিও খুঁজে নিতে তাঁর খুব বেশী দেরি হয়নি। শেষ পর্যন্ত "তিনি বিদ্যাপতির আলঙ্কারিক রীতি পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডীদাসের ও নরহরি সরকারের সহজ সরল মরমী রীতিতে পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পথে তাঁহার সাফল্য হইল অনন্যসাধারণ।" (বিমানবিহারী মজুমদার)। তবে আগেই বলেছি ; চণ্ডীদাসের ভাব শিষ্য জ্ঞানদাসের নিজস্ব কাব্যবৈশিষ্ট্যও তুল্যরূপে বর্তমান।

॥ ২ ॥

আগেই বলা হয়েছে, গৌরলীলা বিষয়ক পদে জ্ঞানদাসের কবিকৃতি তত উজ্জ্বল নয়। গৌরতত্ত্বের নিগূঢ়রহস্য কবিতায় পরিস্ফুট করেছেন তিনি, কিন্তু তা যথোচিত কাব্যশ্রী লাভ করতে পেরেছে, তা বলা যায় না। কিন্তু এসব পদের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। জ্ঞানদাসের পদে গৌরাঙ্গ তাঁর পরিপূর্ণ মহিমা নিয়ে ফুটে উঠেছেন। যেমন :

কাঞ্চণ কিরণ গৌর তনু মোহন,
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করিবর সুবলিত, আজানুলম্বিত
ভুজযুগ শোভিত পুলক ভরে॥…

তত্ত্বের প্রতি অতি নিষ্ঠায় কাব্য এখানে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট। কিন্তু একটি পদে জ্ঞান-দাস কবিকৃতির পরিচয় দিয়েছেন :

সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেণে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুর্বল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতি তলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥
কোথায় পরাণ-নাথ বলি খেণে কান্দে।
পুরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে।
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥

অতি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত মহাপ্রভুর পূর্বরাগ বেদনার চিত্রটি সুন্দর ফুটেছে।

॥ ৩ ॥

আমাদের কবি রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। রাধার রূপ বর্ণনায় কবি ঢলঢল কষিত-কাঞ্চনতনু রাধার নবযৌবন-হিল্লোলের চকিত চমকটুকু তুলিকায় আঁচড়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই বলে ফেলেছেন : 'রাই কি বলিব আর কি বলিব আর। ভুবনে কি দিয়ে হেন

উপমা তোমার।' বরং কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় জ্ঞানদাস যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছেন :

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ুর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুক খানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥…

মল্লিকা-মালতীর মালা দিয়ে চূড়াটি ঘিরে দেওয়া গেল—মনে হচ্ছে যেন নীল গিরিশিখর থেকে সুরধুনী নদী বয়ে চলেছে। কালার কপালে চন্দনের টিপ, মধ্যে ফাগুর বিন্দু। মনে হচ্ছে কেউ যেন রূপোর পাত্রে জবা ফুল দিয়ে তা কালিন্দীতে পূজার মানসে ভাসিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণের এই সজ্জিত রূপমাধুরী এক লহমায় দেখার নয়। তাই—

জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যাম রূপ দেখি ধীরে ধীরে॥

॥ ৪ ॥

পূর্বরাগের বর্ণনায় আমাদের কবিকণ্ঠ মুখর। এ তাঁর স্বক্ষেত্র। তুলির অল্প আঁচড়ে অবলীলাক্রমে রাধার হৃদয়াকৃতি জ্ঞানদাস যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা একমাত্র চণ্ডীদাস ছাড়া তুলনা রহিত। কৃষ্ণের রূপ দর্শনে ও গুণ শ্রবণে রাধার পূর্বরাগের সূচনা। কিন্তু আপন হৃদয়ের আকুলতা তাঁকে এ পর্যায়েই বহু দূরে নিয়ে গেছে, যেখানে রাধার হৃদয়-শতদলের এক একটি পাপড়ির রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে তাঁর বিলাপের মধ্যে। কৃষ্ণরূপ দর্শনে রাধার প্রথম অনুভূতি :

চিকণ কালিয়ারূপ, মরমে লাগিয়াছে
ধরণে যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙারিয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥

কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকর্ষণ-সৌন্দর্যে রাধা বিকল—'নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে, জাতিকুল মজাইলাম তায়॥' রাধা পরিপূর্ণ আত্মহারা এখনো হন নি—তাই কৃষ্ণরূপ দর্শনের চিত্রটি একান্তমনে আস্বাদন

করছেন। রাধা দেখেন, কৃষ্ণের 'লাবণ্য ঝরয়ে মকরন্দ।' আবার কখনো বলেন—

দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা আইলাম তারে
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে।

কালিন্দীকূলে তরুমূলে সজল শ্যাম তনুর ত্রিভঙ্গিম রূপ। সে রূপে মুগ্ধা রাধা কলসে জল ভরতে ভুলে গেছেন। রাধা ভাবছেন—

যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।

নিজের উপরে যেন ধিক্কার এসে গেছে, কেননা রাধার সমস্ত মন-প্রাণ যিনি অধিকার করেছেন, তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো সুদূরপরাহত—উপলব্ধির গভীরে শুধু হৃদয়মথনজনিত আকুলতা—

আলো মুঞি জানো না—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।

রূপের পাথারে যার আঁখি ডুবে আছে, যৌবনের গহন অরণ্যে যার মন হারিয়ে গেছে, কৃষ্ণ-তিমিরে যাকে গ্রাস করেছে, তার পক্ষে চর্মচক্ষু দিয়ে রূপ-দর্শন আর সম্ভব নয়, মর্মচক্ষু দিয়ে তাই উপলব্ধি করতে হয় স্বরূপ। এখন 'হৃদয়ে পশিল রূপ পাঁজর কাটিয়া'। তবু রূপানুরাগে রূপের কথা এসে পড়লেও স্বরূপের কথাই সেখানে প্রধান :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

দেহ ও মন, রূপ ও স্বরূপের এমন নিবিড় সম্পর্ক কজন বৈষ্ণব কবি কথার তুলি দিয়ে অঙ্কিত করতে পেরেছেন? দরশ ও পরশের জন্য গা এলিয়ে পড়ার সরল বর্ণনার মধ্যে গভীরতম আবেগের মহত্তম বাণীর সুর শোনা যায় না কি?

মনের উপরিতলে একদিন রূপ প্রতিচ্ছবি ফেলেছিল, একথা ঠিক। কিন্তু কোন্ মুহূর্তে মন রূপ হতে অরূপে চলে গেছে—মনের মণিকুট্টিমে চলেছে সেই অরূপের ধ্যান—

গুরুগরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পূরণে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

জ্ঞানদাসের স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক পূর্বরাগের—ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, মাধুর্যে ভরা—একটি পদ অতুলনীয়। পদটি 'মনের মরম কথা……'।

কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব তেমন নেই। এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। এ জাতীয় একটি পদে কৃষ্ণের হৃদয়বার্তা প্রকাশ অপেক্ষা রাধার চিত্রই উদ্ঘাটিত :

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মচুকাই॥
এ সখি এ সখি দেখলুঁ নারী।
হেরল হরখে হরল যুগ চারি॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে যেন অমিয়া উঘারি॥

শেষ দুই পংক্তিতে দেখা যায়, স্বল্পশব্দ ব্যবহার রাধার সৌন্দর্য ও গমন ভঙ্গীর চিত্র উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে।

॥ ৫ ॥

অভিসার বর্ণনায় স্বভাবতই জ্ঞানদাস সার্থক নন। তবে অন্ততঃ দুটি পদ আছে, যেখানে কবি অভিসারের উৎকণ্ঠা, আকৃতি, পরিবেশ অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন। পদ দুটি বর্ষাভিসারের :

মেঘযামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥

ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ ভরে চলি গেল॥

দুই চারি সহচরী সঙ্গে নিয়ে সঙ্কেতকুঞ্জ অভিমুখে গমনের ফলে অভিসারের তাৎপর্য ও 'সুদুঃসহ কঠোরতা' অনেক হ্রাস পায়, বিজ্ঞ সমালোচকের এ উক্তি সত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, অভিসার বর্ণনায় জ্ঞানদাসের অবলম্বন 'উজ্জ্বলনীলমণি'—সেখানে সখী সঙ্গে অভিসারের কথাই আছে।

অন্য পদটিতে অভিসারের চকিত গমন ভঙ্গীর সলজ্জ রূপ, আবেগ, উৎকণ্ঠা, অন্ধকার সর্পসঙ্কুল পথের বর্ণনা কবিকল্পনায় রসরূপ পেয়েছে। পদটি এই—

কানু অনুরাগে, হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরুজন ভয়ে, কিছু নাহি মানয়ে,
চীর নাহি সম্বরু দেহ॥

কিন্তু জ্ঞানদাস নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব—ফলে একটি পদে তিনি 'শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা'-র চিত্র আঁকতে গিয়ে এঁকেছেন চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের চিত্র :

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবার খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥

॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ এখন দূরের নয়। মিলনের আশ্লেষে ভরে ওঠে দিগ্বিদিক। মণিময় দীপ, কুসুমসজ্জা, কোকিলের কূজন, ভ্রমরের ঝঙ্কার, সারীশুক ও কপোতের ফুৎকার, সুগন্ধ মলয় পবন—সব জড়িয়ে কালিন্দীতীরের মন্দির সুখময় অতি অনুরাগে মিলনকেও বুঝি বিচ্ছেদ বলে ভ্রম হয়।

হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥

নিদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥

মিলনের মুহূর্তেও বিচ্ছেদবেদনা দূরভিসারী প্রেমের মূর্ত প্রকাশ—অধরাকে প্রাপ্তির চরম বাসনা যেন মাথা কুটে মরে। আর তা-ইতো আক্ষেপানুরাগের লক্ষণ। এ পাওয়ার বুঝি শেষ নেই। তাই:

তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদা লয় নাম॥

জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে রাধার আক্ষেপজনিত বেদনা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। শ্রীমতীর আক্ষেপ নিজের প্রতি, প্রেমের প্রতি, বাঁশীর প্রতি, কৃষ্ণের নিঠুরপনাকে স্মরণ ক'রে। বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের রাধার মত জ্ঞানদাসের রাধার সারাজীবনই তো শুধু আক্ষেপ। পূর্বরাগ থেকেই সুরু হয়েছে এ বেদনার অগ্নিদাহন। এখানে এসে তা দাউ দাউ করে উঠেছে। রাধা বলেন—

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণ,
বুঝিয়া বুঝিয়া মৈনু।

সুখের জন্য যে ঘর বাধা হয়েছিল, তা উপেক্ষার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাধা অমৃতসাগরে স্নান করে দেহমন শীতল করতে গিয়ে দেখেন তাতে সূর্যকিরণের জ্বালা। এখন অনুতাপই রাধার একমাত্র সম্বল:

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥···

আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানদাস গুরুর অনুগামী। কিন্তু গভীরতম আবেগের সহজতম প্রকাশে তিনি গুরুর যোগ্য শিষ্য বটেন।

॥ ৭ ॥

শেষ পর্যন্ত রাধা ঠিক করলেন কালাতেই তিনি নিমগ্ন হবেন। কৃষ্ণ ছাড়া তার অন্য গতি নেই। লজ্জা-কুলশীল-মান সব কিছু তিনি কানুতেই নিবেদন করে কানুর পিরীতিকেই রাধা সর্বস্ব বলে মনে করবেন। রাধার উক্তি :

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বঁধু বিনু
আর কেহ মোর নয়॥

কানুর প্রেমে আছে বজ্রের জ্বালা, আর তা মরণের অধিক যাতনাদায়ক। তবু কানুর প্রেম রাধার অন্তরে অন্তরে বাঁধা। অন্যের অনেকজনা আছে, রাধার আছেন শুধু কৃষ্ণ। কৃষ্ণই তার চোখের কাজল, অঙ্গের ভূষণ। রাধা তাঁর মনের কথাটি জানিয়ে দেন কৃষ্ণকে :

বঁধু, তোমার গরবে, গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ—
সদা লইয়া রাখি বুকে॥

॥ ৮ ॥

নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেওয়ার পরে যদি বিচ্ছেদ হয়, তাহলে তা হয় খুবই মর্মান্তিক। মাথুর-বিরহ-বেদনা তাই রাধার পক্ষে এত সু-দুঃসহ। তখন রাধার অবস্থা :

সোনার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥
গলয়ে নয়ন লোর।
মূরছে সখীকে কোর॥

দারুণ বিরহ-জ্বরে।
সো ধনী গেয়ান হরে ॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে জ্ঞানদাস ॥

কান্ত পরদেশে, তাঁর বিরহে রাধা ক্ষীয়মাণা। তিনি কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, কখনো একদৃষ্টে পথের পানে তাকিয়ে থাকেন, কখনো মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এ দিব্যোন্মাদ অবস্থায় দিন শুধু কাটে। কিন্তু কানুর দেখা নেই :

পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধাওল,
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল,
বরিখে বরিখে কত ভেল ॥

তাই শ্রীমতী ঠিক করলেন, তিনি যোগিনী হবেন। কেন না পিয়া যদি না আসে, তাহলে পরশরতন-যৌবন তো কাঁচের সমান। অতএব—

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনী বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি ॥

॥ ৯ ॥

ভাবসম্মেলনে এসে পথ পরিক্রমা শেষ হোল। শ্রীমতির ধারণা—'আজ তুরিতে মাধব, মন্দির আওব, কপাল কহিয়া গেল।' কিন্তু এখানেও আছে বিরহের অনুভূতি—যে বিরহ চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের কবিমানসের সহজাত। চরম মিলনক্ষণে বেদনার ধূপছায়াও তাই রাধাকে উতলা করে তোলে :

অচিরে পূরব আশ।
বঁধুয়া মিলব পাশ ॥…
কিছু গদগদ স্বরে।
এ-দুঃখ কহিব তারে ॥

পরাণ পিয়াকে উদ্দেশ্য করে রাধা জানান—'চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ, আর না দিব ছাড়িয়া'। কেন না—

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে বাহির হৈয়া
কেমনে আছিলে তুমি ॥

শ্রীরাধা অতি আকুল আগ্রহে কানুর প্রেমমন্দিরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে পরম প্রশান্তি লাভ করতে চান। সব দ্বিধা, সঙ্কোচ, বাধা অপসারিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের মানস মিলনে অদ্বয়ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। আর এখানেই পদাবলীর শেষ কথা :

বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া সেখানে পরাণ—
সেখানে তোমারে থোব ॥

॥ গোবিন্দদাস ॥

॥ ১ ॥

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের অন্যতম শিষ্য গোবিন্দদাস পরম সাধক ও ভক্তরূপেও বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গুরুর আদেশেই তিনি রাধাকৃষ্ণলীলারসাত্মক পদ রচনায় ব্রতী হন—'স্বচ্ছন্দ বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা'। তাঁর কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র প্রভু খেতুরীর মহোৎসবে গোবিন্দদাসকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের স্তুতি করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি ॥

কবিরাজ উপাধিটিও গোবিন্দদাস পেয়েছিলেন গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের (মতান্তরে বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুদের) কাছ থেকে। ৭৬ বৎসরের দীর্ঘজীবি কবি—'এইরূপ 'ভজন' ও 'বর্ণন' করিয়া ছত্রিশ বৎসর কাল কীর্তন গান করেন।' শেষ বয়সে কবি নিজের পদগুলি একত্র সংগ্রহ করেন। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

নির্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে।
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ॥

গোবিন্দদাস অজস্র পদ রচনা করেছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে তাঁর ৪৬০টি পদ সংকলিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্যাপতির ১৬৩টি, চণ্ডীদাসের ৯০টি এবং জ্ঞানদাসের ১৮৬টি পদ উক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে গোবিন্দদাসের ৭২৮টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি 'সঙ্গীতমাধব' নামে একখানি নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। তা ছাড়া বিদ্যাপতির অন্যূন ছয়টি অসম্পূর্ণ পদ তিনি সম্পূর্ণ করেন।

॥ ২ ॥

রসনা রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥

১ গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। গভীরতম আবেগের মহত্তম প্রকাশের দ্বারা তিনি আপন মহৎ কবিপ্রতিভা সুচিহ্নিত করে গেছেন। তিনি রূপদক্ষ শিল্পী।। গভীর ভাবের শতধা বিচ্ছুরিত হীরকখণ্ডগুলিকে সংগ্রথিত করে অখণ্ড শিল্পরূপ দিতে তিনি সুদক্ষ। ৷ কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় রূপই তাঁর রচনায় যত সৌষ্ঠব লাভ করেছে, তাতে তাঁর সঙ্গে তুলনা মিলে একমাত্র তাঁর সাহিত্যগুরু কবি-সম্রাট বিদ্যাপতির ॥ কোন কবিতাকে শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়ে উঠতে গেলে তাতে ভাবের নিবিড়তা ('emotion recollected in tranquility') যেমন থাকতে হবে, তেমনি সেই ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য মণ্ডনকলার উপযুক্ত উপস্থিতিও একান্ত প্রয়োজন। কারণ 'Poetry……is a particular kind of art; that it arises only when the poetic qualities of imagination and feeling are embodied in a certain form of expression. That form is, of course, regularly rhythmical language, or metre. Without this, we may have the spirit of poetry without its externals. With this, we may have the externals of poetry without its spirit. In its fullest and completest sense, poetry presupposes the union of the two." আমাদের কবি 'emotional and imaginative elements' কে 'the rhythmic creation of beauty'-তে পরিণত করবার অসামান্য সৃজনশক্তির

অধিকারী। ভক্তির আতিশয্য তাঁর কবিতার দুই কূল ছাপিয়ে যায়নি। কারণ সংযমের পারিপাট্য বজায় রাখার রহস্যটি তিনি জানতেন।

সৃজন-শিল্পী হিসাবে গোবিন্দদাস ছিলেন বিদ্যাপতির অনুসারী ও উত্তরসূরী। বিদ্যাপতির রচনাধর্ম তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। পদ রচনার ক্ষেত্রে মণ্ডন-শিল্প। বিদ্যাপতির রচনার পারিপাট্য, আলঙ্কারিতা, পদ-বিন্যাসের চাতুর্য ও মাধুর্য—পাঠককে বিস্মিত, মুগ্ধ ও সচকিত করে তোলে। গোবিন্দদাস রচনাধর্মে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। অলঙ্কারের এত ঐশ্বর্য, ছন্দের এত কৌশল—এক কথায় কবিতার বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব সাধনে তাঁর যত্ন বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। ভাব-প্রকাশের যথাযথ কৌশলটি গোবিন্দদাস জানেন। তেমনি তাঁর কাব্যে শব্দ ও অর্থালংকারের এত বৈচিত্র্য ও সমারোহ পাঠকদের চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়। গোবিন্দদাসের পদে একদিকে ভাবের দুরবগাহিতা, অন্যদিকে অলংকারাদি প্রয়োগের দ্বারা পদের অবয়ব সংস্থানে কাঠিন্য—তাঁর রচনাকে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য করে তুলেছে, সন্দেহ নেই। অনুভূত ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে—'যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ'—এ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। রূপায়ণে ক্ল্যাসিক্যাল পারিপাট্যের ছোঁয়াচে তাঁর পদ যেন অনেকটা গ্রীকভাস্কর্যের কঠিন-সুন্দর রূপাঙ্কণ। এ কারণেই পাঠকের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই গোবিন্দদাসের পদাবলী দুর্বোধ্য মনে হয়—তাকে অর্থবহ করে তুলতে তাই প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যাকারের। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কীর্তন গানে মূলতঃ আঁখরের প্রচলন হয় গোবিন্দদাসের পদ কীর্তন থেকে। অন্তরঙ্গ দিক থেকে ভাবের ঐশ্বর্য এবং বহিরঙ্গ দিক থেকে ব্রজবুলি ভাষার মাধুর্য ও রহস্যময়তা, এবং অনুপ্রাসাদি অলংকারের ঝংকারের জন্য গোবিন্দদাসের পদাবলী ভক্ত, রসিক, গায়ক, শ্রোতা—সকলের কাছেই বহুল পরিমাণে সমাদৃত। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন : "...তাঁহার রচনায় ভাবের গূঢ়তা, অলঙ্কার ও ধ্বনির প্রাচুর্য ও সমাস-বাহুল্যের জন্য তাঁহার রচনা সাধারণ পাঠকের ত কথাই নাই,—অধিকাংশ শিক্ষিত ও সৌখীন কাব্য-রসামোদী পাঠকের পক্ষেও দুরধিগম্য হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা ধৈর্য ধরিয়া বিজ্ঞ ও রসজ্ঞ কোনও কীর্তন-গায়কের মুখে গোবিন্দদাসের পদ শুনিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বৈষ্ণব পদ-কর্তাদিগের পদাবলী সমুদ্রবিশেষ হইলেও গোবিন্দদাসের অন্ততঃ বাছা বাছা

দুই চারিটা পদ উত্তমরূপে আঁখর দিয়া গান করিতে না পারিলে কীর্তনের পালাই জমে না।' (৫ম খণ্ড/৬৮ পৃঃ)। গোবিন্দদাসের পদ দুর্বোধ্য, অধিকন্তু তা রসজ্ঞ ও শ্রোতাদের কাছে অপরিহার্য,—এই দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। তাঁর পদের এত সমাদর সম্পর্কে সতীশচন্দ্র আরো বলেছেন—

"কিন্তু রস-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলে কেহই অন্ততঃ তাঁহার ভাব-বৈচিত্র্যে মোহিত না হইয়া পারেন না। আমাদের দেশের রসজ্ঞ কীর্তনিয়াগণ আঁখর দিয়া পদের দুরূহ ভাবগুলি শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া, সুকৌশলে ও অতি সুমিষ্ট ভাবে টীকাকারের কার্য সম্পন্ন করেন বলিয়া, রসজ্ঞ কীর্তনিয়াগণের মুখে গোবিন্দদাসের পদ শুনিতে যেমন ভাল লাগে, তেমন বোধ হয় আর কিছু নহে; এজন্যই গোবিন্দদাসের পদে পালা যেমন জমে, অন্য কাহারও পদে সেরূপ জমে না।" (পৃঃ ৬৯)

গোবিন্দদাসের সংস্কৃত ও বাংলায় পদ থাকলেও তাঁর রচনা অধিকাংশই ব্রজবুলি ভাষায়। তাঁর রচিত প্রথম পদ 'ভজহুঁ রে মন' ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। বস্তুতঃ ব্রজবুলিতে তিনি যত পদ রচনা করেছেন, বাংলাদেশে আর কোন কবি এত সংখ্যক পদ রচনা করতে পারেননি। তারো অধিক কথা, বাংলাদেশে প্রথম ব্রজবুলি পদ রচনা ও ব্যাপক প্রচলনের কৃতিত্ব গোবিন্দদাসের। অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে বাংলাদেশে ব্রজবুলি ভাষায় প্রথম রচনা যশোরাজ খানের 'এক পয়োধর চন্দন লেপিত' পদটি। কিন্তু চৈতন্যপ্রভাবের পূর্ববর্তী কালে রচিত এই পদটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। এর ঐতিহাসিক ক্রমানুসারিতা নেই। গোবিন্দদাস ব্রজবুলি পদ রচনায় যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি বাংলা পদ রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'চিকণ কালা গলায় মালা', 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি', 'এইত মাধবী তলে'—প্রভৃতি বাংলাপদেও আমরা কবিরাজ গোবিন্দদাসকেই খুঁজে পাই। গোবিন্দদাসের কবিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবি-সমাজ
কাব্য-রস-অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাঁহার দ্বারে দাসী ভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবি শিরোমণি॥

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বের গুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥

'কবিরাজ-রাজ', 'রস-সাগর' গোবিন্দদাসের পদে প্রেমভক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ —তদুপরি 'যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে কবিগণ চমকয়ে চীত।' ষোড়শ শতাব্দীর আর কোনো কবি বৈষ্ণবভক্ত ও রসজ্ঞদের কাছ থেকে এত প্রশংসা পান নি। আবার কালের কষ্টিপাথরেও গোবিন্দদাসের রচনার চিরন্তন মূল্য প্রমাণিত হয়েছে। এখানেই বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের গৌরব ও সাফল্য।

গোবিন্দদাস তাঁর কাব্যগুরু বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা অনুসরণে পদ রচনা করেছেন, একথা সত্য। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে বিদ্যাপতির অপেক্ষাও অতিরিক্ত কিছু আছে, যা একান্তভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের অঙ্গীভূত ও নিজস্ব। শ্রীরাধার সখী বা মঞ্জরীভাবের অনুগত সাধনা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব কবিগণের পদে এই বৈশিষ্ট্যের অনুস্যূতি। গোবিন্দদাসও তাঁদের অন্যতম। এছাড়া "তিনি বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য রূপ গোস্বামীর অনেক সংস্কৃত কাব্য হইতে অনেক শ্লোকের শুধু অনুকরণ নহে, তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন; ইহা তাঁহার বাঙ্গালীত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বেরই পরিচায়ক।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থের একটি শ্লোক নেওয়া যাক্—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতি শ্রেয়সী ॥

গোবিন্দদাস এই শ্লোকের ভাবানুসরণে একটি সুন্দর পদ রচনা করেছেন—

সজনি! মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি
জীবন পিয় সুখ লাগি ॥
পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখন মন চুরি কেল।

না জানিয়ে কোঐছে পটে দরশায়লি
নব জলধর যিনি কাঁতি।
চকিতে হইয়া হাম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলী রব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ॥

সুতরাং স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, গোবিন্দদাসের পদাবলী আস্বাদন করতে গেলে একদিকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে, অন্যদিকে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও কাব্য সাহিত্যে অধিকার থাকা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় অবিচারের সম্ভাবনা বর্তমান। পুরোনো উপাদান অবলম্বনে গোবিন্দদাস তাঁর কাব্যদেহ নির্মাণ করেছেন, একথা ঠিক। কিন্তু তাঁর সৃজন-নৈপুণ্য এখানেই যে, পুরোনো উপকরণে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে মৌলিকতার স্বাক্ষরসমৃদ্ধ, নতুন বস্তু। গোবিন্দদাস নিছক অনুকারক নন, মৌলিক স্রষ্টাও বটেন। তাঁর একটি নিদর্শন মেলে—'মার্গে পঙ্কিণী তোয়দন্ধ তমসে'—এই প্রকীর্ণ কবিতাটির —'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল'—অনুবাদে। অনুবাদও যে নব সৃজন, গোবিন্দদাসের রচনায় তার অজস্র দৃষ্টান্ত মেলে।

গোবিন্দদাসের রচনা পালাবদ্ধ রসকীর্তনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তিনি পদাবলীর রসধারাকে কাব্যাকারে রূপায়িত করেছিলেন। বিশেষ করে রাধা-কৃষ্ণের "অষ্টকালীয় লীলা" বর্ণনায় পরিকল্পনা তিনিই সর্বপ্রথম করেছিলেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "গোবিন্দদাসের অসাধারণ নির্মিতি কৌশল ও ভক্তিভাবের গাঢ়তাই তাঁহার একমাত্র কারণ হইলেও তাঁহার পদাবলী হইতে রাধাকৃষ্ণলীলার পূর্বাপর সঙ্গতি ও যোগাযোগ-পূর্ণ ধারাবাহিক কাহিনীর বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/২য় খণ্ড/পৃঃ ৫৭৫-৬)।

চিত্র ও সংগীত-ময়তা গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রাণ-স্বরূপ। গোবিন্দদাস সম্পর্কে স্পষ্টই বলা চলে যে,—'he painted with words!' কথার দ্বারা চিত্রকল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শব্দের দ্বারা অঙ্কিত চিত্র যখন অনুভূতির

রসে রসায়িত হয়ে ওঠে, তখন তা হয় চিত্রকল্প। কবি বিদ্যাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস এই বিশেষ দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাঁর নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় সেখানে প্রধান হয়ে উঠতে বিলম্ব করে নি। গোবিন্দদাসের কবিতার ভাবদেহ 'কুন্দে যেন নিরমাণ"—কবি চিত্রে ও রঙ-রসে তাকে অপরূপ ও ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। চৈতন্যদেবের বর্ণনায় গোবিন্দদাস লিখেছেন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম কলপ-তরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥

পদটিতে চৈতন্যদেবের করুণাঘন ও দিব্যজীবনচিত্র অনুপম ও রসঘন রূপলাভ করেছে। চৈতন্যদেবের মেঘকালো নয়নে করুণার অশ্রুবর্ষণ। তাঁর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চরূপ মুকুলের উদ্গম—দেহের সেই স্বেদবিন্দু যেন বিকশিত ভাবকদম্ব। সুরধুনিতীরে স্বর্ণকান্তিদেহবিশিষ্ট গৌরাঙ্গদেব পাদচারণা করেছেন—দেখে মনে হচ্ছে যেন হেম-কল্পতরু সঞ্চরমাণ। কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব-ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডবাসীর একান্ত কামনা-স্থল। আলোচ্য চিত্রকল্প চিত্তরসে ভরপুর, সন্দেহ নেই।

গোবিন্দদাসের কাব্যের অন্যতম গুণ সংগীতধর্মিতা। অনুপ্রাসাদির ঝংকার-বহুলতা তাঁর পদকে সংগীতমধুর করে তুলেছে। শব্দের কারুকার্য ও ঝংকার, বাক্-নির্মিতির বিশেষ অভিব্যক্তি, অলংকারের বহুল উপস্থিতি, চিত্ররচনায় বিশেষ ক্ষমতা—সব কিছুর সমবায়ে, অথচ সব কিছুকে অতিক্রম করে, এক আশ্চর্য সংগীতময়তা তাঁর পদসমূহকে বিশিষ্ট করে তুলেছে! "All arts aspire to the condition of music"—এই সূত্র গোবিন্দদাসের কাব্যে আশ্চর্য-সুন্দর রূপ লাভ করেছে। যেমন—

নন্দ নন্দন নিচয় নিরখলু
নিঠুর নাগর জাতি।

নারি নীলজ   লেহ নিরমিত
নাহ নামে মিলতি ॥

অথবা,

ঝর ঝর জলধর ধার।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার ॥
ঝলকত দামিনী মালা।
ঝামরি ভৈগেল বালা ॥

—ইত্যাদি পদে বাচ্যকে ছেড়ে ব্যঞ্জনা এক অপরূপ সংগীতের রাজ্যে উপস্থিত। গোবিন্দদাসের পদের অর্থ বুঝি না বুঝি, তার সংগীতমাধুর্য ও ধ্বনির ঝংকার পাঠককে এক অপরূপ রহস্যময়তার তোরণ দ্বারে নিয়ে যায়। তাঁর অনুপ্রাসের মাধুর্য "মনের মধ্যে যে ধ্বনির মাদক রস সৃষ্টি করে, একমাত্র জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে ছাড়িয়ে দিলে, ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে বড় একটা সুলভ নহে।'

গোবিন্দদাসের পদ গাঢ়বন্ধ, সান্দ্র—বক্তব্যবিষয় সংযত, সংহত, নিটোল স্ফটিকসদৃশ। তাতে ভাবের গূঢ়তা ও গাঢ়তা একদিকে যেমন বর্তমান, তেমনি অন্যদিকে প্রকাশভঙ্গীতে সচেতন শিল্পীসুলভ সংযম বর্তমান। বস্তুর নির্যাস ছেঁকে নিয়ে তাকে গাঢ় রসে পরিণত করতে আমাদের কবি জানেন। যেমন—

আধক আধ—   আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।

—এই পদটিতে যে গূঢ় ভাব ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ বোধের জন্য বিস্তৃতি ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাছাড়া নিটোল রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে আলোচ্য পদটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গোবিন্দদাস রাধার দেহের রূপ অপেক্ষা স্বরূপ—রূপের লাবণ্য—চিত্রণে অধিকতর তৎপর। বস্তুবিদ্ধ রূপাঙ্কণ অপেক্ষা অশরীরী সৌন্দর্যের অবয়ব নির্মাণে আমাদের কবি বিশেষ সচেষ্ট॥ মূর্তরূপ অপেক্ষা অমূর্ত সৌন্দর্য-ভাবনায় তিনি লীন। গোবিন্দদাসের তুলির স্পর্শে রাধা যেন 'নিরালম্ব সৌন্দর্যের ভাব প্রতিমা'। তাঁর সৌন্দর্য্য তাই আমাদের স্তম্ভিত করে—মর্তসীমার সঙ্কীর্ণ বন্ধন অতিক্রম করে দুরবগগাহী অসীমের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে আমাদের নিয়ে যায়। এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রীভূতা শক্তি রাধায়—

'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥

এতক্ষণ আমরা গোবিন্দদাসের পদের সামান্য পরিচয় উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি—যদিও তা সর্বথা সফল হয়নি। তবু সূত্রাকারে বলা যায় যে, সচেতন রূপদক্ষ শিল্পীর ভাবের গূঢ়তা ও গাঢ়তা, আলঙ্কারিকতা, মণ্ডনকলা, চিত্র ও সংগীত ধর্ম, সৌন্দর্য্য দৃষ্টি, ধ্বনিপ্রাধান্য, ছন্দোনৈপুণ্য, ভক্তি ভাব, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের সমাহার—ইত্যাদি তাঁর রচনার অন্যতম গুণ। গোবিন্দ-দাস চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বাপেক্ষা সমাদৃত মহাকবি। গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, অভিসার, রসোদ্‌গার, প্রার্থনা প্রভৃতি পদ রচনায় তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতির মত তিনিও সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসের কবি। বস্তুতঃ মধুররসবৈচিত্র্যমূলক পদ রচনায় তিনি অদ্বিতীয়।

॥ ৩ ॥

গোবিন্দদাসের পদাবলী আস্বাদন করতে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে তাঁর গৌরচন্দ্রিকার পদ। তিনি মূলতঃ ব্রজের মধুরলীলা অবলম্বনে পদ রচনা করেছেন। অপর পক্ষে, জ্ঞানদাস বাৎসল্য ও গোষ্ঠ বিষয়ক পদও রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলঙ্কারিক বর্ণনার সুযোগ যেখানে বেশী, সেখানেই গোবিন্দদাসের কবিমানস স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছে। সেক্ষেত্রে মধুর রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় তাঁর কবিমনের উল্লাস যে শতধা হয়ে উঠবে, সে তো অতি স্বাভাবিক। গৌরচন্দ্রিকার পদেও গোবিন্দদাসের কবিখ্যাতির অতি বড় পরিচয় আছে। চৈতন্যদেবের প্রকট কালে তিনি তাঁর লীলা দর্শনের সুযোগ পাননি—কারণ তাঁর আবির্ভাব গৌরাঙ্গ-পরবর্তী কালে। তাই চৈতন্যদেবের দিব্যলীলার প্রত্যক্ষদৃষ্ট সজীব অভিজ্ঞতার অভাবকে তিনি কল্পনাশক্তির দ্বারা পূরণ করে নিতে চেষ্টা করেছেন—পূর্বসূরীদের প্রদত্ত তথ্যকে গোবিন্দদাস কাব্যিক সত্যে পরিণত করেছেন। তবু মহাপ্রভুর লীলা দর্শনের সুযোগ না পাওয়ায় তাঁর মর্মবেদনার অন্ত ছিল না—

(১) তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর।

(২) যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥

(৩) প্রেম ধনের ধনী কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

গোবিন্দদাস চৈতন্যদেব সম্পর্কে অজস্র পদ রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, জ্ঞানদাসের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে শুধু রূপ বর্ণনার আধিক্য। কিন্তু গোবিন্দদাস দিব্য রাধাকৃষ্ণলীলার বিচিত্র ভাব ও রসের অনুযায়ী প্রকৃত গৌর-চন্দ্রিকার পদ রচনা করেছেন। বলা যায় যে, যথার্থ গৌরচন্দ্রিকা পদ রচনার শ্রেষ্ঠ সম্মান গোবিন্দদাসকেই দিতে হয়। দীক্ষিত হওয়ার পর গৌরাঙ্গ বিষয়ে তাঁর প্রথম পদে অনুগত ভক্তের হৃদয়াকৃতি প্রকাশ পেয়েছে।

ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সতসঙ্গে
তরহ এ-ভবসিন্ধুরে ॥…

এটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকার নয়। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদ কল্পনার ঐশ্বর্যে, ভাবের গাঢ়বদ্ধতায় ও সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যে, ছন্দ-সুষমা ও অলঙ্কারের কারুকার্যে অনুপম। গৌরাঙ্গের দিব্যজীবনের অমৃত-সত্যটুকু আমাদের কবির উপলব্ধিতে আভাসিত হয়েছে।

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম— কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনি তীরে উজোর ॥

মহাপ্রভুর হেম অঙ্গে পুলকের স্বেদবিন্দু, নয়নে অবিরল কারুণ্যের অশ্রুধারা —'কবহুঁ নাচত কবহুঁ গাওত কবহুঁ গদগদ ভাষ'—অখিল জনগণের তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। আর একটি পদে করুণাঘন গৌরাঙ্গের চিত্র অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হয়েছে—

পতিত হেরিয়া কান্দে থীর নাহি বান্ধে
করুণা নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা তনু
অবনী ঘন পড়ি যায়।

গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ-মাধুরী পিরীতি-চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি॥

॥ ৪ ॥

'পূর্বরাগ পর্যায়ে গোবিন্দদাস বহিরঙ্গ বর্ণনায় রাধার রূপের সৌন্দর্য ও লাবণ্যটুকু তুলে ধরেছেন। কল্পনার অমেয় ঐশ্বর্য্যে সেই বিমূর্ত সৌন্দর্য্যসায়র যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে; স্থূল বর্ণনা অপেক্ষা সূক্ষ্ম অনুভূতির রসে জারিত হয়ে রাধা হয়ে উঠেছেন অশরীরী সৌন্দর্য্য প্রতিমা—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥

সখীদের সঙ্গে রাধিকা কালিন্দী নদীতে স্নানে চলেছেন—কাঞ্চন বর্ণের শিরীষ ফুলের মত তাঁর অনুপম দেহকান্তি সূর্য্যকিরণকেও ম্লান করে দিল। তাঁর চঞ্চল দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণের হৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষোভ জাগল। অধিকন্তু—

চিত-নয়ন মঝু দুহুঁ সে চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।

দূর থেকে রাধার রূপ দেখে কৃষ্ণ মজেছেন—তাঁর শেলবিদ্ধ হৃদয়ে কতই না ব্যথা। কিন্তু রাধার মনোভাব এখনো তাঁর অজানা—দূর থেকে দৃষ্টি-তীরে-বিদ্ধ কৃষ্ণ শুধু তৃষ্ণায় ছটফট করেন—

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস নেই পালটি পুন বিহ্বল
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি॥
সজনি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরলুঁ রাধা॥

ফলে—'বিষম বিশিখ শর অন্তর জর জর সরবস লেয়লি মোরি'। অন্যদিকে রাধা-ও মন্মথ শরে জর জর; কিন্তু তিনি এখনো পর্য্যন্ত মনোভাব স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু হাবে ভাবে রাধার এই ভাবান্তর সখীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। রাধা নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বিকশিত কদম্ব ফুল দেখছেন—

আর করতলে বদন ন্যস্ত করছেন ঘন ঘন ; 'খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ। অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ ॥' রাধা ভাব আর চেপে রাখতে পারছেন না। কেন না—'মরমক বেদনা বদন সব কহই ॥' তিনি অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে রাখছেন—কণ্ঠে গদগদ স্বরে আধো আধো বাণী। এখন রাধা—

আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত।

সাক্ষাৎদর্শন তো পরের কথা। চিত্রপটে কৃষ্ণকে দেখেই রাধা আত্মহারা—শ্যামনাম, মুরলী, পট দর্শন—এ তিনই তো রাধার মন কেড়ে নিয়েছে। এই তিন যে এক—কুলবতী রাধা তা জানেন না। তাই মরণই তার কাছে শ্রেয় মনে হচ্ছে—অথচ কানু-'অবহুঁ না মিলল।'

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি দগধল কুলবতি লাজ ॥
সজনি যাইতে পেখলুঁ কান।
তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুম শর নয়নে না হেরিয়ে আন ॥
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয় দলে করু দংশ ॥
অতয়ে সে মঝু মন জ্বলতহি অনুখন দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল অবহুঁ না মীলল কান ॥

তারপর দর্শনজনিত অনুভূতি। শ্যামের মরকতদর্পণের মত উজ্জ্বল রূপ দর্শনে রাধা অনঙ্গবাণে বিদ্ধ হলেন। তারপর থেকে রাধার কাছে গৃহ অরণ্য এবং চন্দন অগ্নিতুল্য বলে বোধ হচ্ছে। দখিণা পবন লাগছে বিষবৎ। আর—'ধৈরজ লাজ গেল দুহুঁ ভাগি।' আর একটি পদে রূপদর্শনজনিত অনুভূতির মধ্যে দিয়ে রাধার প্রেমের অতলস্পর্শী গভীরতা প্রকাশ পাচ্ছে। তখনো দর্শনের পর্যায়ে আছে—স্পর্শজনিত অনুভূতি লাভ হয়নি। তাতেই বা কত শূন্যতা! কৃষ্ণের স্পর্শের জন্য রাধার অন্তরে আগুন জ্বলছে। জীবন থাকবে কি যাবে—রাধা জানেন না—এখন 'জনু তনু দহত পতঙ্গী।'

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জর জর রহত কি যাত পরাণ ॥

সজনি জানলুঁ বিহি মোয়ে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥
সুনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরিসম লাগি।
রসবতি তাক পরশরসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জলু আগি ॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চাপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি-রস-মরিয়াদ ॥

কৃষ্ণকে নিমেষ মাত্র দর্শনেই রাধার এখন-তখন অবস্থা। যিনি কৃষ্ণকে দুই চক্ষু ভরে দেখতে পারেন, সেই রমণী ধন্যা। সখী কৃষ্ণকে ঘনশ্যাম বলে—কিন্তু রাধার মনে হয় বিজলির চমক। রাধার হৃদয় জলছে—তবু তাঁর জীবনে সাধ। রাধার এখন বিষম অবস্থা—পুলকে তনু-মন পরিপূর্ণ, বংশীধ্বনি-শ্রুত-কর্ণে অন্য প্রসঙ্গ আর ভালো লাগে না, গৃহধর্ম ও কুলধর্ম বিলুপ্ত, গৃহজন—পরিজন সম্পর্কে বোধ অন্তর্হিত—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে তনুমন মাতল না শুনে ধরম-লব-বেশ ॥
নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণ গণে বান্ধল মঝু মনে ধরম রহব কোন ঠাম ॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন-গরজনে অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ যদি হয় অনুরত পুছত গোবিন্দদাস ॥

আলোচ্য পদটিতে আলঙ্কারিক উপায়ে প্রেমের গভীরতা ও অতিশায়িতা বর্ণন করা হয়েছে। মণ্ডনশিল্পের অপূর্ব নিদর্শনরূপে আলোচ্য পদটি উল্লেখ্য।

॥ ৫ ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসার-পদ বর্ণনায় গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ কবিকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অভিসারের পদে একদিকে তত্ত্ব, অন্যদিকে কবিত্বশক্তির সমন্বয় ঘটেছে। গ্রীষ্মাভিসার, বাদলাভিসার, হিমাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার—অসংখ্য বৈচিত্র্যময় অভিসারের সমাবেশে গোবিন্দদাসের এ-জাতীয় পদাবলী মুখর। অভিসার বর্ণনায় ভাবের গভীরতা ও বর্ণনার মনোহারিতার চূড়ান্ত পরিচয় আমাদের কবি দেখিয়েছেন। এ জাতীয় পদে তাঁর তুলনা একমাত্র

বিদ্যাপতি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, জ্ঞানদাসের অধিকাংশ পদ তিমিরাভিসার বিষয়ক। সেক্ষেত্রে গোবিন্দদাস বহু বিচিত্র অভিসারের ঘন নিষেকে ভগবত প্রেম ও মানবীয় প্রেমের উষ্ণতার নিবিড় পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন।

রাধা অভিসারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এখন তাঁর তনু-মন কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আকুল উদ্দেশ্যে রাধা তাই দুশ্চর তপস্যায় মগ্না। আঙ্গিনায় জল ঢেলে পিচ্ছিল করে, কণ্টক পুঁতে—সেই পথে রাধা চলা অভ্যাস করছেন। হাতের কঙ্কণ উপহার দিয়ে তিনি সর্পবশের মন্ত্র শিখছেন। অন্যমনা রাধা পরিজনের বচন 'বধিরসম মানই'—

কণ্টকগাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ-গমন-ধনি সাধয়ে মন্দির যামিনী জাগি॥

তারপর অভিসারের সময় উপস্থিত হলে সঙ্গীরা রাধাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। এত বাধাবিপত্তি অতিক্রম, করে সেই দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার কি প্রয়োজন?

মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল-নিচোল।
সুন্দরি, কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥

বাধা একটা নয়, বহু। কিন্তু শ্রীমতী অবিচল। কোন বাধাই আর তিনি মানতে রাজী নন। মনের লজ্জা, দ্বিধা, সঙ্কোচ—অন্তরের সব বাধাকে যিনি অপসারিত করতে পেরেছেন, বাইরের বাধা তাঁর আর কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে?

কুল মরিযাদ-কপাট উদঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙারলু তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥

রাধা সঙ্কেত স্থানে যখন উপস্থিত হলেন, তখন পথের সব কষ্ট দূর হ'ল—কেননা কৃষ্ণের-'পিরীতি-মূরতি অধিদেবা'র—অনুগ্রহ লাভ করলেন তিনি—নতুন ভাব-ব্যঞ্জনায় সঙ্কেতিত হ'ল মিলনের নবতর তাৎপর্য্য।

যাকর দরশনে সব দুখ মিটল
সোই আপনে করু সেবা ॥

এখানেই বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরী কবি গোবিন্দদাস। অভিসারের অসহ্য কষ্টের অবসানের পর মিলনের পরম আনন্দে পথের সব কষ্টের কথা ভুলে গেলেন শ্রীমতী। অভিসারের দৈব-বিপাকের কথা লক্ষ মুখে যিনি বলেন, তিনি যে সেই মুহূর্তে সেই বেদনার উপলব্ধিতে ভরপুর নন, একথা কে না বুঝে? ঘন অন্ধকার রজনী, দূরদুর্গম পথে 'পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ', ঘোর বর্ষার অবিরল জলধারা, তার মাঝে শ্রীমতী অভিসারে চলেছেন—কিন্তু পথের দুঃখ তুচ্ছ করে, বংশীধ্বনি শ্রবণে উতলা শ্রীরাধা গৃহ-সুখ-আশা ত্যাগ করে যখন সঙ্কেত-স্থানে উপস্থিত হয়ে দয়িতের দেখা পেলেন, তখন—

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল ॥

আগেই বলেছি যে, অভিসারের সকল প্রকার বৈচিত্র্যের পরিচয় গোবিন্দদাসের রচনায় পাওয়া যায়—আর তা শিল্পগুণেও সমৃদ্ধ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

জ্যোৎস্নাভিসার—কুন্দকুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥
চন্দন চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর ॥
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি ॥

তিমিরাভিসার—

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত পহিরণ নীল নিচোল ॥
সুন্দরি হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি কুহু যামিনী ভয় ভাগি ॥

বর্ষাভিসার—

মেঘ যামিনি চললি কামিনি পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম শায়ক ছোড়ি মঞ্জীর লোল রে ॥

হিমাভিসার—

পৌখলি রজনি পবন বহ মন্দ।
চৌদিশে হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥

দিবাভিসার—

মাথাহিঁ তপন তপত পথ বালুক আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু দিনহি কয়ল অভিসার ॥

উন্মত্তাভিসার—

মণিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনি সো পহিরল দুই হাত।
কিঙ্কিণি গীম হার বলি পহিরল হার সাজাওল মাথ ॥
সুন্দরি অপরূপ পেখলুঁ আজ।
হরি অভিসার ভরম ভরে সুন্দরি বিছুরল সাজ বিসাজ ॥

॥ ৬ ॥

বিভিন্ন প্রকার নায়িকার বর্ণনায় গোবিন্দদাসের পদে বিকৃতির সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সকল পদে ভাব কল্পনার ঐশ্বর্য ও পদ বিন্যাসের চাতুর্য বর্তমান। এ সব বর্ণনায় তিনি পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেও সম্পূর্ণ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাসকসজ্জায় নায়িকা সঙ্কেতকুঞ্জ সাজিয়েছেন। সুবাসিত বারি, কর্পূরিত তাম্বুল, কুসুমিত শয্যা, উজ্জ্বল দীপ—তদুপরি চারিদিকে নিসর্গ-সৌন্দর্য্যও শোভা পাচ্ছে। এই উপচারে আজ রাধা 'আজু হরি ভেটব ঐছন মরম হামারি।'

সাজল কুসুম-শেজ পুন সাজই জারই জারল বাতি।
বাসিত থপুরে কপুরে পুন বাসই ভৈগেল মদন ভরাঁতি ॥
আজু রাই সাজলি বাসকশেজ।

কিন্তু কানুর পথ-আগমন-আশা বৃথাই গেল। রাধা সারানিশি কেঁদে কাল কাটালেন।—'পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে অধর নিরস ঘন শ্বাস।' শ্রীকৃষ্ণ এলেন—কিন্তু নিশা অবসানে। তখন রাধার খণ্ডিতা অবস্থা। তির্যক বচনে তিনি বিদ্ধ করেন কৃষ্ণকে। রাধার সম্মুখে অপরাধীর ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান কৃষ্ণ—তাঁর ললাটে সিন্দুর ও অঙ্গে নখচিহ্ন, চন্দন-রেণু ধূসরিত—যেন স্বয়ং শংকর সেখানে উপস্থিত।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহি সিন্দুরদহনা।
চন্দন চান্দ মাহা মৃগমদ-লাগল তাহে বেকত তিন নয়না॥
মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণ ফলে প্রাতরে ভেটলুঁ দুরহি দূরে রহু যেবা॥

তাঁর বাক্যবাণে বিদ্ধ হ'য়ে কৃষ্ণ চলে গেলে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন রাধা—শুরু হয় কলহান্তরিতার অবস্থা। কানুর মুরলিরবে আকৃষ্টা রাধা কানুরূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে দেহ-মন-প্রাণ সব দয়িতের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছিলেন--কিন্তু সে বহুবল্লভ কানু তাঁর প্রেম উপেক্ষা করে অন্য নারীতে আসক্ত। আবার তাঁর সঙ্গে বিবাদ করেও রাধা জ্বলে পুড়ে মরেন—কৃষ্ণকে আঘাত করেও তাঁর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আঙ্কল প্রেম পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ॥

এর আগে মান পর্যায়েও শ্রীমতীর অন্তহীন বিরহদশার বাঙ্ময়চিত্র আমরা গোবিন্দদাসের পদে দেখতে পাই। খণ্ডিতা শ্রীরাধা বাক্যবাণে কৃষ্ণকে জর্জরিত করলে কৃষ্ণ নানা প্রবোধ বাক্যে তাঁকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিমানে রাধা বেদনাকাতর কণ্ঠে বিলাপ করেন। সখীরা তাঁকে প্রবোধ দেন; কিন্তু রাধা কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারেন না। কলহান্তরিতা রূপ তারই পরিণতি। মানের আধিক্যে শ্রীরাধা বিলাপ করেন—

কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়াওই প্রেমে করয়ে জনি মান॥ ..

॥ ৭ ॥

গোবিন্দদাস সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসের কবি। মিলনের উল্লাস তাঁর কাব্যে অপরূপ সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। বসন্ত, রাস, হোরি—প্রভৃতি লীলা বর্ণনাকালে কবির কল্পনা, সৌন্দর্য্যবিন্যাস, ছন্দোবৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের কবি তাঁর সৃজন-প্রতিভার দ্বারা প্রকৃতির পটভূমিকায় মানবহৃদয়ের চিরন্তন আকুতি ও রভসলীলাকে অভিনব শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করেছেন। শরৎকালে রাসোৎসবের পটভূমিকাটি অতি সুন্দর—

শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুলমল্লিকা মালতিযুথি মত্ত মধুকর ভোরণি।

এ হেন পরিবেশে কুলবতী-চিত্ত-চোর মাধবের মুরলিগানে রাধা ঘর ছেড়ে এসেছেন—তাঁর 'এক নয়নে কাজর রেহ বাহে রঞ্জিত কঙ্কন একু একু কুণ্ডল ডোলনি।' রাধামাধবের মিলন দৃশ্যটি আঁকতেও আমাদের কবি ভোলেন নি—

ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠান। ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
রাধামাধব মেলি।

হোরিলীলায় রাধাকৃষ্ণ বিবাহ করছেন—তাঁদের সর্বাঙ্গে চুয়াচন্দন, পরিমল কুঙ্কুম, ফাগুরঙ্গ—সঙ্গীতের অমৃত-লহরীতে দিক্‌দিগন্তর আচ্ছন্ন।

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছান্দ।

বসন্তকালীন রাসেও সেই মিলনের আনন্দ। পরিকল্পনা এখানে উল্লাসের আধিক্যে মুখর, সম্ভোগবর্ণনার মধ্যে কবিকল্পনা যেন 'আহ্লাদে আটখানা' হয়ে উঠেছে। উল্লাসরসের পদে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়—সমালোচকের এই অভিমত যথার্থ।

॥ ৮ ॥

গোবিন্দদাসের কয়েকটি রসোদ্গারের পদ আছে। এ জাতীয় পদ রচনায় কোন বৈষ্ণব কবি-ই তেমন সাফল্যলাভ করতে পারেননি। কারণ মিলন-লীলার স্থূল বর্ণনা কোন কবি-কল্পনাকে তেমন জাগ্রত করতে পারে না। কিন্তু গোবিন্দদাসের রসোদ্গারের পদগুলি রচনাপারিপাট্যে অতি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

উপমাদি অলঙ্কারের সাহায্যে তিনি বর্ণিতব্য স্থূল বস্তুকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। এখানেই তাঁর কবিকলার সার্থকতা। বলা যেতে পারে যে, গোবিন্দদাসের কবিকৃতির এখানে অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে—আর তাতে তিনি সফলও হয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত—

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম। মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম ॥
কনকলতায়ে যেন তরুণ তমাল। নব জলধরে যেন বিজুরি রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ। দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ ॥
দুহুঁক অধরামৃত দুহুঁ করু পান। গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান ॥

সখীরা যখন রাধাকে সন্দেহ করে জিজ্ঞাসা করছেন—'কাহাঁ শিখলি ইহ রঙ্গ', তখন রাধা উত্তর দেন—

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি ॥
দূর কর এ সখি সো-পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ ॥

—কিন্তু 'বলব না' মনে করেও রাধা রভস-লীলার সব কথা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আসলে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে শ্রোতাকে আরো আগ্রহান্বিত করে তুলবার জন্যই এই পন্থা। অন্যদিকে সেই মিলনলীলার অপরিসীম মাধুর্য্য-নিবিড় আনন্দটুকু সখীদের সামনে প্রকাশ না করেও থাকা যায় না। এখানেই রসোদ্গারের তাৎপর্য। রাধা সেই প্রিয়-মিলনস্মৃতি নিজে আস্বাদন করছেন রসোদ্গার বর্ণনার মধ্য দিয়ে—

নবঘন কিরণ বরণ নব নাগর মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ন কোণে মদন জাগায়ল মৃদু মৃদু হাসি ভোর ॥
সজনি কি কহব রজনি আনন্দ।
স্বপন বিলোকন কিয়ে ভেল দরশন মঝুমনে লাগাল ধন্দ ॥…

মিলনের স্মৃতিচারণার মুহূর্তে শ্রীরাধা কানুর প্রেমকে নতুনভাবে অনুভব করছেন। তাঁর হৃদয়মন্দিরে কানু নিদ্রিত, প্রেম-প্রহরীরূপে সেখানে জেগে আছে। গুরুজন-পরিজনের ভয়ও আর নেই। কানুর প্রতি প্রেমের শপথ বাণীই নানাভাবে উচ্চারিত—

হৃদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেমপ্রহরি রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌরসদৃশ ভেল দূরহি দূরে বহু ভাগি ॥

সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ ভুজঙ্গে গরসিল কুল দাদরি মতি মন্দ ॥
আপনক চরিত আপে নাহি সমুঝিয়ে আন করত হোয় আন
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে গুহপতি শপতিক ঠান ॥
নয়নক নীর থীর নাহি বান্ধই না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে গোবিন্দদাস এক সাখী ॥

॥ ৯ ॥

গোবিন্দদাসের বিরহ-পর্যায়ের অনেক পদ আছে। বর্ণনার চাতুর্যে ও ভাবকল্পনার ঐশ্বর্যে পদগুলি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু বিরহে চিত্রধর্ম অপেক্ষা চিত্তধর্ম প্রধান বলে—হৃদয়ানুভূতির সূক্ষ্ম কারুকার্য সেখানে লক্ষ্য করা যায়। বিরহে সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল নয়, চিত্তগহনের নিবিড় অনুভূতিটুকুর অলঙ্কৃত প্রকাশেই কাব্য সার্থক হয়ে ওঠে। গোবিন্দদাসের কবিধর্ম বহিরঙ্গ বর্ণনায় পথ খুঁজে পায়। বিদ্যাপতিও অনুরূপ। কিন্তু বিরহের পদে বিদ্যাপতি অলঙ্করণের লোভ অনেকটা সম্বরণ করে রাধার হৃদয়ের নিবিড় বেদনার বাঙ্ময় রূপের রসঘন প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস এ ক্ষেত্রে গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। হৃদয়ানুভূতির যে রাজ্যে উপনীত হলে সব কথা হারিয়ে যায়, অথচ 'না বলা বাণী'-ই যেখানে শতভাষী হয়ে ওঠে—গোবিন্দদাস সে পথ অনুসরণে তৎপর নন। তাঁর রাধা এ স্তরেও আপন বেদনায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। আর আমাদের কবি সেই শাশ্বত বেদনাকে রঙে-রসে মণ্ডিত করে প্রকাশের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। তবে তুলির এক এক আঁচরে গোবিন্দদাস সেই নিত্যবেদনাকে রূপায়িত করেছেন। তাতে বিশ্বপ্রকৃতিও রাধার হৃদয়-বেদনায় আকুল হয়ে উঠেছে।

মিলনের পরম লগ্নে রাধার মনে অমঙ্গল আশঙ্কা সংকেতিত হচ্ছে। মথুরা থেকে কে যেন এসেছে। তাকে দেখে—রাধার দেহ-মন কেঁপে উঠেছে, মন চঞ্চল হয়ে পড়েছে—নিদ্রা হয়েছে দূরীভূত।

কিয়ে ঘর বাহির চীত না রহ থির
জাগর নিদ নাহি ভায়।

গাঢ়ল মনোরথ তৈখন ভাঙ্গত
কিয়ে সখি করব উপায় ॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে
সঘনে রোয়ত শুকসারি।
গোবিন্দদাস আনি সখি পুছহ
কাহে এত বিঘিনি বিথারি ॥

মাধব কঠিন কর্তব্যের আহ্বানে মথুরা চলে যাবেন—অক্রূর এসেছেন তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নাম অক্রূর, কিন্তু ব্রজনারীদের কাছে তিনি ক্রূরতার প্রতিমূর্তি। তাঁর আগমনবার্তা ঘরে ঘরে অমঙ্গল ঘোষিত করেছে। আগামীকাল প্রভাতে কৃষ্ণ চলে যাবেন। সখীগণ মন্ত্রণা করেন—'রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর মন্দিরে রহু বনমালী।' শ্রীরাধা আর্তনাদ করে উঠেন—যার জন্য তিনি গুরুজনগঞ্জনা উপেক্ষা করেছেন, কুলবতীর ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়েছেন, মণিময় মন্দির ছেড়ে, অভিসারের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে, 'কণ্টক কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর পন্থ নেহারত মোরি'—সেই কঠিন-প্রাণ-কৃষ্ণ আজ অক্লেশে তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আবার কখনো রাধার মনে হচ্ছে—'হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ। কৈছন তেজব নবিন সনেহ ॥' দোষ কৃষ্ণের নয়, পাপী অক্রূরের। তিনিই ষড়যন্ত্র করে এই বিপত্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু মাধবকে আটকে রাখা গেল না। হরি মথুরাপুরে চলে গেলেন। তাঁর অন্তর্ধানে দিক্‌দিগন্তর শূন্যতায় পরিপ্লাবিত হয়ে গেল। শ্রীমতী ডুকরে কেঁদে ওঠেন—

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শুন ভেল ॥…
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান ॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥

বিরহের নিদারুণ তাপে জর্জরিত শ্রীরাধার এই অভিশাপ-বাণী অতি দুঃখ থেকে উৎসারিত। এই উক্তির মধ্য দিয়েই তাঁর বিরহের তীব্রতা অনুভব করা যায়। রাধা আর্তনাদ করেন—প্রেম-অঙ্কুরের উদ্‌গম হতে না হতেই রৌদ্রে তা শুকিয়ে গেল। যুগল পল্লাশের অবকাশ ঘটল না। কৃষ্ণ রাধার জীবনে

প্রতিপদের চাঁদের মত উদয় হয়েই অস্ত গেলেন—রাধাকে নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে রেখে। কণামাত্র সুখের আশাও রাধার পূর্ণ হল না। মাধব এমন নিষ্ঠুর হলেন—

> প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।
> প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা ।।
> সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
> অবধি রহল বিছুরাই ।।
> কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব মাধবি মধুপ সুজান।
> অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে বিঘটিত বিহি নিরমাণ ।।
> পাপ পরাণ আন নাহি জানত কানু কানু করি ঝুর।
> বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দদাস রসপূর ।।

শ্রীমতি বিলাপ করেন; এখন বিলাপই তাঁর একমাত্র সম্বল। সখিকে সম্বোধন করে তিনি বলেন—সখি, আমার প্রিয়তম প্রাণ থেকে প্রিয়। কিন্তু সেই বজ্রসম নিষ্ঠুর হৃদয় মাধব তো আজও এলেন না। "নখর খোয়ায়লু দিবস লেখি লেখি। নয়ন আন্ধুয়া ভেল পিয়া পথ দেখি॥" কিন্তু, তবু, প্রিয় এলেন না। আমার দোষগুণ কি, কিছুই জানি না। তবু প্রিয় আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।··এখন—

> হেন জন নাহি কহয়ে পিয়া পাশ ॥
> হেন মনে হোয়ে সখি যাও সেই দেশ।

রাধা বিপাকে পড়েছেন। তাঁর নয়নে নিদ্রা ও বয়ানে হাসি নেই। তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন। প্রিয়হারা দিনগুলি কেমন করে কাটবে, তাও তিনি জানেন না। অভাগিনী রাধার বিধি প্রতিকূল।

> পিয়া গেল মধুপুর হাম কুলবালা। বিপথে পড়ল যৈছে মালতিক মালা ॥
> কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি। কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি ॥
> নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস। সুখে গেও পিয়া সঙ্গে দুখ মঝু পাশ ॥
> যত ছিল মনোরথ সব ভেল বাদ। পরিহরি গেল বন্ধু বিনি অপরাধ ॥
> হাম নারি অভাগিনী বিহি ভেল বাম। পিয়া গেল মধুপুর ন পূরল কাম ॥

ছয় ঋতু, বারো মাস ধরে রাধার অন্তহীন বিরহদশা বয়ে চলে। প্রেমানল বেড়েই যায়। শেষ পর্যন্ত রাধা ঠিক করেন—মরণেই তিনি শান্তি পাবেন:—

মরদেহে যাঁকে পান নি—মৃত্যুর পরে সর্বভূতে মিশে গিয়ে তিনি সেই দয়িতের নিবিড় প্রেমস্পর্শ লাভ করবেন। প্রভু অরুণচরণে যেদিকে যাবেন, সেই মৃত্তিকায় আমি মিশে থাকব। যে সরোবরে তিনি নিত্যস্নান করেন, আমি যেন সেই সরোবরের জল হয়ে থাকি। যে দর্পণে প্রভু আপন মুখ দেখেন, আমার দেহ তাতে জ্যোতি হয়ে থাকুক। মরণে রাধার দুঃখ নেই। কারণ বিরহও তো মরণতুল্য—"এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ। ঐছে মিলই যব গোকুলচন্দ্র॥" তবু এই সান্ত্বনা যে, মরণে বরং তিনি কৃষ্ণকে কাছে পাবেন।

॥ ১০ ॥

অবশেষে সব দুঃখের অবসান হ'ল। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মানস-মিলন ঘটল। আজ প্রিয় আসবেন—তার সব শুভসংকেত অঙ্গে ব্যক্ত হচ্ছে। রাধার দৃঢ় বিশ্বাস—কৃষ্ণ অবশ্যই আসবেন।

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া দৈবে কহল শুভবাণী।
শুভসূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত অতয়ে নিচয় করি মানি।
শুন সজনি আজু মোর শুভদিন কেল।
সুখসম্পদ বিহি আনি মিলায়ব ঐছন মতিগতি ভেল॥

তার জন্য প্রস্তুতি চলছে। বহিরঙ্গ সাজসজ্জার সঙ্গে মিলেছে অন্তরের বাঁধভাঙা উল্লাস। কারণ—'প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘরে আওব'। অবশেষে প্রিয়মিলনে সব উচ্ছ্বাস, সব আকুলতা মিলিয়ে গেল। পরম আনন্দের কলরোল ধ্বনিত হতে থাকল। নদী এসে মিলল সাগরে।

মধুরিম হাস— সুধারস বরিখণে
গদ্‌গদ রোধয়ে ভায়।
চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

॥ পদাবলীর নানা দিক ॥

তত্ত্বের রসপ্রকাশ

বৈষ্ণবপদাবলী বৈষ্ণবতত্ত্বের রসপ্রকাশ। প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে তত্ত্ব-ভাবনা তেমন প্রখর ছিল না। বরং জীবন-রসে তা ছিল উচ্ছল। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—"প্রাচীন বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় ধর্মের প্রেরণা একান্তই গৌণ ছিল, কাব্য-প্রেরণাই সেখানে আসল কথা।...তাঁহারা কবি ছিলেন, নর-নারীর প্রেম সম্বন্ধে তাঁহারা বিবিধ কবিতা রচনা করিয়াছেন; সেই একই দৃষ্টি—একই প্রেরণা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন।"

কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেল। শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনের পাবনী স্পর্শে বৈষ্ণব ধর্মের শীর্ণ খাতে নব-জীবনের উত্তাল কলরোল শোনা গেল। এতদিন রাধাকৃষ্ণলীলা অমূর্ত তত্ত্ব ভাবনা মাত্র ছিল। চৈতন্যদেব রাধাপ্রেমের নিগূঢ় রহস্যের মূর্ত বিগ্রহরূপে দেখা দিলেন। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণ-লীলারহস্য প্রকটিত করতে আবির্ভূত হ'লেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্ররূপে আবির্ভূত। কোন তত্ত্ব, কোন উপদেশ নয়, আপন জীবন সাধনার ঘননিষেকে মহাপ্রভু অমূর্ত রাধাকৃষ্ণলীলা রসরূপে মূর্ত করে তুললেন। অন্যদিকে তাঁর প্রেরণায় বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী প্রভুগণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শন ও রসতত্ত্বকে গ্রন্থাকারে বিধৃত করলেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম এক সুস্পষ্ট দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এরপর থেকে বৈষ্ণব কবিগণ পদ রচনায় সেই তত্ত্বকেই রসরূপ দান করতে লাগলেন।—"বৈষ্ণবপদকর্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার জন্য পদাবলীর রচনা করেন নাই; সেগুলি তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মাত্র। এ অবস্থায় পদাবলী-রচনা করিতে যাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বাবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ ও শ্রীরাধা যে সেই ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা-প্রকৃতি—এই মূলীভূত তত্ত্বটি তাঁহারা কদাপি বিস্মৃত হন নাই। পদাবলীর পাঠকও এই তত্ত্বটি বিস্মৃত হইবেন না।" (পদ-কল্পতরু/৫ম খণ্ড)।

বৈষ্ণবতত্ত্বে, সকল মাধুর্যের ঘনীভূত বিগ্রহ কৃষ্ণ আপন হ্লাদিনী-শক্তি দিয়ে রাধাকে সৃষ্টি করলেন—মূলে রাধাকৃষ্ণে কোন ভেদ নেই। 'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥' রসলীলার নিমিত্ত সেই অদ্বয় সত্তার দ্বিধা-বিভক্ত রূপায়ণ। আবার লীলার অবসানে 'দুই দেহ, এক আত্মা' একদেহে মিশে গেল। বৈষ্ণবপদাবলী সেই অপরূপ লীলাতত্ত্বেরই বাঙ্ময় রসরূপ…"বিশেষতঃ পদকর্তারা ছিলেন বৈষ্ণব সাধক। কাজেই বৈষ্ণবলীলা-তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধাশ্যামের প্রণয়লীলাই পদাবলীর মুখ্য বিষয়বস্তু।" (পদাবলী সাহিত্য)।

কবি কর্ণপূরের অলঙ্কার কৌস্তুভ, রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি মহাগ্রন্থে লীলাতত্ত্ব সূত্রাকারে বিধৃত করা হয়েছিল। তারপর থেকে রাধাকৃষ্ণলীলারসাত্মক পদ রচনায় উক্ত গ্রন্থধৃত তত্ত্বগুলিই বৈষ্ণব কবিদের উপজীব্য হয়ে উঠল। ফলে একই ভাব বহু কবির কণ্ঠে বহুভাবে ধ্বনিত হতে লাগল। বস্তুতঃ, এ কারণেই বৈষ্ণব-পদাবলী সম্প্রদায়গত কাব্য-কলার বাহনমাত্র হয়ে উঠল।

বৈষ্ণব কবিগণ মূলতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলারসাত্মক পদ রচনাতেই অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। বৈষ্ণব মতে,

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

পদকর্তা এই কথাই বলেছেন—ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপে—

হিয়ার মাঝারে মোর এ'ঘর মন্দির গো
তাতে রতন-পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানো হ'য়েছে তায়
তাতে শ্যামচাঁদ ঘুমায়্যা রয়েছে॥…
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

পদাবলী ভক্তিরসের কাব্য;—এই ভক্তি আসলে প্রেম-ভক্তি—যা সাধ্যবস্তু হিসাবে সর্বোত্তম। এই প্রেমভক্তির আবার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও

মধুর—এই পাঁচটি স্তর। বৈষ্ণবভক্ত তত্ত্বের সঙ্গতিসূত্রে পদাবলীর রস আস্বাদন করেন ভক্তি সাধনার অর্ঘ্য হিসাবে। পদকর্তাগণও রসতত্ত্ব-প্রবক্তা মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রেমভক্তির বিভিন্ন স্তর—বিশেষ করে সর্বসাধ্যসার কান্তা-প্রেমের স্তর-পারম্পর্য ছন্দায়িত করেছেন। পূর্বরাগের পদে অখিল রসামৃত সিন্ধু, পরম নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ, অভিসার পর্যায়ে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সেই পরম স্বরূপের উদ্দেশ্যে যাত্রা, নিবেদন পর্যায়ে সর্ব সমর্পণ, প্রেম-বৈচিত্ত্যে প্রিয়কে পেয়েও হারানোর ভয়, বিরহ-স্তরে প্রিয়তমকে হারিয়ে সর্ব-শূন্যতার অনুভূতি। নিদারুণ বেদনার পরম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চলে রাধার নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার সাধনা।—মহাভাবস্বরূপিণী রাধার জীবনচিত্র—

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥···
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ॥···

"এই যে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধিকার আত্ম-বিলুপ্তির সাধনা, এরই মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এই জন্যই বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-তত্ত্বের রসভাষ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।" (ডঃ সতী ঘোষ)।

॥ প্রাক্, সমসাময়িক ও পরচৈতন্য বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনা ॥

কালগত বিচারে সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি—প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী। শুধু কালের দিক থেকে নয়, আদর্শ ও মর্জির দিক থেকেও এই পার্থক্য সুচিহ্নিত। এই পার্থক্যের মূল স্বরূপও আমাদের জানা প্রয়োজন।

(১) চৈতন্যপূর্বযুগের কবির কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক আদর্শগত প্রেরণা ছিল না। আর গোষ্ঠীগত প্রেরণা না থাকার জন্যই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির ব্যক্তিক অনুভূতির প্রকাশে পদাবলী হয়ে উঠতে পেরেছে বিশিষ্ট লক্ষণের অধিকারী। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের কবি-সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাধা-কৃষ্ণলীলার মাধুর্য উপভোগ করেছেন। তাঁদের মানস-সংস্কৃতিতে চৈতন্য-জীবন-সাধনা যে বৈভবের সঞ্চার করেছিল, তার ফলে ধর্মকেন্দ্রিক পটভূমিকায়

সংস্থাপিত রাধাকৃষ্ণলীলা নতুন রূপে রূপায়িত ও আস্বাদিত হ'তে থাকল। এর ফলেই আমরা দেখি, বৈষ্ণব কবিতায় ভাব ও রূপকলার ক্ষেত্রে এক অভিনব পরিবর্তনের সূচনা। একদিকে যেমন বল্গাহীন আবেগোচ্ছ্বাসের তূর্য সীমায়িত হ'ল চৈতন্যজীবনতাৎপর্যের গণ্ডীতে, অপরদিকে আবার বৈষ্ণব কবিতায় নরনারীর প্রেমের প্রাকৃত ও সংকীর্ণ আবেদন সমুন্নতিলাভ করল চৈতন্যজীবন মহিমার দ্বারাই। গৌরচন্দ্রিকার পদে তারই সূচনা।

(২) রাধাকৃষ্ণলীলা সম্পর্কে কোন ধর্মবিশ্বাস প্রাক্-চৈতন্যযুগে না থাকলেও চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জয়দেবের পদ আস্বাদন করা চলে। সেখানে 'হরিস্মরণে সরসং মনো'—এর সঙ্গে 'বিলাস কলাসু কুতূহলম্'—এর আবেদন-ও উপলব্ধ হয়। কিন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণবপদাবলীর পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব নয়।

(৩) প্রাক্চৈতন্য যুগে ভক্ত-কবির মানসে মুক্তি বাঞ্ছাই ছিল প্রধান। বিদ্যাপতির পদে আমরা পাই :

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল দেহ এক দীনবন্ধু॥

কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের প্রার্থনার পদে মুক্তি-বাঞ্ছার চিহ্নও থাকল না। সাধকের কাছে তখন—'মুক্তি বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥' ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি এবং গোপীদিগের অনুগত হয়ে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার সুযোগ লাভ—তাদের চরম প্রার্থনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

(৪) প্রাক্চৈতন্য যুগে কৃষ্ণের মাধুর্যভাবের সঙ্গে ঐশ্বর্যভাবের মিশ্রণও দেখা যায় সাহিত্যে। পরচৈতন্যযুগে ঐশ্বর্যভাব তিরোহিত হ'ল। কৃষ্ণপ্রেম চরম ও পরম পুরুষার্থ বলে পরিগণিত হ'ল। বলা হোল—'প্রেম মহাধন। কৃষ্ণকে মাধুর্যরস করায় আস্বাদন॥' সাধ্যাবিধি সুনিশ্চিত এই প্রেমের স্তর পরম্পরায় আবার রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। বস্তুতঃ মধুররসের সাধনাই বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে পরিগণিত হ'ল।

(৫) প্রাক্চৈতন্যযুগে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। কৃষ্ণকীর্তনের একাধিক স্থানে রাধাকে বলা হয়েছে 'রাইচন্দ্রাবলী'। কিন্তু পরচৈতন্যযুগে রাধা নায়িকা,

চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা। অধিকন্তু, প্রাক্‌চৈতন্য যুগের সামান্যা নায়িকা রাধা পরচৈতন্যযুগে মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীতে রূপান্তরিত। 'কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥'

(৬) চৈতন্যোত্তর যুগের সাধকবৃন্দ চৈতন্যদেবের ভগবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় তাঁর আবির্ভাবের যে কারণ অনুমিত হোল, সেই বিশ্বাসের বাঙ্ময় রূপদানই তখন কবি-সাধকদের প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠল।

(৭) প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই ছিলেন লীলাশুক। শুকপক্ষীর মত রাধাকৃষ্ণলীলা তাঁরা মানসনয়নে দর্শন আস্বাদন ও বর্ণন করেছেন। যেমন, লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ও জয়দেব। কিন্তু পরচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবিগণ গোপীভাবে ভাবিত—রাগানুগা মার্গের সাধক।

(৮) প্রাক্‌চৈতন্যযুগের অমূর্ত-তত্ত্ব-ভাবনা বিষয়ীকৃত হয়েছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে। তাই পরচৈতন্যযুগে কবিগণ—চৈতন্যজীবনবিভার দ্বারা রাধাপ্রেমের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এ কারণেই চৈতন্যদেব 'মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরি সার।'

(৯) প্রাক্‌চৈতন্য যুগের পদাবলী সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসাশ্রিত; কিন্তু পরচৈতন্য যুগের পদাবলীতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের পরিস্ফূর্তি লক্ষণীয়। মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। সমসাময়িক ও পরচৈতন্য বৈষ্ণব-কবিকুলের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নিরূপণে দেখা যায় যে, সমসাময়িক বৈষ্ণব সাধকের চোখে চৈতন্যদেবের ভগবৎ স্বরূপের সঙ্গে মানবিক রূপটিও মিশ্রিত ছিল। সমসাময়িক ভক্তবৃন্দ চৈতন্যদেবের ভগবৎস্বরূপে বিশ্বাসী হলেও পরিপূর্ণভাবে তাঁর তত্ত্বস্বরূপ নিরূপণের সুযোগ পাননি। এর প্রথম কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব এবিষয়ে ভক্তদের বিন্দুমাত্র উৎসাহকেও প্রতিহত করেছেন। দ্বিতীয় কারণ, তাঁরা চাক্ষুষ দর্শনে মহাপ্রভুর নভোস্পর্শী ব্যক্তিত্বের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলেন, তার মধ্যে তার মানবপরিচয়টি একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। 'নিমাই সন্ন্যাসের কবিতায় তাঁদের আকুল ক্রন্দনে বৈষ্ণবত্ব ও ভক্তি অপেক্ষা মানবিক বেদনার রোলই উচ্চকণ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।' (ক্ষেত্র গুপ্ত)। অনুরূপ কারণে, মাতার জন্য চৈতন্যদেবের আকুলতা-ও ভক্তদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ধর্ম-বুদ্ধি অপেক্ষা মানববুদ্ধি জয়ী না হলে তা সম্ভব নয়।

উভয় পর্যায়ের কবিবৃন্দই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক যুগের কবিবৃন্দ গৌরাঙ্গদেবের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা একান্ত ভাবে সজীব ও প্রত্যক্ষ; তার প্রকাশ ভঙ্গী পারিপাট্যহীন ও সরল। কারণ তাঁদের কাব্যিক অভিজ্ঞতা (Poetic experience) ছল ব্যক্তিক ও প্রত্যক্ষ। তাই সেখানে কল্পনা ও মাণ্ডনিকতার অবসর ছিল অতি সংকীর্ণ। ফলে বর্ণনা সরল ও অনাড়ম্বর। কিন্তু পরচৈতন্য যুগের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে বিষয়বস্তুর মহিমা অভিন্ন হলেও মণ্ডন-পারিপাট্য এবং চৈতন্যোত্তর যুগের দার্শনিক ও আলংকারিক ঐতিহ্যের চরণপাত অদৃশ্য থাকেনি। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী কর্তৃক বিধৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক ও রসতত্ত্ব বহুল প্রচারিত হওয়ার পর যত পদ রচিত হয়েছে, তা সবই সেই তত্ত্বের রসরূপ। ফলে বহুক্ষেত্রে তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকলেও তা কাব্য হয়ে উঠতে পেয়েছে কদাচিৎ। গতানুগতিক প্রথাবদ্ধতার জলাভূমিতে আটকে পড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর পরে বৈষ্ণব কবিতা কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে, সহজিয়া সাধনার পঙ্কপল্বলে বৈষ্ণবের সুউচ্চ আদর্শবাদ যেমন, বৈষ্ণব কবিতা তেমনি তার ঔজ্জ্বল্য অনেক পরিমাণে হারিয়ে ফেলল।

॥ রোমান্টিকতা ও বৈষ্ণব কবিতা ॥

রোমান্টিকতার সংজ্ঞা : "The Romantic spirit can be defined as an accentuated predominance of emotional life, provoked or directed by the exercise of imaginative vision, and in its turn stimulating or directing such exercise. Intense emotion coupled with an intense display of imagery, such is the frame of mind which supports and feeds the new literature." আবেগপ্রাণতা, কল্পনার ঐশ্বর্য, মানস তুরগের বাধাবন্ধনহীন গতি, অতীত প্রীতি, বিস্ময়বোধ, প্রকৃতির বৈচিত্র্য আস্বাদন, অজানার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, অধরাকে না পাওয়ার বেদনা ও নৈরাশ্য—রোমান্টিকতার লক্ষণ। রোমান্টিক কবি বর্তমান পরিবেশে অসুস্থমনা হ'য়ে ওঠেন, আদর্শ জগতের সন্ধান পান অতীত বা ভবিষ্যতের মানসলোকে। রোমান্টিক কাব্যের ক্ষেত্রে এই 'feeling of nostalgic strangeness' একটি বিশেষ লক্ষণ। রোমান্টিক

কবির আত্মবোধ অতি প্রখর। কারণ অনুভূতি ও কল্পনার সাহায্যেই সৃষ্ট হয় রোমান্টিকতার অন্যান্য লক্ষণ। এ কারণে রোমান্টিকতার সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো সংজ্ঞা হোল: 'An extraordinary development of imaginative sensibility.'

বৈষ্ণব কবিতা রোমান্টিক কিনা, এ নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। একদা রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীকে মর্তপ্রেমানুভূতির অতি সূক্ষ্ম প্রকাশরূপে বিচার করেছিলেন। আধুনিক সমালোচকও বলেন: 'সাহিত্য হিসাবে যখন বিচার করিব, তখন বলিব বৈষ্ণব কবিতা বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেম কবিতা।'

ধর্মগীতি রোমান্টিক কবিতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে। চর্যাপদে গুহ্যসাধনতত্ত্বের প্রকাশ হলেও, রোমান্টিক গীতিকবিতার সুরমূর্ছনা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়ের ভজন গাথা, সুফীদের ধর্মসঙ্গীত রোমান্টিকতার লক্ষণ-যুক্ত। ঈশ্বরকে প্রেমিক, ভক্তের নিজেকে প্রেমিকা জ্ঞানে এই ভজন দেহকেন্দ্রিক জীবনরসের আধারেই পরিবেশিত। ব্লেকের কবিতায় ধর্মচেতনা রোমান্টিকতার পানপাত্রে পরিবেশিত হয়েছে।

বৈষ্ণব-পদাবলী রসমূল্য তার তত্ত্বমূল্য অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। তত্ত্বজ্ঞানহীন রসিকের কাছে বৈষ্ণবপদাবলী বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেম-কবিতা হিসাবে আস্বাদিত হওয়ার পক্ষে কোন বাঁধা থাকে না। সেই দৃষ্টিতে নরনারীর মিলনবিরহের শাশ্বত রূপায়ণ বৈষ্ণব পদে। পূর্বরাগ, অভিসার, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য, নিবেদন, ভাবসম্মিলন—এই প্রেমচেতনারই বিচিত্র ও অতিসূক্ষ্ম প্রকাশ। নিত্য নবায়মান বৈচিত্র্যের মাঝে প্রেমের আস্বাদনমূল্য বৃদ্ধি পায়। মর্ত-প্রেমের বাতায়নে দৃষ্ট যে জীবনরহস্য উপলব্ধ হয়, প্রেয়সীর নয়ন-পল্লবের চকিত ঝলকে যে সৌন্দর্য উন্মোচিত হয়, তা প্রতি মুহূর্তেই প্রেমিককে নিত্য নতুন অনুরাগের মহিমায় অভিষিক্ত করে তোলে। বৈষ্ণব কবি প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপটি রঙেরসে মণ্ডিত করে তুলেছেন। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের আনন্দ-অশ্রুজল-গাথা-সমৃদ্ধ রোমান্টিক প্রেমের কবিতা হিসাবে এর সৌন্দর্যও তুলনাহীন।

কিন্তু মর্তপ্রেমের রোমান্টিক রসরহস্য বৈষ্ণব পদাবলীকে আবৃত করলেও একে পুরোপুরি রোমান্টিক কবিতা আখ্যা দেওয়ার পক্ষে বাঁধা আছে। বৈষ্ণব-পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণব মহাজন রাধাকৃষ্ণলীলাকে বাঙ্ময় রসরূপ

দিয়েছেন সাধনার অঙ্গ হিসাবে। সুতরাং ধর্মবিবিক্ত রোমান্টিক কাব্যসৌন্দর্যের আকররূপে বৈষ্ণব পদাবলীর বিচার করতে গেলে তা হবে খণ্ডিত। তাছাড়া বৈষ্ণব পদাবলী গোষ্ঠীবদ্ধ কবিকলা—একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও দর্শনের কাব্যরূপ। কবিগণের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের কোন সুযোগও এখানে নেই। রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন ও চিত্রণ করতে হোত শুক অথবা সখী ভাবে। কিন্তু রোমান্টিক প্রেমকবিতা ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার রসরূপায়ণ। তৃতীয়ত, রোমান্টিক প্রেমকবিতা দেহকেন্দ্রিক। দেহের রহস্যে বাঁধা যে অদ্ভুত জীবন কবিকে উদ্দীপ্ত করে, রোমান্টিক কবি নানা চিত্রকল্পের সাহায্যে তাকেই চিত্রিত করেন। মর্তপ্রেমচেতনা এখানে বড় কথা। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব তত্ত্বে, রাধাকৃষ্ণ অপ্রাকৃত, চিন্ময়—লৌকিক জীবনপাত্রে তাঁদের লীলা-বিলাস চিত্রিত হলেও অলৌকিক রহস্যরাজ্যের দিকেই তা ইঙ্গিত করে। সুতরাং রাধাকৃষ্ণলীলাকে মর্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মানদণ্ডে বিচার করা চলে না। চতুর্থত, রোমান্টিক প্রেমকবিতায় কল্পনার যে বিপুল ঐশ্বর্যের সমারোহ দেখানো সম্ভব, বৈষ্ণব কবিতায় তা নয়। কারণ বৈষ্ণব মহাজন কবির লেখনীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বকথাকে কাব্যে প্রকাশ করতে হোত। বিভিন্ন কবি একই বক্তব্যকে একই উপমা ইত্যাদির সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। অনুকৃতির তাই এত ছড়াছড়ি। মর্তজীবনবাসনার উষ্ণতা উপজীব্য হিসাবে এ কবিতায় লক্ষ্য করা যায় না। তাই নানা দিক থেকে বৈষ্ণব কবিতাকে নিছক রোমান্টিক কবিতা হিসাবে অভিহিত করতে আমাদের আপত্তি আছে।

তবে অপ্রাকৃত, চিন্ময় রাধাকৃষ্ণলীলাকে মহাজন কবি জীবনানুগ করে চিত্রিত করেছেন। ব্রজলীলার অলৌকিক রহস্য মর্তপ্রেমের আঙ্গিক ও ভাষাতে তাঁরা প্রকাশ করেছেন, বোধ হয় অন্য প্রকাশ-পথের সন্ধান পাননি বলেই। মানবজীবনরসের পানপাত্রে বৈষ্ণব মহাজন কবি সেই অতীন্দ্রিয়, লোকাতীত প্রেমকে পরিবেশন করেছেন সত্য। লৌকিক সৌন্দর্যের পথ বেয়ে বৈষ্ণব পদাবলী অলৌকিকের রাজ্যে নিয়ে গেলেও লৌকিক সৌন্দর্যচিত্রও আমাদের মুগ্ধ করে। তাই অন্তরে তত্ত্বকথা থাকলেও বাইরের রূপবৈচিত্র্য আমাদের আকৃষ্ট করে। শ্রদ্ধেয় সমালোচক তাই বলেন—

"বৈষ্ণব পদাবলীর পশ্চাদ্‌পটে যদি-ও সদাসর্বদা নিত্য বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর অখণ্ডসত্তা বিরাজ করিতেছে, তবুও নিসর্গ সৌন্দর্য, রাধাকৃষ্ণের

নিবিড় মিলন-রস এবং তীব্র বিরহবেদনা ক্ষণেকের জন্যও ভাববৃন্দাবনকে মর্ত-ধূলিতলে টানিয়া আনে।' (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ভাবের গভীরতা, আন্তরিকতা, মন্ময়তা ও মর্ম-স্পর্শিতার বৈশিষ্ট্যে বৈষ্ণব কবিতা অনবদ্য। কল্পনার সুউচ্চ মহিমার সাহায্যে বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণলীলার ভাবটি রঙ্গে ও রসে মণ্ডিত করে তুলেছেন। তবু তত্ত্বভাবনার কথা মনে রাখলে বৈষ্ণব কবিতাকে রোমান্টিক বলা যুক্তিসহ হয় না। কারণ ধর্মতত্ত্বের উপস্থাপনা কাব্যরস স্ফুরণের পক্ষে ব্যত্যয় হয়ে পড়ে। বিদগ্ধ সমালোচক বলেন—

"বৈষ্ণবপদকর্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার জন্য পদাবলী রচনা করেন নাই ; সেগুলি তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মাত্র।" (পদকল্পতরু। ৫ম)।

কিন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশে আমাদের বৈষ্ণব কবি যে পথ বেছে নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তাতে রোমান্টিকতা প্রকাশের অবকাশ আছে। "বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য।" সেই অজ্ঞেয়, দুরধিগম্য পরম সত্যের রূপায়ন-চেষ্টায় জাগ্রত হয়েছে কবি-কল্পনার সমধিক ঐশ্বর্য, বিস্ময়বোধ, না পাওয়ার বেদনা ও নৈরাশ্যবোধ।

সুতরাং তত্ত্বদৃষ্টিতে বৈষ্ণব কবিতাকে রোমান্টিক বলা না গেলেও রোমান্টিক চেতনার স্ফূর্তি শত কলাপের মত বিকশিত হয়েছে বৈষ্ণব কবিতার ছত্রে ছত্রে রোমান্টিক প্রেমকবিতার নিরিখে তার আস্বাদন-সাফল্য তাই দুর্লভ নয়।

॥ লীলাশুক ও বৈষ্ণব কবিতা ॥

বৈষ্ণব কবিতা পাঠের সময় পাঠক লক্ষ্য করেন, এর ভনিতাংশ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় কবিগণ ভনিতা ব্যবহার করতেন। বৈষ্ণব-পদের ক্ষেত্রে এই ভনিতা কিন্তু বিশেষ অর্থবহ। নিছক নাম প্রচারের জন্য বৈষ্ণব কবি ভনিতা ব্যবহার করেন নি। তাঁদের এই ভনিতা অংশে একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে এই তত্ত্বটি হোল লীলাতত্ত্ব বা লীলাবাদ, পরচৈতন্য যুগে হ'ল পরিকর বাদ। এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শন গড়ে ওঠেনি, একথা সত্য। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব ভাবনায় তত্ত্বকথা কিছু স্থান পেয়েছিল, একথাও অবিসংবাদিতরূপে সত্য। দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব শুধু তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতেই "গীতগোবিন্দ" লেখেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন: যাঁরা হরির স্মরণে মন সরস করতে চান এবং বিলাসকলায় যাঁদের কৌতূহল আছে, তারাই কোমলকান্ত পদাবলী পাঠ করে আনন্দ পাবেন। যমুনাকূলে কেলিরত রাধাকৃষ্ণের লীলা চিত্রণ করেছেন জয়দেব। এই লীলাকীর্তন করার মধ্যেও একটু বৈশিষ্ট্য বর্তমান। "রাধাকৃষ্ণের যুগল হইতে নিজেকে একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়া লীলাদর্শন, লীলা-আস্বাদন এবং লীলার জয়গান—ইহাই যেন ভক্তের প্রার্থিততম বস্তুরূপে দেখা দিয়াছে।" (ডঃ দাশগুপ্ত)

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি দাক্ষিণাত্যের কবি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থে সার্থকরূপে দেখা দিল। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উপাধি ছিল 'লীলাশুক'। এবং সেখান থেকেই 'বৈষ্ণব কবিগণ লীলাশুক'—কথাটি চলে আসছে। সাধক-কবিগণের লীলাশুকত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন: 'সাধক কবির পরিচয় হইল মধুর বৃন্দাবনলীলাকে অদূরের কদম্ববৃক্ষ হইতে দর্শন এবং আস্বাদন এবং শুকের ন্যায় মধুর কাব্যকাকলীতে তাহারই মাধুর্য বর্ণন।" উপকথা বর্ণিত শুকপক্ষী দূর থেকে বর্ণিত ঘটনা সব কিছুই লক্ষ্য করত, পরে অবিকল তার বর্ণনা দিত। বৈষ্ণব সাধক কবিগণের পক্ষেও এ কথা প্রযোজ্য। রাধাকৃষ্ণলীলায় তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন নি, করার স্পৃহাও তাঁরা মনে পোষণ করতেন না। তাঁদের একমাত্র কামনা ছিল দূর থেকে রাধাকৃষ্ণলীলার দর্শন, তজ্জাত আনন্দময় অনুভূতির আস্বাদন এবং লীলা বর্ণন। লীলাশুকত্বের একটি দৃষ্টান্ত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' থেকেই উদ্ধৃত করা যাক্:

অতঃপর রাধা সনে, আর গোপাঙ্গনা সনে,
করে কৃষ্ণলীলা সবিস্ময়।
সে শোভা দেখিয়া লীলা, শুক অতি সুখ পাইলা,
হর্ষভাবে শ্লোক উচ্চারয়।

কিংবা,

এইরূপ সখীবাণী, শুনিতেই সুনয়নী,
তারে পুছে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।

লীলাশুক সেইভাবে, কহিতে লাগিলা তবে,
এক শ্লোক অপূর্ব করিয়া ॥

এই লীলাদর্শনের উপলব্ধিজাত আবেগেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অমৃতের সিন্ধু কৃষ্ণ-মাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু আকুলি বিকুলি করেছেন, শুধু 'মধুর' 'মধুর'—এই কথা উচ্চারণ করেছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

এ-প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর খুব আদরের ধন ছিল। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেব এই গ্রন্থের সাক্ষাৎ পান এবং এর একখানি নকল আনেন। জয়দেব, বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে এ গ্রন্থখানিতেও প্রভু নিত্য আনন্দ লাভ করতেন।

কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের প্রভাবে পর-চৈতন্য যুগে সাধকদের লীলারস আস্বাদনের ক্ষেত্রে একটু স্বাতন্ত্র্য দেখা দিল। এ সময় লীলারস আস্বাদনের ক্ষেত্রে পরিকরবাদের তাৎপর্য প্রবর্তিত হোল। সাধারণ ক্ষেত্রে ভক্তের মনোভাব, 'আমিত চাহি না রাধা হতে হব রাধার পরাণ পিয়া।' রাগানুগামার্গে সখী ও মঞ্জরী-ভাবে ভজনাই তাদের কাম্য হ'য়ে দেখা দিল। এর অর্থ—বৃন্দাবনের গোপীদের অনুগত হ'য়ে রাধাকৃষ্ণের সেবা। সেই সেবাবাসনা চরিতার্থ করার আনন্দেই ভক্তহৃদয় লীলারসমাধুর্য্য আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন। নরোত্তম দাসের পদে এই কামনা যথাযথ রূপলাভ করেছে :

হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ-অঙ্গ পরশিব দুহুঁ-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব অধর-যুগলে ॥

সুতরাং, চৈতন্যোত্তর যুগের সাধক-কবিগণ লীলা দর্শন, আস্বাদন ও বর্ণনার জন্য প্রাক্‌চৈতন্যোত্তর যুগের সাধক কবিগণের মত দূরত্ব বজায় রাখতে পারলেন না। লীলাদর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ছিল, কিন্তু সেই লীলার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নিয়েছিলেন তাঁরা—'দুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া।' এই সব কবি সখীভাবে রাধাকে বা কৃষ্ণকে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁদের মিলনে সহায়তা করেছেন, বিরহে সান্ত্বনা দিয়েছেন, আবার নিজেরাও আনন্দ-বেদনা অনুভব করেছেন। সুতরাং তাঁরাও সেই লীলার অংশভাগী হ'য়ে পড়লেন। অবশ্য শুক পক্ষীর মত দর্শন ও আস্বাদন স্পৃহাও তাঁরা চরিতার্থ করেছেন, তার বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসার
সহচরী পাওল বোধ।

কিংবা, জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।

অথবা, গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদ্‌গদ
হেরইতে রাই বয়ান॥

এখানে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস—সখী। সখী ভাবেই তাঁরা রাধাকে অভিসারে উপদেশ দিয়েছেন, কানুর মরণশেল পিরীতি নিজেরা অনুভব করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন-দৃশ্য নিরীক্ষণ করেছেন। ডাঃ দাশগুপ্ত বলেছেন: "দ্বাদশ শতকের লীলাশুক ও জয়দেবের কাব্যরচনার ভিতরেই আমরা স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইলাম, এই স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব।…লীলাকেও তাই তাঁহারা সত্য এবং নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকররূপে এই লীলা-স্মরণ ও লীলা আস্বাদন—ইহাই হইল গৌড়ীয় ভক্তগণের পরম সাধন ও সাধ্য…।" তাই পরচৈতন্য-যুগের বৈষ্ণবপদের ভণিতাংশে পরিকররূপে লীলারস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা প্রতীয়মান।

সুতরাং, পরচৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ভক্ত-কবিদের আর লীলাশুকত্বের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকল না। গোপীর অনুগত সাধনার অভিব্যক্তিরূপেই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদাবলী বিশিষ্ট হ'য়ে উঠল।

ছন্দ

ছন্দ কবিতার বিভূতি। ছন্দোস্পন্দন কবিতার ভাবকে লীলায়িত করে, লাবণ্যের স্মিত প্রকাশ ঘটায়। কবির মনের মণিকোঠায় কোন ভাব যখন দানা বেঁধে ওঠে, তখন অকৃত্রিম সেই ভাবধারা প্রকাশিত হয় ধ্বনিরূপে। সেই ধ্বনিপ্রবাহ যতি, অর্ধযতি প্রভৃতির নিয়মাধীন হয়। গভীর ভাবের ক্ষেত্রে নিয়ম-বন্ধন স্বতঃস্ফূর্ত—সচেতন মনে অক্ষর-গণনার প্রয়োজন বোধ করেন না কবি। গুরুগম্ভীর বা তরল—ভাব যে প্রকার, ছন্দও হয় তার অনুযায়ী। ভাবোচ্ছ্বাসকে ছন্দের অনায়াস-বন্ধনে আবদ্ধ করাতেই কবিতার লাবণ্যময় রসমধুরতা সৃষ্টি সম্ভব। বৈষ্ণব কবিদের পদ এর ব্যতিক্রম নয়।

আধুনিক বিচারে, বৈষ্ণবপদাবলীতে তানপ্রধান বা পয়ার-জাতীয়, ধ্বনি-প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত, এবং স্বরমাত্রিক—এই তিন প্রকার ছন্দের উদাহরণই লক্ষ্য করা যায়। তবে মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধিও বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। কারণ পদগুলি রচিত হয়েছিল, কবিতা নয়, গান হিসাবে। আবৃত্তিকালে অনেক সময় মাত্রা বেশী বা কম হয়; কিন্তু সুরের তান-লয় বিস্তারে তা থাকে না। এবারে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

তানপ্রধান : (ক) ৮+৬ মাত্রার :

মন মোর আর নাহি | লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি তবু | হাসি লোক মাঝে॥
কালার লাগিয়া হাম | হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল | প্রাণ নিল বাঁশী॥

(খ) লঘু ত্রিপদী (৬+৬+৮) :

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরুছা পায়॥

(গ) দীর্ঘ ত্রিপদী (৮+৮+১০) :

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কেবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥

বৈষ্ণবপদে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সমারোহ লক্ষণীয়। ব্রজবুলি ভাষা অবলম্বনে এই ছন্দ রাজকীয় ঐশ্বর্যরূপ লাভ করেছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যৌগিক অক্ষর ও স্বর সাধারণতঃ দুই মাত্রা, মৌলিক স্বর একমাত্রার। বৈষ্ণব পদে এই রীতি বর্তমান। তবে সুরতালের প্রয়োজনে মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। তাছাড়া মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যে ধ্বনিমাধুর্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, তার ফলে কীর্তনের রসঘন রূপটি সহজেই জমাট করতে পারে। উদাহরণ—

(ক) ১৬ (৮+৮) মাত্রা :

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
মন্দির বাহির | কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল | পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দূরতর | বাদর দোল।
বারি কি বারই | নীল নিচোল॥

(খ) ২৯ মাত্রা (৭+৭+১১) :

১১ ১ ১ ১১১ ২ ১ ২ ১১
গগনে অবঘন | | মেহ দারুণ
১১১ ২ ১ ১ ১১১১
সঘন দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন   শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥

(গ) ২৮ মাত্রা (৮+৮+১২) :

২ ১১ ১১ ২   ১ ১১১ ২ ১ ১
নীরদ নয়নে | নীর ঘন সিঞ্চনে।
১১১ ১১১ ১১২২
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ | বিন্দু বিন্দু চুয়ত।
বিকশিত ভাব কদম্ব॥

(ঘ) ৩৪ মাত্রা (১০+১০+১৪)—পাঁচ মাত্রার চাল :

২১১ ১ ২ ১ ২   ১১ ১ ১ ১ ২১ ২
তুঙ্গমণি মন্দিরে | ঘন বিজুরি সঞ্চরে।

২ ১ ১ ১ ১১১ ১ ১২ ২
মেঘ রুচি বসন পরিধানা।

(ঙ) ৪৭ মাত্রা (১২+১২+১২+১১):

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ
মধুপ শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুলকুলনারী।

স্বরঘাত প্রধান ছন্দটি ধামালি ছন্দ নামে পরিচিতি। এর লয় দ্রুত। কোন গুরুগম্ভীর ভাব এ ছন্দে প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া লঘুগুরু ভেদে সব অক্ষরই এতে একমাত্রিক। বৈষ্ণব পদকর্তা লোচন দাস এই ধামালি ছন্দের প্রবর্তন করেন। এতে প্রতি চরণে চারটি পর্ব, প্রতি পর্ব চার মাত্রার, শেষ পর্বটি অপূর্ণপদী:

চাইলে নয়ন । বাঁধা রবে | মন চোরা তার | রূপ।
হাস্যবয়ান রাঙা নয়ান এই না রসের কূপ॥
চাইলে মেনে মরবি ক্ষেপে কুল সে রবে নাই।
কুলশীল সে রাখবি যদি থাকনা বিরল ঠাঁই॥

॥ অলঙ্কার ॥

কাব্যের আত্মা কি—এ নিয়ে আবহমানকাল ধরে বিতর্ক চললেও একথা ঠিক যে, রসের মানদণ্ডেই কাব্যের কাব্যত্ব। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। ধ্বনি কাব্যের প্রাণ, রস আত্মা এবং অলঙ্কার কাব্যের ভূষণ। অলম্ শব্দের এক অর্থ ভূষণ। যার দ্বারা ভূষিত বা সজ্জিত করা যায়, তা-ই অলঙ্কার। যা-তে সৌন্দর্য আছে, এবং যা সৌন্দর্যের দ্যোতক—তাই অলঙ্কার। কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কবি অলঙ্কারের আশ্রয় লন। কবি প্রতিভার যাদুদণ্ড বলে শব্দ ও অর্থে সৌন্দর্য সন্নিবিষ্ট করে তাদের সৌন্দর্যব্যঞ্জক করে তুলতে পারেন। এ কারণে সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়েছিল—'কাব্যম্ গ্রাহ্যম অলঙ্কারাৎ'।

তবে কাব্যের অলঙ্কার বলতে সাধারণ অর্থে সৌন্দর্য বোঝালেও, বিশেষ অর্থে অনুপ্রাস-উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণকে বোঝায়। কবি কর্ণপুরের মতে, কাব্যের অলঙ্কার বা ভূষণ হচ্ছে—উপমিতি প্রমুখ অলঙ্কারসমূহ। আচার্য

বামনও বলেছেন—'অলঙ্কৃতিঃ অলঙ্কারঃ। কারণব্যুৎপত্ত্যা পুনঃ অলঙ্কারশব্দোহয়ম্ উপমাদিষু বর্ততে'—অর্থাৎ অলঙ্কৃতিই অলঙ্কার। করণ-ব্যুৎপত্তির দ্বারা এই অলঙ্কারশব্দ দ্বারা উপমা প্রভৃতিকেই বোঝায়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে অলঙ্কারের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। রসের মানদণ্ডে বৈষ্ণবপদাবলী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অঙ্গীভূত। অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে কাব্যরস যেন আরো অধিক আক্ষিপ্ত হয়েছে। রসাভিব্যক্তির জন্য কবিগণ যে সব অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন, তা কাব্যের বহিরঙ্গ ব্যাপার হ'য়ে থাকেনি। 'রসাদীন্ উপকুর্বন্তো-ঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ' –রসাদির পুষ্টিসাধন করে অলঙ্কার অঙ্গদাদি-ভূষণের ন্যায় কাজ করে'—বিশ্বনাথের এই উক্তি বৈষ্ণবপদে সর্বথা সার্থকতালাভ করেছে। কাব্যে শব্দ যখন সৌন্দর্যের পটভূমিকা হয়, তখন হয় শব্দালঙ্কার; আর সৌন্দর্যের পটভূমিকা যখন হয় অর্থ, তখন অর্থালঙ্কার। এদের আবার বিভিন্ন উপবিভাগ আছে। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলে বৈষ্ণব-পদের রস-সৃজনে অলঙ্কারের অবদান যে যথেষ্ট, তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

'কান্ত কাতর কতহুঁ কাকুতি করত কামিনী পায়।'—অনুপ্রাস। ক, ত-এর অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে হৃদয়ের আকূতি ও বেদনা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

'নন্দনন্দন চন্দচন্দনগন্ধনিন্দিত অঙ্গ'—এটিও অনুপ্রাসের উদাহরণ। নন্দ ও নন্দনের রূপমাধুরী হৃদয় সরোবরে যে তুফান তুলেছে, ন্দ, নন্দ, চন্দ-এর অনুপ্রাসের দ্বারা সে উল্লাস ও আবেগ আরো রসায়িত হয়েছে।

কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি অধিক সৌরভময়—পূর্ণোপমা। চন্দন যতই ঘষা যাক্, তার সৌরভ আরো বেড়ে যায়। কানুর পীরিতিও তাই। এর মাধুর্য ক্রমাগতই বেড়ে চলে।

'তড়িত বরণী হরিণ নয়নী দেখিনু আঙিনা মাঝে'—লুপ্তোপমা। উপমেয় রাধা এখানে অনুপস্থিত। রাধার গাত্রবরণ বিদ্যুতের ন্যায়, নয়ন হরিণের নয়নের ন্যায় চকিত চঞ্চল। উপমার এক আঁচরে রাধার অপার সৌন্দর্যরাশি যেন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'কণ্টকগাড়ি কমলসমপদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি—লুপ্তোপমা। সাধারণ ধর্ম লুপ্ত।

'রূপের পাথরে আঁখি ডুবি সে রহিল। যৌবনবনে মন হারাইয়া গেল।'—রূপক অলঙ্কার। রূপের সঙ্গে পাথারের, যৌবনের সঙ্গে বনের অভেদ কল্পনা

করা হয়েছে। পাথার অতল, সহজে তার তলদেশের মাগাল পাওয়া যায় না। তেমনি যমুনাপুলিনে দৃষ্ট কৃষ্ণের অগাধ রূপরাশিতে রাধা নিমগ্ন হয়ে গেছেন, থই পাচ্ছেন না অর্থাৎ কিছুতে বিস্মৃত হতে পারছেন না সেই অতুলনীয় রূপরাশি। আবার গহীন বনে প্রবেশ করলে যেমন বাইরে আসার পথ হারিয়ে ফেলে পথিক, তেমনি কৃষ্ণের যৌবনরূপ বনে রাধাও তাঁর মন হারিয়ে ফেলেছেন, এখন শুধু আকুলি-বিকুলি করেছেন।

কুল মরিযাদ- কপাট উদ্ঘাটলুঁ

তাহে কি কাঠকি বাধা।—রূপক অলঙ্কার। কুল-মর্যাদার সঙ্গে কপাটের তুলনা করা হয়েছে। সখিগণ উতলা রাধাকে বলছেন, মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাছাড়া পথেও নানা বাধা-বিপত্তি, এসময়ে তার অভিসারে যাওয়া উচিত নয়। তার উত্তরে রাধা বলছেন, কুলমর্যাদারূপ কপাট যে ভাঙ্গতে পেরেছে, অর্থাৎ অন্তরের সঙ্কোচ ও সামাজিক মর্যাদাবোধ যে ত্যাগ করতে পেরেছে, শয়ন মন্দিরের কপাটের বাধা তার কাছে কিছুই নয়। এর দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের গূঢ়ত্ব, গাঢ়ত্ব ও আকর্ষণের তীব্রতা সূচিত হচ্ছে।

শীতের ওঢ়ণী পিয়া গিরীষের বা।

বরিষার ছত্র প্রিয়া দরিয়ার না॥—মালারূপক। কৃষ্ণ রাধার সর্বস্ব, এ কথা বুঝাতে মালারূপকের সাহায্যে কবিকল্পনা সমধিক সার্থক হয়েছে।

চঞ্চললোচনে বঙ্কনেহারণি অঞ্জনশোভন তায়।

জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল অলিভরে উলটায়॥—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। উপমেয়—অঞ্জন, লোচন, বঙ্কনেহারণিকে যথাক্রমে উপমান—অলি, ইন্দীবর, উলটায়—এর সঙ্গে অভেদ বলে সংশয় জন্মানোয় কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। জনু সংশয়বাচক শব্দ।

কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।

অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু

সুরধনী-তীরে উজোর॥—প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সংশয়-বাচক শব্দ অনুপস্থিত।

এলাইয়া বেণী ফুলের গাথনি

দেখয়ে খসায়ে চুলি।

হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥—ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার। প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ উপমেয় কৃষ্ণকে উপমান চুল ও মেঘ বলে ভ্রম হচ্ছে রাধিকার।

'রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি তুয়া ভাবে তরু দেই কোর'—এটিও ভ্রান্তিমান্। এখানে কৃষ্ণ রাধাভ্রমে তরুকে আলিঙ্গন করেছেন। উপরের দুটি উদাহরণের একটিতে রাধার, অন্যটিতে কৃষ্ণের প্রেমতন্ময়তার সুন্দর উদাহরণ।

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥—বিরোধাভাস। আপাতদৃষ্টিতে এ উক্তি পরস্পরবিরোধী। কারণ মিলনের মুহূর্তে আবার বিচ্ছেদ ভেবে কান্না কেন? কিন্তু গূঢ়ার্থে ও তাৎপর্যে এ বিরোধের অবসান হয়। এ বিচ্ছেদবেদনার আভাস প্রেমবৈচিত্ত্যের কারণে।

রসের সায়রে আমারে ডুবায়ে অমর করহ তুমি—বিরোধাভাস। রাধার প্রেমরসে ডুবে কৃষ্ণ আনন্দের ঘনীভূত মাধুর্য লাভ করতে চান। কান্তাশিরোমণি রাধার সাহচর্যে কৃষ্ণ যে আনন্দ পান, অন্যত্র তা লভ্য নয়।

'সবে বলে মোরে কানু কলঙ্কিনী গরবে ভরিল দে'—বিরোধাভাস। সাধারণ ভাবে রাধা কলঙ্কিনী, কারণ তিনি পরপুরুষ কৃষ্ণের প্রতি আসক্তা হয়েছেন। এর দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি তাঁর আত্যন্তিক আসক্তিই দ্যোতিত হচ্ছে—যা রাধার পক্ষে গর্বের বস্তু।

'বদন থাকিতে না পারে বলিতে তেঁঞি সে অবোলা নাম'—বিভাবনা। প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়াই এখানে কার্যের উৎপত্তি।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

—বিষম অলঙ্কার। কার্য থেকে আশানুরূপ ফললাভ হয়নি। আক্ষেপানুরাগের এই পদটি আক্ষেপজনিত বেদনার অভিঘাতে রাধাপ্রেমের গভীরত্বই ধ্বনিত হচ্ছে।

চিকুরে গরএ জলধারা—
মুখশশী ভয়ে কিয়ে কাঁদে আঁধিয়ারা ?—সন্দেহ অলঙ্কার। উপমেয় ও উপমান দুটিতেই সংশয়ের ফলে কবিকল্পনায় চমৎকারিত্ব সৃষ্ট হয়েছে।

পদনখ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি ॥—অসঙ্গতি। কার্য ও কারণ ভিন্ন আশ্রয়ে বর্তমান। এর দ্বারা হৃদয়ানুরাগের তীব্রতা প্রকাশিত।

নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা তনু
অবনী ঘন পড়ি যায়। —ব্যতিরেক। উপমেয়-গোরাতনু, উপমান-নিরুপম হেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে বর্ণিত। নিরুপমহেম, তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গোরাতনু, অতএব গোরাতনুর লাবণ্য ও সৌন্দর্য অনুমেয়।

'চম্পকশোন— কুসুম কনকাচল
জিতলে গৌরতনু লাবণিয়ে।'—এটিও ব্যতিরেক অলঙ্কার। উপমেয় গৌরতনু, উপমান—চম্পক, শোন, কনকাচল।

কতহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর, হো বর নারী ॥—নিশ্চয় অলঙ্কার। উপমান 'শঙ্কর'কে নিষিদ্ধ করে উপমেয় 'বরনারী'র প্রতিষ্ঠা। মদন-দহনে-অস্থির রাধার হৃদয়বেদনা প্রকাশিত।

রন্ধন শালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই।
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি ॥—অপহ্নুতি। 'ছলে' শব্দের দ্বারা উপমেয় 'ধোঁয়াকে' অস্বীকার করে উপমান 'কান্না'র প্রতিষ্ঠা।

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।
ই নব যৌবন বিরহে গমায়ব কি করব সো পিয়া লেহে ॥—
—দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। তপন তাপে অঙ্কুর শুকিয়ে যাওয়া এবং নবযৌবন বিফলে গোঁয়ানো—এদের ধর্ম বিভিন্ন, কিন্তু তাৎপর্য বুঝতে পারলে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

॥ গীতিকবিতা ॥

বৈষ্ণব পদবলী গীতিকবিতা কিনা, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এর গীত-ধর্ম বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঙ্গালী মানসের যে গীতি-প্রবণতার সুর চর্যাপদের যুগ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যধারায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছিল, বৈষ্ণব পদাবলীতে তা উত্তাল কলরোলে পরিণত হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিকাব্যিক লক্ষণ বিচারের পূর্বে গীতিকবিতার স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

লিরিক বা গীতিকবিতার উদ্ভব গেয়-কবিতা হিসাবে। প্রাচীনকালে 'Lyre' নামে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গীত কবিতাকে গীতিকবিতা বলা হ'ত।—'Lyric Poetry, in the original meaning of the term, was poetry composed to be sung to the accompaniment of lyre or barp."। সেই হিসাবে প্রাচীন ব্যালাড, এমন কি মহাকাব্যকেও, গীতিকবিতা বলা যায়। এই নিরিখে বৈষ্ণবকবিতা অবশ্যই গীতিকবিতা। কারণ, মূলতঃ গান হিসাবেই এই কবিতার জন্ম হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট রাগ-রাগিণীর সাহায্যে গীত বৈষ্ণবপদের আবেদন ও ব্যঞ্জনা শ্রোতাকে এক রহস্যময়তার আবেশভরা মাধুর্যের জগতে নিয়ে যায়। প্রত্যেকটি বৈষ্ণবপদের প্রারম্ভে গান্ধার, বরাড়ী, ধানশী, ভৈরবী, বসন্ত—প্রভৃতি রাগরাগিণীর উল্লেখ এর গেয়ধর্মের ইঙ্গিত-ই বহন করে।

কিন্তু আধুনিক গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য একেবারে স্বতন্ত্র। এখনকার গীতি-কবিতার সঙ্গে গানের কোন সম্পর্ক নেই। আসলে গীতিকবিতা এমন এক বিশেষ ধরণের রচনা, যাতে 'the poet is principally occupied with himself.' কবির ব্যক্তিমনের নিবিড় অনুভূতি যখন ছন্দায়িত প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বমনের হয়ে ওঠে, তখন-ই হয় গীতিকবিতা। কাব্যিক বলতে—ভাবাবেগ ও কল্পনাকে বুঝায় ('By poetical we understand the emotional and inaginative')। গীতিকবিতা ও গেয়-কবিতার পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:

"গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাব-ব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অ-গেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" গীতকবিতা 'চিত্তভাবব্যঞ্জক'—অর্থাৎ কবির মনের সুখদুঃখের তরঙ্গ-বিক্ষোভের বাঙ্ময় রস-রূপায়ণ। এ-কথাই পাশ্চাত্য সমালোচক বলেন ভিন্ন ভাষায়—"...for a lyric, to be good of its kind, must satisfy us that it

embodies a worthy feeling; it must impress us by the convincing sincerity of its utterence; while its language and imagery must be characterised not only by beauty and vividness, but also by propriety, or the harmony which in all art is required between the subject and its medium"। গীতি-কবিতায় একটি মাত্র ভাবের গাঢ়বদ্ধ প্রকাশ হয় অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে। কারণ ভাবের অতিবিস্তার ঘটালে তার সংহতি, গাঢ়ত্ব ও ব্যঞ্জনা অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে পড়ে। কোন তত্ত্বকথা নয়, গভীর আবেগের সংযত প্রকাশেই গীতি-কবিতার সার্থকতা। গীতিকবি হৃদয় থেকে হৃদয়ে তাঁর বক্তব্যকে সঞ্চার করেন —এই যে হৃদয়ের সুরে গান গেয়ে ওঠা, তাতে ব্যক্তিক মনের অনুভূতিতেও সর্বকালের, সর্বদেশের মানুষের মনের কথা প্রতিধ্বনিত হয় ("...they embody what is typically human rather than what is merely individual and particular and that thus every reader finds in them the expression of experiences and feelings in which he himself is fully able to share."।

আধুনিক গীতিকবিতা গান না হলেও সঙ্গীতধর্মিতা এর অন্যতম গুণ। "লিরিকের একটা মস্ত গুণ এই যে, সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে তা মনে মনে গুণগুণিয়ে কিংবা মুখে মুখে আউড়িয়ে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে এই মর্ত্যলোকেই এক স্বর্গলোক রচনা করে দুদণ্ড পার্থিব ব্যাপারের হাত এড়ানো যায়।" (বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা/পৃঃ ৯)

লিরিকের উদ্দেশ্য—চিত্তে আনন্দরসের সঞ্চার। নিছক কোনও তত্ত্বকথা নয়, ব্যক্তিহৃদয়ের অনুভূতির নিবিড় ও গভীর ভাবরসের সোনার কাঠির ছোঁয়াচে পাঠকের মনে যে বোধের উদ্বোধন হয়, তা আনন্দের। নিবিড় রসোপলব্ধির দ্বারাই এই আনন্দের আস্বাদন সম্ভব। গবেষকের ভাষায়—"কিন্তু তত্ত্বকথা শোনানো বা কোনো কিছু প্রতিপন্ন করতে যাওয়া লিরিকের কাজ নয়। তার কাজ হচ্ছে নিছক আনন্দ প্রকাশ করা, আর সেই আনন্দের ধ্বনির দ্বারা অপরের মনের ভিতর আনন্দ জাগিয়ে তোলা।" (ঐ, পৃঃ ৭)। এজন্যই গীতিকবিতায় আত্মভাবলীন তন্ময়তার প্রাধান্য।

বৈষ্ণব কবিতায় গীতিকবিতার সৌরভ, মূর্চ্ছনা ও মাধুর্য স্পষ্টই অনুভব করা

যায়। বিশেষ করে প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদে গোষ্ঠীগত ভাবনা প্রধান না হয়ে ওঠায় সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই কবিমানসের নিবিড় ভাবানুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি পর-চৈতন্যযুগের কবিরাও অলৌকিক রাধাকৃষ্ণপ্রেমকে মর্তজীবনপাত্রে পরিবেশন করায় তাতে মানবজীবনোষ্ণতা অননুভূত থাকে না। বৈষ্ণব পদকর্তা যখন রাধার কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন—"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর"—তখন নিখিল বিরহী-হৃদয়ের নিদারুণ মর্মবেদনা দিক দিগন্তব পরিপ্লাবিত করে তুলে। সেই শূন্যতার বেদনার উপলব্ধি ভাববৃন্দাবন অপেক্ষা মর্তজীবনবেদনাকেই মনে করিয়ে দেয়। রাধাকে তখন মনে হয়—নিখিল বিরহিনী হৃদয়ের প্রতীক। তাছাড়া বৈষ্ণবকবিতা গেয়কবিতা হিসাবে সার্থক, একথা ঠিক। এর সংগীতমাধুর্যকে অস্বীকার করা যায় না। পাঠ্য গীতি-কবিতার রসমূল্যেও বৈষ্ণব পদাবলী সার্থক এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব-পদাবলীর এই সর্বজনীন আবেদনের দিকটি সমালোচক সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন :

"বৈষ্ণব পদাবলীর রস গ্রহণ করিতে গেলে আমাদের বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইবার আবশ্যক নাই, কৃষ্ণকে অবতার বা অবতারী মানিবার প্রয়োজন নাই, এমন কি নাস্তিক হইলেও দোষ নাই। মানুষের হৃদয়ের যে প্রবৃত্তি মৌলিক সেই ভালো-লাগাকে চিরন্তন করিয়া ভালোবাসিবার ঈপ্সা বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেরণার উৎস।" (ডঃ সুকুমার সেন)।

"বৈষ্ণব পদাবলী সর্বাংশে উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত"—৺সতীশচন্দ্র রায়ের মন্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র-ও উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হিসাবে বৈষ্ণবকবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ-মিলন-বিরহের শাশ্বত বাণী-চিত্র হিসাবে বৈষ্ণবপদাবলী চিরন্তন রস ও ভাবমূল্য বহন করে।

তবু তত্ত্বতঃ বৈষ্ণবপদাবলীকে পুরোপুরি গীতিকবিতা বলতে আমাদের আপত্তি আছে। বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণবপদকর্তারা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার তত্ত্বরূপকে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন। অপ্রাকৃত রাধাপ্রেমকে তাঁরা প্রাকৃত ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন—অন্য কোন উপায় ছিল না বলেই। তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি নিছক লৌকিক প্রেমকবিতা হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলী আস্বাদন করে আনন্দ পাবেন, একথা হয়তো ঠিক। কিন্তু তত্ত্বের

সঙ্গতিসূত্রে পদাবলী আস্বাদনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশী। গীতিকবিতায় কবিমনের বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। সেদিক থেকেও বৈষ্ণব পদাবলীকে গীতিকবিতা বলা চলে না। কারণ এতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কবিদের ব্যক্তিমনের উপলব্ধি প্রকাশের সুযোগ এখানে আদৌ ছিল না। সম্প্রদায়ের অনুগত এইসব ভক্তকবি একান্তভাবেই রাধাকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত-প্রাণ; তাঁদের যা-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা—সবই মঞ্জরীভাবের সাধনায়; নিজের প্রাণের ভাব নিজের ভাষায় প্রকাশের সুযোগ তাঁদের ছিল না। কিন্তু গীতিকবিতা ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। গীতিকবির ভাব একান্তভাবেই তাঁর নিজের, প্রকাশভঙ্গীও তাই। এ ছাড়া পাঠ্য হিসাবেও সব বৈষ্ণবপদ-ই উৎকৃষ্ট নয়। গেয় হিসাবে বৈষ্ণব-পদাবলী রচিত। অজস্র বৈষ্ণব কবি পদ রচনা করেছিলেন—তাঁদের সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না—ফলে তত্ত্বের বাক্য অনেক-ক্ষেত্রেই রসাত্মক কাব্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া গানের জন্য রচিত বলে অনেক ক্ষেত্রে—বিশেষ করে, ব্রজবুলিতে লিখিত পদসমূহে—ছন্দের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে, যা সুরের বিস্তারের মাঝে খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সাধারণভাবে পড়তে গেলে পাঠকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটে। "কিন্তু গায়কের কণ্ঠের মুখাপেক্ষী হইয়া গীতিকবিতা রচিত হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ রচিত হইয়াছে সুরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া।" (কালিদাস রায়)। তাছাড়া গীতিকবিতা ছোট কি বড় হবে—তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই,—কবিমনের অন্তর্নিহিত ভাবটি সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হ'তে যেটুকু পরিসর প্রয়োজন, গীতিকবিতা সেই হিসাবেই ছোট-বড় হয়। তবে সংকীর্ণ পরিসরে ভাবটি নিটোল, ঘনবদ্ধ ও গাঢ়-রসান্বিত অধিক হয়, এই মাত্র। সেই হিসাবেও বৈষ্ণবপদাবলী গীতিকবিতা নয়। কারণ গানের জন্য রচিত বলে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাকে শেষ করতে হ'ত।

সুতরাং স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, আবেগের গভীরতা, আন্তরিকতা ও মর্মস্পর্শিতা, এবং প্রকাশভঙ্গীর অসামান্যতায় বৈষ্ণব কবিতা প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত হলেও সঠিক অর্থে গীতিকবিতা একে বলা চলে না।

গীতিনাট্য

'পদকল্পতরু'-সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন—"বৈষ্ণব পদাবলী যেরূপ নায়ক-নায়িকার ও সখা-সখীদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি-প্রধান পালার আকারে সজ্জিত হইয়াছে এবং কীর্ত্তনিয়ারা অনেক সময়েই যেভাবে কীর্ত্তনের পালাগুলি গান করিয়া থাকেন, তাহাতে ঐ পালাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য (opera) বলাই সঙ্গত।" (৫ম খণ্ড/পৃঃ ২৫৩)।

গীতিনাট্য বইতে—নাটকের লক্ষণাক্রান্ত কাব্যপ্রাণ ছন্দোবদ্ধ রচনাকে বুঝায়। এতে সংলাপাংশ থাকে অতি সামান্যই—কখনো বা আদৌ থাকে না। গীতিসর্বস্বতাই তার বিশেষত্ব। সমালোচকের ভাষায়—'there will be a bit of dialogue spoken without music leading to another musical item or number as such things are habitually called.'। গীতিনাট্যে সমবেত সঙ্গীত, একক সঙ্গীত, দ্বৈত সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে কাহিনী ও চরিত্রের বিবর্তন সাধিত হয়। এছাড়া—গীতিনাট্যের বিষয়বস্তুতে বাস্তবতার ছোঁয়াচ থাকলেও প্রকাশরীতির মাধ্যম সঙ্গীত বলে তা অতিবস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না—"An opera cannot be strictly realistic, because it depends on music for its expression and music is intelligible as music only when it has a certain formality or structure." গীতিনাট্যকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় যে, 'ইহা সুরে নাটিকা'। অর্থাৎ এতে গীতিসুর প্রধান নয়, নাট্যবস্তু সুরের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে মাত্র।

বৈষ্ণবপদাবলী গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হলেও তার মধ্যে নাট্যলক্ষণের পরিচয়ও মেলে। প্রাক্-চৈতন্যযুগের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য —এর নাট্যধর্ম। ফলে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদদের নিয়ে একাধিকবার এর অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বিভিন্ন বৈষ্ণবপদ খণ্ড-কবিতা হিসাবে রচিত হলেও তার মধ্যে নাট্যধর্মটিও অনুপস্থিত থাকে নি। এর কারণ —বৈষ্ণব পদাবলী বিভিন্নভাবের পালাবদ্ধ রসকীর্তন। বিভিন্ন রসপর্যায় অনুযায়ী বৈষ্ণব পদকর্তারা পদ রচনা করেছেন। ফলে এক একটি রসপর্যায়কে যদি এক একগাছি মালা বলা যায়, তাহলে পদগুলি প্রত্যেকটি এক একটি ফুল। বহু ফুলের সমবায়ে একটি মালিকা গঠিত হয়েছে। পদগুলিতে আবার নায়ক-নায়িকা বা সখা-সখীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি মাধ্যমে নাট্যিক দ্বন্দ্বের ক্রমোন্নতিও

সাধিত হয়েছে। শুধু উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলেই তা নাটক হয় না—দ্বন্দ্ব সাংঘাতের মাধ্যমে জীবনের বাঙ্ময় রস-রূপায়ণ হচ্ছে নাটক।—তাছাড়া "A drama is never really a story told to an audience ; it is a story interpreted before an audience by a body of actors." (Nicoll)। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এই নাট্যিক রূপটি উপস্থিত। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। দুর্যোগপূর্ণ রজনীতে শ্রীরাধা অভিসারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সখীরা তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলছেন—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥ ··
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।···ইত্যাদি।

তার উত্তরে রাধা বলছেন—

'কুল-মরিয়াদ-কপাট উদঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকি বাধা'—ইত্যাদি।—এখানে এই উক্তি-প্রত্যুক্তি নাটকীয়-কৌতূহল উদ্দীপক এবং ঘটনা ও চরিত্রের পরিচায়কও বটে। এরূপ দৃষ্টান্ত অজস্র মিলে।

তবু বৈষ্ণব-পদাবলীকে গীতিনাট্য বলা চলে না। কারণ পদগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ড কবিতা মাত্র। এর নাট্যমূল্য কিছু থাকলেও গীতিমূল্যই প্রধান। তাছাড়া এতে সামগ্রিক ঘটনা—আদি-মধ্য-অন্ত—সমন্বিত নাট্যবৃত্তরূপে উপস্থাপিত হয়নি। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীকে গীতিনাট্য বলা চলে না যুক্তিযুক্ত ভাবেই।

'সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়'

বৈষ্ণবপদাবলী বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। অপ্রাকৃত, চিন্ময় রাধাকৃষ্ণ প্রেম-তত্ত্বকে বৈষ্ণবকবি বাঙ্ময় রসরূপ দিয়েছেন। বৈষ্ণব মতে, রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির অংশ। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তার মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান—স্বরূপ, জীব ও মায়াশক্তি। স্বরূপশক্তির আবার তিনটি অংশ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। মহাভাবময়ী শ্রীরাধা কৃষ্ণের এই আনন্দশক্তির পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ। মূলে রাধাকৃষ্ণ এক ছিলেন—লীলার জন্য তাঁদের এই দ্বিধা-সত্তারূপ। কেননা—'একোহম্ বহুস্যাম'—একের দ্বারা লীলা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'আমায় নৈলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'।

কৃষ্ণের অসংখ্য লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে—'সর্বোত্তম নরলীলা নরবপুঃ তাঁহার স্বরূপ'। রাধাকৃষ্ণ-যুগলরূপ এই লীলারই ঘনীভূত রসবিগ্রহ। তত্ত্বতঃ, মূলে তাঁরা এক—'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥' কিন্তু একদা লীলার কারণে তাঁরা দ্বিধাসত্তায় প্রকটিত হয়েছিলেন। 'লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।' কবি-সমালোচকের ভাষায় এই দ্বৈতরূপের পরিচয়—

"যে লীলানন্দ উপভোগের জন্য ভগবানের নররূপ ধারণ, তাহা কাব্যের ভাষায় মানবিক আনন্দ। তাহাতে আনন্দও আছে, বেদনাও আছে। নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দ ভোগের চেয়ে এই বেদনান্তরিত বিরহের দ্বারা উপচীয়মান নবনবায়মান আনন্দের তীব্রতা ঢের বেশী—নিরবচ্ছিন্ন আলোকের চেয়ে আলো-আঁধারি, এমনকি মাঝে মাঝে আঁধারও যেমন স্পৃহণীয় হয়ে ওঠে। সেই রসসত্তার তীব্র আনন্দ ভক্তগণকে দান করিবার জন্য ভগবানের হ্লাদিনীর সহিত দ্বৈত ব্যবধান।" (কালিদাস রায়)।

লীলার জন্য রাধাকৃষ্ণ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলেন। এই দ্বিধাসত্তা নানা অবস্থাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আবার পরিশেষে এক দেহে, এক আত্মায় মিশে যায়। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী এই দ্বৈতসত্তার অদ্বয়ত্বে প্রতিষ্ঠার সাধনা। বৈষ্ণবপদকর্তাগণ সেই অপ্রাকৃত, চিন্ময় লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে না পেয়ে প্রাকৃত নরনারীর বিচিত্র প্রেমলীলার মানদণ্ডকে অবলম্বন করেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে তাই দেখি—স্বর্গ ও মর্ত, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত—রূপবৈচিত্র্য এক বেণীবন্ধনে বাঁধা পড়েছে। তদ্গত-চিত্ত বৈষ্ণব ভক্ত মর্তজীবন-বোধের নিরিখে সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্লীলা আস্বাদন করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' রবীন্দ্রনাথের মতে বৈষ্ণব ভক্ত মর্তজীবনের সংকীর্ণ বাতায়ন পথে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন।—'বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।...এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একদা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।' আসলে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বৈষ্ণব-তত্ত্বের স্বরূপটি যথাযথ ধরা পড়েনি, বলা যায়। বৈষ্ণব সাধক লৌকিক প্রেমের সীমায় অলৌকিক লীলারূপকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। অলৌকিককে তাঁরা টেনে এনেছেন ধূলিধূসর লৌকিক জগতের প্রেক্ষাপটে। লৌকিককে

অলৌকিক বলে কখনো তাঁরা ভুল করেননি। লৌকিকের সাদৃশ্যে ভাবেরও সাদৃশ্য বলে বিচ্ছিত্তি বা মনের ভ্রম ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের দ্বিধাসত্তা কেমন করে বিচিত্র পথ অতিক্রম করে পরিশেষে অদ্বয় সত্তায় মিশে গেল, তারই বাঙ্ময় রসরূপ চিত্রিত হয়েছে। পূর্বরাগ পর্যায়ে শ্রীরাধার যে দুর্জয় জীবনসাধনা শুরু হয়েছিল, অভিসার, নিবেদন, মাথুরের পথ বেয়ে তা ভাব-সম্মিলনে গিয়ে শেষ হয়েছিল। এতদিনকার নানা দুঃখবেদনা, সুখ-আনন্দের উত্তাল কলরোল পরিসমাপ্তি লাভ করল মিলনের মহাসমুদ্রে। দুরবগাহী মিলনের আশ্লেষ সব বেদনা, সব আর্তি, সব কথাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—পরমপ্রাপ্তির সার্থকতায় মিলিয়ে যায় হৃদয়ের উচ্ছলতা। সমালোচক তাই বলেন—

"বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে; দুই দিকে তটভূমি, তাহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে;…কিন্তু নদী যখন মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে,… সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য।… বৈষ্ণব কবিতা এইভাবে জানা পথ দিয়া লইয়া অজানার সন্ধান দেয়।" (দীনেশচন্দ্র সেন)

ব্রজবুলি

ব্রজবুলি একপ্রকার কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। বাংলাদেশে বৈষ্ণবপদাবলীর জনপ্রিয়তার মূলে এই ভাষার দান বর্ণনাতীত। মৈথিল ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট ব্রজবুলি ভাষার লালিত্য, মাধুর্য ও ধ্বনিঝঙ্কার যে মাদকতার সৃষ্টি করে, তা পাঠক ও শ্রোতার মনকে সহজেই কেড়ে নেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মহাকবি বিদ্যাপতি এক কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার প্রয়োজন অনুভব করে অবহট্টভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। তিনি এই অবহট্টভাষায় পদ রচনার কারণ সম্পর্কে বলছেন—'দেসিল বঅনা সব জন মিঠ্‌ঠা। তে তৈসন জল্পও অবহট্টা॥'—দেশী বচন সকলেরই মিষ্ট লাগে। তাই সেইরূপ 'অবহট্ট' ভাষায় বলছি। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বিদ্যাপতি এই কৃত্রিম ভাষার সর্বাতিশায়িতা সম্পর্কে বলেছেন—

বালচন্দা বিজ্জাবই ভাষা। দুহুঁ নহি লগ্‌গই দুজ্জন হাসা॥
ও পরমেশ্বর হরশির সোহই ঈ নিচ্চয় নায়র মন মোহই॥

—শিশুচন্দ্র ও বিদ্যাপতির ভাষাকে দুর্জনেরা পরিহাস করে কিছু করতে পারবে না। চন্দ্র পরমেশ্বর শিবের কপালে শোভা পায়। এই ভাষা নিশ্চয়ই বিদগ্ধ-জনের মন জয় করবে।

অবহট্ট ভাষা সম্পর্কে বিদ্যাপতি যে কথা বলেছিলেন, ব্রজবুলি ভাষা সম্পর্কে তা আরো অধিক সত্য। এই ভাষার শ্রুতিমাধুর্য এবং ছন্দের দুলুনি, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার—এর ফলে ব্রজবুলি ভাষা রসিক ও ভক্তমহলে বিশেষ আদৃত হয়েছিল। বস্তুতঃ ব্রজবুলির ভাষার পথ দিয়েই সাধক কবি রাধাকৃষ্ণলীলার অসীম সৌন্দর্য-সমুদ্রের একপ্রান্তে নিয়ে যান পাঠক মনকে। সুতরাং ব্রজবুলি ভাষার উদ্ভবের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাস খুব প্রাচীন। 'গাথা সত্তসই'-এর প্রকীর্ণ শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুরাগের যে চিত্র আছে, পদাবলীর এটাই সম্ভবতঃ প্রাচীন উৎস। তারপর দ্বাদশ শতকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর পর্যায় অতিক্রম করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তা সার্থকরূপ পরিগ্রহ করেছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় বৈষ্ণবপদ রচনা করেন মিথিলার আর এক সভাকবি উমাপতি ওঝা—বিদ্যাপতির আবির্ভাবের একশ পঁচিশ বছর আগে, চতুর্দশ শতকে। তবে ব্রজবুলির বিকাশের জন্য অপেক্ষা ছিল বিদ্যাপতির।

ব্রজবুলি নামটি আধুনিককালের দেওয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরগুপ্ত সর্বপ্রথম এই নাম ব্যবহার করেন। ব্রজবুলি ভাষার মাধুর্য লক্ষ্য করে মনে করা হ'ল যে, বৃন্দাবনের গোপগোপীরা সম্ভবতঃ এই ভাষায় কথা বলতেন। ব্রজের বুলি বলে এর নাম হ'ল ব্রজবুলি। অবশ্য এই ধারণার ঐতিহাসিক তাৎপর্য কিছু না থাকলেও এই ভাবগত ও রস-গত ব্যাখ্যার কিছুটা মূল্য আছে, এ ধারণা অসঙ্গত নয়। ব্রজবুলির উৎপত্তি সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যে, বাংলাদেশে বিদ্যাপতির পদের বিকৃতরূপই ব্রজবুলি। এ ধারণাও ভুল। কেননা তা'হলে এই বিকৃতভাষা একটি সাহিত্যিক উপভাষা-রূপে সারা উত্তর ভারতে বিস্তৃতি ও সমাদর লাভ করতে পারত না। ভাষাতত্ত্ব-বিদ গ্রীয়ারসনেরও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর অনুসরণে উক্ত অভিমত ডঃ সুকুমার সেন প্রথমে সমর্থন করেছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি নিজেই এই অভিমত খণ্ডন করেছেন দুটি কারণে—প্রথমত, বিদ্যাপতির সময়ের মৈথিলীভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির সাদৃশ্যও যেমন আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও কম নেই। দ্বিতীয়তঃ,

বাংলা-মিথিলায় ছাত্রদের যাতায়াতের ও দুই দেশের ঘনিষ্ঠতার ফলে মৈথিলী ভাষার ঠাট নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলায় একটি নতুন কাব্যধারায় সৃষ্টি হয়েছিল, এ ধারণাও ঠিক নয়। কারণ—

"ব্রজবুলি যদি মৈথিলীর অনুকরণ হ'ত, তাহলে প্রথমদিকের রচনায় মৈথিলীর সঙ্গে মিল ঘনিষ্ঠতর হত এবং ক্রমশ সে মিল কমে আসত। আসলে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। বাঙালীর লেখা সবচেয়ে পুরানো পদাবলীতে দেখি যে, সেখানে মৈথিলীর সঙ্গে মিল ততটা ঘনিষ্ঠ নয় যতটা পরবর্তীকালের পদাবলীতে। গোবিন্দদাসের পূর্বগামীদের ব্রজবুলি রচনায় বাংলা ও অ-বাংলা অংশ প্রায় সমান সমান। এখন কি করে বলি যে ব্রজবুলির উৎপত্তি মৈথিলীরই অনুকরণে।" (সুকুমার সেন)

আচার্য সেন তাই সিদ্ধান্ত করেছেন—"সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতা খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আর্যাবর্তের সর্বত্র প্রচারিত ছিল, বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে। এই চার-পাঁচ শ বছর ধরে আর্যাবর্তে অর্থাৎ পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত সমসাময়িক কথ্য-ভাষার সর্বভূমিক সাধুরূপ অবলম্বন করে একটি সাহিত্যিক ভাষা প্রচলিত হয়েছিল। এই ভাষাকে সেকালের ও একালের পণ্ডিতেরা নানা নামে অভিহিত করেছেন—প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অর্বাচীন অপভ্রংশ, অপভ্রষ্ট, অবহট্‌ঠ, দেশী, ভাষা, ইত্যাদি। এর মধ্যে অবহট্‌ঠ নামটিই সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়। সমসাময়িক রচনায়ও এই নামটি পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর অপেক্ষাকৃত পূর্বতন রূপ বিদ্যমান ছিল অবহট্‌ঠ—এ অনুমান অপরিহার্য।···এই অবহট্‌ঠ থেকেই ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছে।" (বিচিত্র সাহিত্য ; পৃঃ ৫৮, ৬০)।

বাংলাদেশে সুলতান হোসেন শাহের আমলে যশোরাজ খান প্রথম ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। পদটি—"এক পয়োধর চন্দন লেপিত আর সইজই গোর'—ইত্যাদি। উড়িষ্যায় এ-ভাষায় প্রথম পদ রচনা করেন মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠজন রামানন্দ রায়—'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল'। মিথিলায় ব্রজবুলিতে প্রথম লেখার কৃতিত্ব উমাপতি ওঝার চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে। আসামে শঙ্করদেব এ পথের দিশারী। তিনি উমাপতির 'পারিজাতহরণ' নাটকের অনুসরণে এই নামেই লেখেন নাটক। শঙ্করের ব্রজবুলিতে রচিত পদ—'হরি হরি পিয় মোরি বৈরি অধিক ভেলি, কয়লি অতয়ে অপমানা'—বিশেষভাবে

উল্লেখ্য। ডঃ সেন সিদ্ধান্ত করেছেন "ব্রজবুলির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল নেপাল তীরহুত মোয়দের রাজসভায়।" কারণ তুর্কি-আক্রমণের ফলে নেপালে বিহার ও বাংলাদেশের বহুপণ্ডিত আশ্রয় নেন। "লক্ষ্মণসেনের রাজ্য নষ্ট হবার পরে বৈষ্ণবগীতিকাব্যের এই সভাসিদ্ধ প্রথা চলে আসে নেপালে তীরহুতে ও অন্যান্য প্রান্তীয় রাজ ও সামন্ত সভায়। নেপালে ব্রজবুলি পদাবলীর চর্চা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে আসছিল। নেপালের রাজারাও ব্রজবুলিতে পদ লিখতেন।"

সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রজবুলি ভাষা চলিত হলেও বাংলাদেশেই তা পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়েছে সর্বাপেক্ষা অধিক। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাওয়া প্রথম পদের কথা আগেই বলেছি। সেটি পঞ্চদশ শতকের। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে অজস্র বৈষ্ণব কবি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি গোবিন্দদাস। তিনি 'ব্রজবুলি তথা বৈষ্ণব পদাবলীতে নূতন জীবন সঞ্চার করলেন'। এই ব্রজবুলি ধারার শেষ পরিণতি উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে।

ব্রজবুলি ভাষা কোমল, কান্ত, মধুর, সুখশ্রাবী। তদুপরি অপ্রাকৃত রাধা-কৃষ্ণলীলার মাধুর্য প্রকাশের জন্য পদকর্তাগণ সর্বজনব্যবহৃত সাধারণ ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে এই ভাষা ব্যবহারের দ্বারা সেই লীলার গূঢ়তা ও রহস্য-ময়তার প্রতিই যেন ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সমগ্র আর্যাবর্তে প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষত বৃন্দাবনের গৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় আর্য্যাবর্তেও বঙ্গীয় পদাবলী-সাহিত্য-প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল।…সেজন্য কবিরা এমন ভাষায় আশ্রয় লইলেন, যাহা আর্য্যাবর্তের সকল লোকেরই সহজে বোধগম্য হইতে পারে।" (কালিদাস রায়)। এছাড়া 'কীর্তন সঙ্গীতের রসমূর্চ্ছনা ও সুরের অলঙ্করণের পক্ষে ব্রজবুলি অধিকতর উপযোগী' বলেও ব্রজবুলিতে পদ রচিত হয়েছিল।

ব্রজবুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষত্ব সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু জানা প্রয়োজন—

(১) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের বহুলতা।

(২) অ-এর তিন প্রকার উচ্চারণ—সংবৃত, বিবৃত (হ্রস্ব) এবং অতিসংক্ষিপ্ত।

(৩) ই, ঈ-এর-হ্রস্ব-দীর্ঘ—দু'প্রকার উচ্চারণ।

(৪) দ্বিবচনের বিভক্তিহীনতা।

(৫) দ্বিত্ব-ব্যঞ্জনের লোপ।—ধিক্কার>ধিকার ; উত্তর>উতর ; উন্মত্ত> উনমত।

(৬) প্রথমার একবচনে প্রায়ই বিভক্তি থাকে না ; দ্বিতীয়ার বিভক্তি লুপ্ত ; তৃতীয়ায় এ, হি, হিঁ—বিভক্তি যুক্ত হয়।

(৭) পঞ্চমীতে সেঁ, সঞে—বিভক্তির প্রয়োগ।

(৮) ষষ্ঠীতে ক, কা, কি, কে বিভক্তির ব্যবহার।

(৯) সপ্তমীতে এ হি, হিঁ বিভক্তির প্রয়োগ অথবা বিভক্তি-লোপ।

(১০) পদমধ্যস্থিত খ, ঘ, থ, ধ, ভ অনেক সায় 'হ' হয়। মেঘ>মেহ, লঘু>লহু, নাথ>নাহ।

(১১) 'ম' ব্যতীত অন্য স্পর্শ বর্ণের পূর্বে থাকলে শ, ষ, স প্রায়শ লোপ পায়। নিশ্চয়>নিচয়, নিশ্চল<নিচল, অস্থির>অথির, দুস্তর>দুতর।

(১২) বহুবচন বুঝাতে সব, কুল, সমাজ, মেলি ইত্যাদির ব্যবহার। সখী সব, সখি সমাজ।

(১৩) সমাস-বন্ধনে ধরা বাধা নিয়ম নেই—উলটা-পালটা পদের মধ্যে সমাস হয়,—'মণ্ডিত—মালতি-মাল', কিন্তু হওয়া উচিত 'মালতি—মাল-মণ্ডিত'।

(১৪) 'অব' যোগে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ গঠিত।—কহব, চলব। বর্তমানকালে—হুঁ, উ, ওঁ, সি, ই, অই, ই, অত ইত্যাদি সহযোগে ; অতীতকালের ক্রিয়াপদ—অল, ই, ও, উ, লা—যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত।

এছাড়া ব্রজবুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আরো অজস্র আছে। সে সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন, কবিশেখর কালিদাস রায়, সতীশ চন্দ্র রায়, বৈষ্ণবাচার্য হরিদাস দাস বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমাদের আলোচনা তাঁদের প্রবন্ধসমূহকে অনুসরণ করে।

কীর্তন

কীর্তন গান বলতে বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনকে বোঝালেও এর আভিধানিক অর্থ স্তুতি, প্রশংসা, যশোগাথা। কীর্তন ও কীর্তি শব্দ একই উৎস জাত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণের মহিমাগান প্রকাশে কীর্তন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সুন্দর দেহ, ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণ, কর্ণমূলে কর্ণিকা-পুষ্প, পরিধানে কনকোজ্জ্বল পীতবাস, গলে মালা, অধরে বেণু—এ হেন অবস্থায় কৃষ্ণ বৃন্দাবনে

প্রবেশ করলেন। চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল তখন গোপবৃন্দের প্রশংসাগীতি। কারো কারো মতে, 'কীর্তিলহরী' কথা থেকে এসেছে 'কীর্তন' কথাটা। 'কীর্তিলহরী'র অর্থ দেবতা বা বরেণ্য মহামানবের উদ্দেশ্যে কীর্তিগাথা বা যশোগান। তবে ভগবানের লীলাকীর্তন অর্থে-ই কীর্তন শব্দটি বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। ভাগবতে কীর্তন নবধা ভক্তির অন্যতম :

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

সুতরাং উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নাম বা গুণাদির গাথাই কীর্তন নামে অভিহিত। রূপ গোস্বামী কৃত সংজ্ঞা: 'নামলীলাগুণাদীনং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।' সনাতন গোস্বামী বলেছেন: "সঙ্কীর্তনং নামোচ্চারং গীতং স্তুতিশ্চ নামময়ী।"

বাংলাদেশে কীর্তনের ইতিহাস চর্যাপদের আমল থেকেই শুরু হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' সুরতাল কীর্তনের ঢঙে রচিত। বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' কোন্ শ্রেণীর, তা নামেই বোঝা যায়। চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে :

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

এখানে ভগবানের নামকীর্তনের দ্বারা কীর্তন শব্দের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে বলা যায়।

॥ ২ ॥

কীর্তন তিন প্রকার—নামকীর্তন, লীলাকীর্তন, সূচককীর্তন। সমবেত-ভাবে ভগবানের নাম ও গুণাদির গানই হোল নাম-সংকীর্তন। প্রাক্-চৈতন্য যুগে সংকীর্তন প্রথা ছিল। চৈতন্যদেবের জন্মলগ্নে নবদ্বীপ হরিনাম গানে মুখরিত হয়েছিল। তবুও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সংকীর্তনের প্রবর্তক। কারণ প্রণালীবদ্ধ ভাবে কীর্তনগান মহাপ্রভুর আগে প্রচারিত হয়নি। তাছাড়া মহাপ্রভুই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে শোনালেন যে, কলিযুগে নাম কীর্তনই সার এবং নামের ফলেই কৃষ্ণপদে মন উপস্থিত হয়। গয়া থেকে ফিরে এসে

চৈতন্যদেব হরিনামে মেতে উঠলেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে হরিনামের যে ক্ষীণধ্বনি উঠত, মহাপ্রভুর যোগদানের ফলে উত্তাল হ'তে থাকল তার কলনিনাদ। চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গেই সর্বপ্রথম নামকীর্তন প্রচার করেন বলে জানা যায়। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন :

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকবদাতৌ
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম পালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয় করৌ করুণাবতারৌ ॥

আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়, কনকসুন্দর কান্তি, কমলায়ত অক্ষি, সংকীর্তন প্রবর্তক, যুগধর্মপালক, জগৎপ্রিয়কর, করুণার অবতার প্রভু চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করি।

বাস্তবিকপক্ষে চৈতন্যদেবই ছিলেন সংকীর্তন প্রবর্তক। তিনি বহিরঙ্গ সনে নামকীর্তন এবং অন্তরঙ্গসনে লীলারস আস্বাদন করতেন। ভক্তগণ তাঁর কাছে কোন উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি তাদের কৃষ্ণনাম করতে বলতেন :

কীর্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়া ॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

শ্রীবাসঅঙ্গনে কীর্তনকালে চৈতন্যদেব তিনটি সম্প্রদায় গঠন করেন। কাজি-দলনের সময় কীর্তনদল চার ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। নীলাচলে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব নামকীর্তনে অংশগ্রহণ করতেন। সুতরাং বৃন্দাবন দাসের প্রশস্তি —"চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন। ভক্তগণ নাচে নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥" —বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। নামসংকীর্তনের মহিমা মহাপ্রভুই জগৎসমক্ষে প্রকটিত করেন :

সংকীর্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।···
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্‌গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥

বৈষ্ণবভক্তের যাচ্ঞা মোক্ষ নয়, প্রেম। 'প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার'।

তদ্‌গত চিত্তে নামকীর্তনের ফলে ভক্তচিত্তে শুদ্ধপ্রেমের উদ্‌গম হয়। যবন হরিদাসের উক্তিতেও জানা যায় যে 'নামের ফলে কৃষ্ণপদে মন উপজয়।' কলিযুগে নামসংকীর্তনই একমাত্র ধর্ম। চৈতন্যদেবও এই শিক্ষা দিয়েছেন: 'হরের্নাম হরের্নাম হারর্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

লীলাকীর্তনকে রসকীর্তন বা পালাকীর্তনও বলা হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণ-লীলারসের যে কোন একটি পর্যায়ের পদ পালাবদ্ধ করে গান করা হয়। রসপর্যায় যেন সুতো, পদগুলি ফুল। এদের সহযোগে অখণ্ড একটি মাল্য রচিত হয়। বিভিন্ন মহাজনের উৎকৃষ্ট পদগুলি কীর্তনিয়া একত্র সন্নিবেশিত করেন। এই সজ্জাকরণে ক্রমানুসারিতা ও সংযুক্তি বজায় থাকে। রসাভাস যাতে দেখা না দেয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

রসকীর্তন চৈতন্যদেবের সময় থেকেই প্রচলিত। অন্তরঙ্গসনে তিনি রস আস্বাদন করতেন, একথা চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু সে রস-কীর্তনের সঠিক পরিচয় এখনও পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে খেতুরীর মহোৎসবে নরোত্তমদাস পালাকীর্তনকে নতুনরূপে উন্নীত করলেন। রসকীর্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার রীতিও নরোত্তম প্রবর্তন করেন। বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর সমাবেশে রসকীর্তনকে মার্গসঙ্গীতের স্তরে উন্নীত করে কীর্তনের ভিত্তি-ভূমি নরোত্তম সুদৃঢ় করে দিলেন।

কীর্তনে চৌষট্টি রস আছে। শৃঙ্গার বা মধুর রসের দুটি বিভাগ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ আবার চার প্রকার—পূর্বরাগ,মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। এদের প্রত্যেকটি আবার আট প্রকার। সম্ভোগেরও চারটি শ্রেণী—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান। এদের আবার আটটি করে উপবিভাগ। তাহলে একুনে চৌষট্টি বিভাগ দাঁড়াল।

অপরপক্ষে নায়িকার আটপ্রকার অবস্থার বৈচিত্র্যভেদেও চৌষট্টি প্রকার রসের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। আটপ্রকার নায়িকা, যথা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা। এদের প্রত্যেকটির আবার আটটি করে উপবিভাগ। তাহলেও চৌষট্টি প্রকার হোল।

রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন নিত্যলীলাই রসকীর্তনের উপজীব্য। কৃষ্ণের

জন্মলীলা থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত লীলায় যে কোন একটি পর্যায় অবলম্বন করে পালাগায়ক কীর্তন গান করেন।

নামকীর্তন ও রসকীর্তন ছাড়াও সূচককীর্তন নামে আর একপ্রকার কীর্তন আছে। কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-ভক্ত ও মহাজনের তিরোভাব মহোৎসবে তাঁর লীলাবিষয়ক যে কীর্তন করা হয়, তাকে বলে সূচক কীর্তন। মহাজনস্মৃতি-বন্দনার এটি একটি বিশেষ রীতি।

॥ ৩ ॥

লীলাকীর্তনের ছয়টি অঙ্গভেদ কল্পিত হয়েছে—কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট, ঝুমুর।

এক পদ শেষ করে অন্যপদ গাওয়ার আগে এই দু'পদের যোগসূত্র স্বরূপ কথা ব্যবহৃত হয়। কথার দ্বারা কখনো বা দুরূহ পদকে ব্যাখ্যা করা হয়।

কোন পদ গান করার সময় গায়ক পয়ার, ত্রিপদী, চৌপাঈ ছন্দের সংস্কৃত শ্লোক দু'চার পংক্তি আবৃত্তি করেন। একে বলে দোঁহা। মূল সুরের রসমাধুর্যকে পুষ্ট ও মধুর করে তোলা দোঁহার কাজ। আর আখর কীর্তনের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পদাবলীর মর্মের দুর্বোধ্যতা আখরের দ্বারা রসিক মনের কাছে জলের মত সহজ হয়ে যায়। ব্রজবুলি, সংস্কৃতপদ, কিম্বা কোন গূঢ় রহস্যপূর্ণ পদ গানের মধ্যে ভাবাবিষ্ট গায়ক গদ্যে অথবা পদ্যে মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আখরের বৈচিত্র্য পদাবলীকীর্তনকে উপভোগ্য করে তোলে। মার্গসঙ্গীতের তান ও কীর্তনের আখর প্রায় একই প্রকার। আর তুককে বলা হয় মিলাত্মক আখর। পদকীর্তন করতে করতে গায়ক ছন্দোবদ্ধ দু'এক চরণ গেয়ে থাকেন। কখনও বৈষ্ণব-কাব্য থেকে নিয়ে, কখনো বা স্বরচিত পদাংশ গান করেন গায়ক। তুক্ গুরু পরম্পরায় চলে আসছে। সম্পূর্ণ পদ না গেয়ে হাল্‌কা চালে পদের অংশ বিশেষ গাওয়াকে ছুট বলে। বড়তালের গানের মাঝে তাল ফেরতা ছোটতালের গান ছুট নামে আখ্যাত। অনেক সময় একাধিক কীর্তনিয়া যখন পদাবলী কীর্তন করেন, তখন প্রচলিত নিয়মানুসারে মিলন গাওয়া যায় না, ঝুমুর গেয়ে আসর রাখতে হয়। সর্বশেষ গায়ক মিলন গেয়ে পালা শেষ করেন। সাধারণতঃ দু'চার ছত্র পয়ার, ত্রিপদীর অংশ বিশেষ ঝুমুর নামে কথিত হয়।

॥ ৪ ॥

সম্প্রদায়ভেদে কীর্তনের পাঁচটি ঘরানার উদ্ভব হয়েছে—গড়ের হাটী, মনোহরশাহী, রেনেটী, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী। গড়েরহাটী কীর্তনরীতির উদ্ভব রাজশাহী জেলায় গড়েরহাটী পরগণার অন্তর্গত খেতুরীতে। নরোত্তম দাস এই পদ্ধতির প্রবর্তক। তিনিই সর্বপ্রথম কীর্তনকে ধ্রুপদের রাগতাল যুক্ত করে প্রচার করেন। এই রীতির কীর্তনের লয় বিলম্বিত, ছন্দ দীর্ঘ, তাল ১০৮। এতে আখরের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

বর্ধমান জেলার মনোহরশাহী পরগণার নাম থেকে মনোহরশাহী সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছে। খেতুরী-প্রত্যাগত জ্ঞানদাস প্রভৃতি আরো কয়েকজন রাঢ়ের প্রাচীন কীর্তনধারার সংস্কার করে এই রীতির প্রবর্তন করেন। এই ধারায় কীর্তনের লয় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, রীতি খেয়ালজাতীয়, তাল সংখ্যা ৫৪, আখরের বৈচিত্র্যসম্পন্ন।

বর্ধমান জেলার রাণীহাটী পরগণায় 'রেণেটী' পদ্ধতির প্রথম উদ্ভব। এ রীতির প্রবর্তক পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ। এর লয় ও মাত্রা দ্রুত ও সরল, সুর অনেক তরল, আখরের বিশেষ প্রাধান্য নেই, তাল সংখ্যা ২৬। এ রীতিকে টপ্পা গানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বৈষ্ণবদাস, উদ্ধব দাস এ রীতিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ইদানীং তা প্রায় অবলুপ্তির পথে।

মেদিনীপুরের সরকার মন্দারণের নামানুসারে মন্দারিণী পদ্ধতির নামকরণ। এটি রাঢ়ের প্রাচীন সুর। ঠুংরির ছাঁচে গ্রথিত মন্দারিণী কীর্তনের সুরের তাল সংখ্যা ৯। এ রীতি এখন প্রায় অবলুপ্ত। কীর্তনিয়া নিজস্ব পদ্ধতির সঙ্গে এ পদ্ধতির অনেক সময় মিশ্রণ করে গান করে থাকেন।

ঝাড়খণ্ডী পদ্ধতি রাঢ়ের একটি প্রাচীন সুর। লোকসঙ্গীতের এই সুরকে সংস্কার করে কবীন্দ্র গোকুল এ রীতির প্রতিষ্ঠা করেন। এখন এ সুর লুপ্ত।

বৈষ্ণব পদাবলীর পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি হয় কীর্তন গানের মাধ্যমে। ভাব, ভাষা, ছন্দ, সুর, তাল, লয় গানের আসল সম্পদ। এ সকল গুণসমৃদ্ধ পদাবলী-কীর্তন-গান রসজ্ঞ শ্রোতাকে লোকোত্তর ব্যঞ্জনার সন্ধান দেয়। কীর্তনের সুরলহরী রসজ্ঞ শ্রোতাকে নিয়ে যায় পার্থিব জগৎ থেকে অপার্থিব সৌন্দর্য-লোকে। এখানেই পদাবলীর সার্থকতা।

কিছু অভিমত

অধ্যাপক শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামী এম. এ., লিখিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য্য অনির্বচনীয় হইলেও শ্রীমান্ গ্রন্থকার তাহার বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করিয়া যে বিচার ধারা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যে ছন্দোনর্ত্তন আছে, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সঙ্গীত, তাল ও লয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও তালসহ সুরসংযোগ ও পদগুলির স্বরসংযোগে পুনঃপুনঃ আবৃত্তিজনিত যে মধুর আকর্ষণ দ্বারা মানবচিত্তকে মোহিত করে, তাহা ভক্তশ্রোতৃগণের অবিদিত নহে।

শ্রীমান্ গোস্বামী গ্রন্থকার প্রকৃত অধিকারী হওয়ায় তাঁহার লেখনী মুখে প্রকাশিত বিশ্লেষণাত্মক বিষয়গুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং সঙ্গীতেরও অবশ্যজ্ঞাতব্য সন্দর্ভরূপে গণ্য হওয়া উচিত। আমি এই শুভেচ্ছা প্রকাশ করি, এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হউক এবং বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য্যপানে পাঠকশ্রেণী পরিতৃপ্ত হউন।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

"জয় জগবন্ধু হরি"

'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' গ্রন্থখানি শিরে ধারণ করিলাম। গ্রন্থকার অধ্যাপক শ্রীযুত সনাতন গোস্বামী মহোদয় গ্রন্থখানি আমাকে পাঠাইয়াছেন অভিমত পাইবার আশায়। এই জাতীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত দেওয়া কঠিন। মিশ্রী দ্বারা যাহাই তৈয়ারী হয় তাহাই মিষ্টি লাগে। মধুমাখা বৈষ্ণব পদ লইয়া যিনি যাহা লিখেন তাহাই মধুময় মনে হয়।

গ্রন্থকার গ্রন্থটি লিখিয়াছেন নিজের অনুভবানন্দে, কাহাকেও শিক্ষা দিবার জন্য নহে। আত্মানুভূতির সাবলীল প্রকাশ বলিয়া মধুময় বস্তু আরও মধুস্রাবী হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাণসর্বস্ব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। লেখক যে গৌরসুন্দরকে ভালোবাসিয়াছেন তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই। এই ভালবাসার শক্তিতেই তিনি রাধাপ্রেমের নিগূঢ় তাৎপর্য, গৌরাবির্ভাবের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ

প্রয়োজন নিবিড় ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন। সেই আস্বাদনের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বিপুল পদাবলী সাহিত্যকে। গৌরচন্দ্রিকার কৃপাচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত বলিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ হইয়াছে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুগভীর।

কবি পরিচিতি প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী দুইজন ও পরবর্তী দুইজন কবির প্রতিভা ও কাব্যমাধুর্য্য বিশ্লেষণে লেখক যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা শুধু নিরবদ্য নয়, শিক্ষাপ্রদও সুখদও বটে।

বৈষ্ণব কবিরা যে কেবল কবি নহেন, মঞ্জুরী আনুগত্যে লীলাকুঞ্জে প্রবিষ্ট আবিষ্ট সাধক,—এই গভীর তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া অধ্যাপক মহোদয় আমাদের অন্তরঙ্গগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তাই অন্তর হইতে বলিতে ইচ্ছা জাগে, গৌরকৃপাপূত ভবদীয় লেখনীমুখে আরও মধুধারা প্রবাহিত হইয়া তাপদগ্ধ জীবকে স্নিগ্ধ করুক।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গ্রন্থকার বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচয় দিতে যাইয়া বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব, বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য পদাবলী সাহিত্যের এইরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাবয়ব চিত্র এই জাতীয় গ্রন্থে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ভাষা সহজ ও সরল, প্রকাশ ভঙ্গিমা সুন্দর। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য—সহজবোধ্য। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্য বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকাকে আমরা গ্রন্থপাঠে সাদর আহ্বান জানাই। পাঠে পদাবলীর তত্ত্বও রসাস্বাদনে তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থটি বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের মূল্যবান অবদান বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীমদ্ শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী

আপনার বই 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' পেয়েছি। বইটি বেশ ভালো হয়েছে। এতে আপনার পাঠ-পরিধি, অনুসন্ধিৎসা ও নিরলস বিদ্যাচর্চার পরিচয় আছে। বইটি ছাত্রদের খুব কাজে লাগবে।

ড. জীবেন্দ্রবিনোদ সিংহরায়

'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' ছাত্রদের পক্ষে খুবই উপযোগী হইয়াছে। সাধারণ পাঠকও ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও পদাবলীর রস-আস্বাদনে যে-যে বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, গ্রন্থখানিতে সেগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। গৌরচন্দ্রিকা, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, নায়িকা বিভাগ, কবি-পরিচয় ও কাব্যমূল্য— প্রভৃতি বিষয় বিচার তথ্যানুগ হইয়াছে। আমি বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

আপনার পাঠানো বই 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' পেয়েছি। গ্রন্থখানি মনোনিবেশ সহকারে পড়লাম। আপনার সুচিন্তিত, শ্রমসাধ্য গ্রন্থ বলে ঐ বিশেষ বিষয়ে অনুরাগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত উপকারে আসবে।

ড. নীলিমা ইব্রাহিম

প্রথম বইখানি ('বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়') অবশ্যই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স এবং পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক গ্রন্থ (Reference Book)-রূপে তালিকাভুক্ত হতে পারে। তাছাড়া জিজ্ঞাসু পাঠকও অনেক নূতন তথ্য ও তত্ত্বের সংগে পরিচয় লাভের সুযোগ পাবেন, এটাতো নিঃসন্দেহে আনন্দের সংবাদ।

ড. গোলাম সাকলায়েন
(রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

তোমার 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' গ্রন্থখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আদ্যোপান্ত পড়িলাম। মনে হইল প্রধানতঃ ছাত্রদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই বইখানি লিখিয়াছ। ছাত্রদের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এই বই ছাত্রদের উপকারে লাগিবে। শিক্ষকের বিনা সাহায্যেই তাহারা পদাবলীর রস পর্য্যায় আদি বহু বিষয় শিখিতে পারিবে। কীর্ত্তন শুনিতে ভালাবাসেন, বৈষ্ণব পদাবলী পাঠে অনুরাগ আছে এমন বহু সাধারণ জনও বইখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। তোমার রসবোধ, তথ্যনিষ্ঠা, বিশ্লেষণ নিপুণতা বইখানিকে সুপাঠ ও সুখপাঠ্য করিয়াছে।

ড. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যরত্ন, ডি. লিট

'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' গ্রন্থে অধ্যাপক সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্মের গোড়ার কথা, প্রাক্ চৈতন্য যুগে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের তাৎপর্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল সূত্র, প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ, ভক্তি রসের সংজ্ঞা ও উপাদান, নায়ক-নায়িকার প্রকরণ, নায়ক সখা ও নায়িকার দূতীভেদ, পদাবলীর রসপর্যায়, মুখ্য চারজন কবির পরিচয় ও 'পদাবলীর নানাদিক' পর্যায়ে কিছু প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সনাতনবাবুর কৃতিত্ব এই যে, অল্প কথায় মোটামুটিভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর যাবতীয় দিক নিয়ে আলোচনা সংবদ্ধ করতে পেরেছেন।

ইতঃপূর্বে বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিতগণ আলোচনা করলেও তা কি ভাবে পদাবলী সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে, সে আলোচনা বিশেষ হয়নি। সনাতন গোস্বামীর উক্ত গ্রন্থখানি সেই অভাব অনেকখানি পূরণ করবে মনে হয়। গ্রন্থকার প্রথমে বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমিকা আলোচনা করে পরে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া পদাবলী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সব তথ্যই এতে উপস্থাপিত হয়েছে। ভক্ত বৈষ্ণব জিজ্ঞাসু পাঠক ও ছাত্রছাত্রীগণ অধ্যাপক গোস্বামীর এই গ্রন্থ দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

সনাতন গোস্বামী তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল সূত্র' ও 'শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের তাৎপর্য' শীর্ষক অধ্যায়ে নিজস্ব সনিষ্ঠ মনন ও মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। বৈষ্ণব পদসাহিত্য যে কেবলমাত্র ছাত্রপাঠ্য নয়, তা যে চিরকালের সর্বশ্রেণীর জ্ঞানীগুণী পাঠকদের অবশ্য পাঠ্য, আলোচ্যগ্রন্থ নয়, তা প্রমাণ করে। বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও কাব্যত্ব—দুটির সমান মূল্যায়ন এ গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছে। গ্রন্থটি বাস্তবিক অর্থে বৈষ্ণব সাহিত্য রসপিপাসুদের রসতৃপ্তি অনেকাংশে মেটাবে।

তত্ত্ব ও সাহিত্য—এই দুইয়ের রাসায়নিক সংযোগ ঘটেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। সুতরাং তত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা ও বিচার সুষ্ঠু হতে পারেনা। অধ্যাপক গোস্বামী একাধারে ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ক্রম-বিবর্তনের ধারাটিকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। পরম নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে এই বিশাল াহিত্যের সঠিক আলোচনা করা এবং এর সর্বাঙ্গীন্ রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা যে কত দুরূহ কাজ তা বিশেষজ্ঞ মাত্রই জানেন। যথার্থ পরিতোষের কথা অধ্যাপক গোস্বামী সেই দুরূহ কাজ অত্যন্ত সীমিত পরিবেশেও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পেরেছেন। কোথাও তত্ত্বালোচনা ও রসালোচনায় স্ববিরোধিতা বা সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়নি।

অত্যন্ত অল্প পরিসরে বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই জাতীয় সামগ্রিক আলোচনা বড় একটা চোখে পড়েনা। গ্রন্থখানি যে পাঠক সমাজের যথোচিত সমাদর লাভ করবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

প্রীতিভাজনেষু,

সম্প্রতি আমি নানা গান বাঁধা এবং সে সব গানে সুর দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই আপনার 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' পড়বার সময় পাইনি, আরো এই জন্যে সে, এজাতীয় গভীর অনুভবের রাজ্যে ঢুঁ মেরেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না—সাধ্যমত চেষ্টা করতে হয় সে রাজ্যে প্রবেশের 'পাশপোর্ট' জোগাড় করার। অর্থাৎ অবসর ও ঔৎসুক্য। ঔৎসুক্য আমার ছিল কিন্তু অবসর কই? যাহোক

অবশেষে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক নিবন্ধ ও আপনার বৈষ্ণবতত্ত্ব তথা রসালোচনা পড়বার সময় পেলাম। অনেক কথাই বলার ছিল, কেবল দুঃখ এই যে, সাতাত্তর পেরিয়ে সব কিছুই চলতে শুরু করে ঢিমা তেতালায়। তাই সংক্ষেপেই সারতে হবে—গান বাঁধার কাজ তো শেষ হয়নি, একটু ক্ষণিক ছেদ পড়েছে মাত্র।

বৈষ্ণব পদাবলীর নানা গান আমি শিখেছিলাম শ্রী নবদ্বীপ ব্রজবাসী ও শ্রী রেবতীমোহন সেনের কাছে (তিন চারটি)—গরাণহাটী, মনোহরশাহী, রেনেটি। গাইতে গভীর আনন্দ পেতাম—তবে আমার প্রিয়তম কবি চণ্ডীদাস, তারপরেই জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমি দো মনা। কিন্তু সে যাক—গুণগ্রাহী ও প্রিয়ংবদ হওয়াই ভালো।

আমার মনে হয়, চণ্ডীদাসই বৈষ্ণব কবিদের মুকুটমণি। তাঁর নানা গান গাইতে চোখে জল এসেছে কতবারই। জ্ঞানদাসেরও দু'একটি গানে। কিন্তু চণ্ডীদাস প্রেমের যে গহন লোকের অধিবাসী সে-লোকে আর কোনো বৈষ্ণব কবিই ছাড়পত্র পায়নি—জ্ঞানদাসের দু'চারটি অবিস্মরণীয় পদ ছাড়া। তাই বিদ্যাপতির কবিত্ব নিয়ে আমি মেতে উঠতে পারিনি কোনোদিনই। তাঁর কেবল একটি গানই আমি গাইতাম সাশ্রুনেত্রে: "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।"

দেখুন, আমি এ-যুগের প্রজা নই। গত শতকের শেষে আমার জন্ম। তাই প্রেম, দেশ, প্রীতি সর্বত্রই আমি আদর্শকে খুঁজেছি, কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং খুঁজিনি। অবশ্য রসো বৈ সঃ—রসানাং রসতমঃ এ সবই আমি মানি, কিন্তু নিছক কবিত্বসিন্ধুর ডুবারি হ'তে আমি নারাজ। ও আমি পারি না—মানে, রসিক হ'তে ভালো লাগলেও রসিক বলতে সচরাচর যা বোঝায় তার আমি অনুরাগী নই। রস স্বরূপের একটু-আধটু ছিটে ফোঁটা নিয়ে আমি কী করব? আমি যে চাই তাঁর মুখোমুখি হ'য়ে চণ্ডীদাসের সুরে:

"দেহমন আদি সঁপেছি কালিয়া কুলশীল জাতি মান।"

রস রস ভাব ভাব কবিত্ব কবিত্ব বলতে আমার প্রাণে উচ্ছ্বাসের ঢেউ খেলে যায় না। একদা আমি একটি গানে গেয়েছিলাম:

তোমায় কী বলো বলিব শ্যামল? বলিবার কথা কিছু কি আছে?
একই কথা শুধু বলি তাই বঁধু: তনুমন প্রাণ তোমায় নাচে।

তনু গায় : প্রতি কণিকা আমার
তোমারি পূজার হোক দীপাধার
জ্বালায়ে নামের শিখাটি অপার
গাহিবে উছলি : "আছে সে আছে,
সুদূর আকাশে শুধু থাকে না সে, মাটির বুকে ও রাজে সে রাজে।"
মন গায় : "প্রতি চিন্তা ভাবনা
সাধিবে চিন্তামণির সাধনা
কেন পুছি : তারে পাব কি পাব না ?
কান পেতে শোন্—মুরলী বাজে।
লোক-লাজভয়—বিদায়ে প্রণয়ব্রজে আয় ছেড়ে মিথ্যা কাজে।
প্রাণ গায় :" যত বেদনা বিষাদ
সোনার—হরিণ—কামনা—প্রসাদ
যত অশান্তি জ্বালা অবসাদ
হবে লয় অবগাহন মাঝে :
প্রেম যমুনায় ডুব দিতে পায় ভয় শুধু হায় সে—জানে না যে।

এ হেন ব্যাকুল শরনার্থী বিদ্যাপতির কবিত্বে কতটুকু পথের পাথেয় পেতে পারে বলুন ? তাই আমাকে খারিজ করে দিন বৈষ্ণব পদাবলীর বারো আনার অনাধিকারী বলে, চণ্ডীদাস চণ্ডীদাস চণ্ডীদাস—একমেবাদ্বিতীয়ম—আমার কাছে।

* * * *

কিন্তু তা বলে যদি ভেবে বসেন বৈষ্ণব কবিতায় আমি থেকে থেকে ডুব দিতে চেষ্টা করিনি তাহলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। আপনার নানা উচ্ছ্বাসে সাড়া দিতে না পারলেও আমি কল্পনা করতে পারি—কেন আপনার মনে নানা বৈষ্ণব পদাবলী রঙের ঢেউ তুলে আনন্দের পাড় ভেঙেছে। কিন্তু আপনাকে আমি হিংসা করি না, হিংসা করি রামপ্রসাদকে যিনি গেয়েছিলেন :

খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি তোর ঐ অভয়পদ।
প্রসাদ মা চায় ঠাঁই রাঙা পায় করিস নে তায় আশাহত।

কিন্তু লক্ষীটি, তা বলে বেরসিক বলে আমাকে দেগে দেবেন না, আপনার বইটির নানা গুণে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। সব সময়ই মনের তার উঁচু সুরে

বাঁধা থাকে না। যখন নানা বই পড়ি তখন তাদের রসালতায় রস পাই বৈ কি—কিন্তু পেয়ে দুঃখ পাই। মনে পড়ে এক পরম ভাগবতের কথা (যিনি সমাধিস্থ হয়ে মহাপ্রয়াণ করেছেন কয়েক বৎসর পূর্বে): "কবে কৃষ্ণকে পাবেন? যেদিন কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গেই শুধু সাড়া না দেওয়া নয়—যন্ত্রণা হবে শুনতে অকৃষ্ণকথা—কেবল সেদিনই তাকে পাবেন।" আমার কেবল মনে হয় সেদিন আমার কি কখনো হবে—এমন জগৎ ছাড়া কৃষ্ণাকুলতা—মা'র চরণে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলতে পারা মন মুখ এক ক'রে (আমি শ্যাম ও শ্যামাকে এক করে দেখি না):

ডাকতে হবে শিশুর মতই কান্না কেঁদে: 'আয় মা কাছে।'
মা'র আদরে দুলব যতই মিলবে মাকে বুকের মাঝে।
মায়ার বাঁধন কাটবে তখন—পড়বে খ'সে চোখের ধূলি।
মা-কে বরণ করব যখন পড়ে মায়ের নামমাদুলি।

(এ গানটি মাত্র তিনসপ্তাহ আগে বেঁধেছি, পাঠালাম আলাদা)

হয়ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন—এর নাম কি আপনার মূল্যবান বইটির সমালোচনা? না, নয়। তবে সমালোচক আমি নই—আমি চাই বস্তুলাভ। রামকে যদি না পাই তবে যদুকে নিয়ে ঘর করতে আমি নারাজ।

তবু আপনাকে সত্যি সত্যিই প্রশংসা করি—আপনার বৈষ্ণব কাব্যোৎসাহের জন্য। এ বিরল গুণ কজনার থাকে এ নাস্তিক যুগে? হলই বা ডাই লিউট—কিন্তু "স্বল্পমপস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" আপনার উৎসাহ স্বল্প নয়, অনল্প। এমন যত্ন নিয়ে কজন বৈষ্ণব সাহিত্য পড়ে, গবেষণা করে; দেখতে চায় দর্শনীয়কে শোনাতে চায় শ্রোতব্য কে? ভাষাও সুন্দর। তবে সমাসবদ্ধ নানা পদ আর একটু কম হলে ভালো হত, যথা (২০৫ পৃঃ) "মানবজীবনোৎকণ্ঠা অনমুভূত" থাকে না। এ ধরণের গুরু গম্ভীর ভাষায় আমার মন প্রতিহত হয়—যদিও ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ সুষ্ঠু একথা আমি মানি। তাই এ মূল্যবান গবেষণাবহুল বইটির ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভাষা আর একটু অসংস্কৃত ঘরোয়া বাংলায় লেখা হবে এ আশা করবই করব। আরো অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু আর না, গানের সুর নিয়ে বসতেই হবে। ইতি—

ভবদীয় আন্তরিক গুণগ্রাহী শ্রীদিলীপকুমার রায়।

পুঃ। পিতৃদেবের চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আপনার অনেক মন্তব্যেই আমি সায় দিই, কেবল আমার মনে হয় আসল কথাটিই নেই—যে, তাঁর নাটক পড়লে মন উন্নত হয় প্রাণ পবিত্র হয়। তাঁর একটি কবিতায় আছে :

পরের দুঃখে কাঁদতে পারা— তাহাই ভবে নরম নয় :
মহৎ দেখে কাঁদতে শেখা—তবেই কাঁদা বন্ধ হয়।

কিন্তু একথা এ-কলাসর্বস্ব যুগে কাকে বলব ? ইতি—

শ্রীদিলীপকুমার রায়